



প্রমথনাথ বিশী : জীবন ও সাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি.
ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত



শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল, এম.এ.

বসিরহাট কলেজ

১৯৮৭



BCU 3136

616991

Price : Rs. 60/- only



Printed in India by Sri Pradip Kumar Ghosh, Superintendent,
Calcutta University Press, 48 Hazra Road, Calcutta - 700 019

SCUP 2353 B

ভূমিকা

গদ্যো-শব্দ্যে সব্যসাচী লেখক প্রমথনাথ বিশী বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, রস-রচনা, সমালোচনা, গ্রন্থ-সম্পাদনা-সাহিত্যের সব শাখাতেই তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। একাধারে এমন খাঁটি রবীন্দ্রভক্ত ও একনিষ্ঠ বন্ধিমানুরাগী বিরল। তাঁর প্রায় সব লেখাতেই একজন প্রথম শ্রেণীর কবিশিল্পীর পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে। তাঁর জীবিতকালেই সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দ বা সুধী সমালোচক মন্ডলী বিভিন্নভাবে প্রমথপ্রতিভার মূল্যায়নে যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু শতাধিক গ্রন্থের জনক প্রমথনাথ বিশীর জীবন ও সাহিত্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা তাঁর প্রতিভার সামগ্রিক স্বরূপ-নির্ধারণ সেইসব স্বল্পপরিসর আলোচনায় সম্ভবপর হয়নি। অথচ বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে স্বামী। এই কারণে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র হিসাবে আমি এই গবেষণাকার্যে ব্রতী হই এবং সীমিত সামর্থ্য নিয়ে নিরপেক্ষ অথচ সামগ্রিক মূল্যায়নে যত্নবান হই।

বিচিত্রমুখী প্রমথপ্রতিভার গূঢ় রহস্যের অন্তঃপুরে পৌঁছান কষ্টসাধ্য। তবু সেই বহুমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি। প্রমথনাথের ব্যক্তিত্ব ও লেখকসত্তার মৌল বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনের জন্য একদিকে তাঁর নিজস্ব রচনাবলী থেকে সাহায্য নিয়েছি, অন্য দিকে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের মতামত বিশ্লেষণ করেছি। প্রয়োজনে কোন যুক্তিকে সমর্থন বা খণ্ডন করে নিজস্ব বক্তব্য পরিবেশনে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রমথনাথের সমগ্র রচনাবলীর পরিচয় উদ্ঘাটনে ব্রতী হওয়ার ফলে আলোচনার প্রসারতা ও গভীরতা সর্বদা সমমর্যাদা লাভ করতে পারেনি। তাঁর জীবনীর বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে ও বিচিত্রমুখী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ নিজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, বিভিন্ন পুস্তক দিয়ে ও বিবিধ সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ দিয়ে তিনি এই গবেষণা কার্যে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর লোকান্তরের পূর্বে এই আরক্ত কার্য সম্পন্ন করতে পারিনি বলে আমি বিশেষ মর্মান্বিত।

এই গবেষণাকার্যে সমসাময়িক বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। ফলে সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ভালোমন্দ মেশানো মানুষ প্রমথনাথ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছতর ধারণা গড়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে যারা অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী সুরুচি বিশী, শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র রায়, অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শঙ্করী প্রসাদ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সবিতেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র,

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত, শ্রীযুক্ত কালিপদ রায় প্রভৃতি ।

আমার শিক্ষাগুরু ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ মহাশয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দানে আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন । তাঁর স্বর্ণ অপরিশোধ্য । ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত “ কথাসাহিত্য ” পত্রিকার প্রমথনাথ বিশী সংবর্দ্ধনা সংখ্যায় প্রকাশিত প্রত্যেক লেখকের মূল্যবান লেখা থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি । তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ । সকলের নাম যথাযথ ভাবে উল্লেখ করতে ব্যর্থ হওয়ার ক্রটি মার্জনীয় । উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, জাতীয় পাঠাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় পাঠাগার, বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগার (মহাজাতি সদন), স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, শান্তিনিকেতন কেন্দ্রীয় পাঠাগার, রবীন্দ্রভবন পাঠাগার, টাকী রাষ্ট্রীয় পাঠাগার, বসিরহাট সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি থেকে প্রভূত সহযোগিতা পেয়েছি । তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই । অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক ডঃ প্রফুল্ল কুমার পাল, অধ্যাপক ডঃ অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, ডঃ জ্ঞানেশ মৈত্র প্রভৃতি নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ।

অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত ও ডঃ শ্রীযুক্ত প্রণব রঞ্জন ঘোষ পরীক্ষক হিসাবে আমার এই গবেষণা-কর্মের অনুমোদন ও অনুকূল অভিমত প্রদান করেছেন । তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ । বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষণাকার্য্যে আমাকে অর্থানুকূল্য করেছেন । প্রকাশনার ব্যাপারেও তাদের অর্থানুকূল্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই ব্যাপারে উপাচার্য্য ডঃ রথীন্দ্র নারায়ণ বসু, সহ উপাচার্য্য (অর্থ) ডঃ করুণা ভট্টাচার্য্য, সহ উপাচার্য্য (শিক্ষা) ডঃ প্রবুদ্ধনাথ রায় ও ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (ডি, পি, ও) কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক প্রীতি জানাই । এই গ্রন্থ সুধী পাঠকবৃন্দের কৌতূহল ও আনন্দবর্ধনে সহায়ক হলে আমার নিষ্ঠা ও শ্রম সার্থক হবে ।

ইতি—

বিনীত

দিনান্তিকা,

বসিরহাট কলেজ,

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা

শশাঙ্ক শেখর মন্ডল

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	:	
প্রথম পরিচ্ছেদ	: প্রমথনাথ বিশীর সংক্ষিপ্ত জীবনী	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: কবি প্রমথনাথ বিশী	২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: নাট্যকার প্রমথনাথ বিশী	৬৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশী	৮৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: ছোট গল্প রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী	১৪৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: প্রবন্ধকার প্রমথনাথ বিশী	১৮৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ	: প্রমথনাথ বিশীর প্রতিভার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য	২৫৯
গ্রন্থপঞ্জী	:	২৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রমথনাথ বিশীর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

'কবিরে পাবেনা তাঁহার জীবনচরিতে ।'— বিশ্বকবির এই স্বল্প বাক্য শিরোধার্য করে নিয়েও যুগে যুগে চলেছে কবি-সাহিত্যিকের জীবন ধারার উৎস থেকে পরিণতি পর্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক অনুসন্ধান । সাধারণভাবে জীবন তো অনন্ত সম্ভাবনা ও অপার বিস্ময়ের আগার । আর সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকৃত প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকের জীবন তো শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে ভরা অনন্ত রহস্যের খনি । এই কারণেই সেই রহস্য উন্মোচনে পাঠক সাধারণের আগ্রহ এত তীব্র, জীবনীকারের পরিশ্রম এত কঠোর এবং আনন্দ এত গভীর ।

জীবনী রচনায় লিপিকারের চেয়েও বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ তাঁর সৃষ্ট রচনাবলী ।

বাংলাভাষায় বিশিষ্ট সৃজনশীল সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর জীবনী রচনা কঠিন বলেই তার আকর্ষণ আরও প্রখর । তাঁর জীবন চরিতের খসড়া রচনা বা রেখাচিত্র তিনি নিজেই করে গেছেন নিজের সাহিত্যে — 'বরেন্দ্রভূমে আমার জন্ম ; সে লাল মাটির দেশ ; আবার রাড়ের লাল মাটির দেশে আমার দ্বিতীয় জন্ম । আমার দুই জীবনের দুই উদয়-দিগন্ত লাল মাটির আভায় চির রক্তিম' ।^১

প্রমথনাথ বিশী দ্বিজ ; শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, ব্যঙ্গনার্থেও ।

অখণ্ড ভারতবর্ষের বরেন্দ্রভূমি । জেলা রাজশাহী, মহাকুমা নাটোর । জন্মভূমি গ্রাম -জোয়াড়ী, খৃঃ ১৯০১ ; ১১ই জুনের দিবা ১১টা ; বাংলা ১৩০৮ সালের ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ ; মঙ্গলবার ; জন্ম নিলেন প্রমথনাথ বিশী । প্রমথনাথ বিশীর পিতার নাম নলিনীনাথ বিশী এবং মাতা সরোজবাসিনী দেবী । পিতা মাতার মোট ছাদশ সন্তানের মধ্যে প্রমথনাথ দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র সন্তান । তাঁরা বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ । বিশী বংশ জোয়াড়ী গ্রামের বিখ্যাত ও প্রাচীন জমিদার বংশ । মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকেই তাঁরা খ্যাতকীর্তি ।

অবশ্য অভিজাত ও ইতিহাসখ্যাত এই বিশী বংশের বিন্দুমাত্র রক্ত নেই প্রমথনাথের দেহে । প্রমথনাথের পিতা নলিনীনাথ বিশীর আসল নাম ছিল [শৈশবে] নলিনীনাথ রায় এবং তাঁর পিতার নাম [প্রমথনাথের ঠাকুরদা] ছিল ভবানী রায় । বাড়ী ছিল নাটোরের কাছে করচমাড়িয়া গ্রামে । জোয়াড়ীর বিশী বংশের জমিদারগণ তখন

চারভাগে বিভক্ত। বড়, মেজ, ন ও ছোট তরফ। ন'তরফের জমিদার কেশবনাথ বিশী ও তাঁর পত্নী আনন্দময়ী দেবী ছিলেন অপুত্রক। এই কারণে কোন এক আত্মীয়ের পরামর্শে ও যোগাযোগে ৫/৬ বছর বয়স্ক নলিনীনাথকে তাঁরা দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন থেকে নলিনীনাথ রায় হলেন নলিনীনাথ বিশী।

নলিনীনাথ রায় বা তাঁর পূর্বপুরুষ এই রায়বংশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বেশ ভালো। ভবানী রায় ছিলেন বড় জোতদার, কেশব বিশী মারা যাওয়ার পর তাঁর জমিদারীর অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হন তাঁর দত্তক পুত্র নলিনীনাথ বিশী। বাকী অর্ধেক পান আনন্দময়ী দেবী।

নলিনীনাথ সুদক্ষ জমিদার ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাথায় খাটো, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত জেদী ও মামলাপ্রিয়। আবার অন্যদিকে ছিলেন উদার, স্নেহপ্রবণ ও খাঁটি স্বদেশী। খন্দর পরতেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে তিনি ৩ বার কারাবাস করতে বাধ্য হন। অনাধুনিকমনস্ক ও বাস্তবজ্ঞান বর্জিত, দোদুল্লপ্রতাপ জমিদার নলিনীনাথ বছরের অধিকাংশ সময় স্ত্রী পুত্র সহ দেওঘরের [বিহারে] ভাড়া বাড়ীতে কাটাতেন। ফলে জমিদারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারতেন না এবং পরিণামে ধীরে ধীরে জমিদারীতে ফাটল দেখা দেয়, জমিদারীর আয় হ্রাস পায়, খাজনা বাকী পড়ে, শরিকি সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জটিল মামলা—মোকদ্দমা ও ঋণ-জালে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ফলে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়।

১৯৩৩ খৃঃ নলিনীনাথের মা [আইনতঃ] আনন্দময়ী দেবী মারা যান। ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন নলিনীনাথ। পূর্ব ঋণের দায়-দায়িত্ব এড়াবার জন্য কৌশল করে তিনি এই নূতন সম্পত্তির সমস্তটাই দেবত্র করে দেন এবং সেবায়োক্ত নিযুক্ত করেন নিজ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের। এই সময় থেকে আর্থিক স্বচ্ছলতা আবার ফিরে আসে। পুত্রদের সঙ্গে নলিনীনাথের মনের বা মতের খুব বেশী মিল না থাকলেও এই স্বদেশপ্রেমিক মানুষটি পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজন সহ বহু মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। 'উত্তরবঙ্গে রাজশাহীর জুয়াড়ী থেকে এলো দুইভাই—ভর্তি হতে—বাপের সঙ্গে। বাপের তেজস্বী মূর্তিটি এখনো মনের মধ্যে গাঁথা। কথাবার্তা বা ভাষার মধ্যে কোন লালিত্য নেই, স্পষ্ট কথা মুখ ফুটে বলার সাহস ছিল বলে বৃটিশ সরকার বাহাদুরের প্রহরী পুলিশদের কাছে নির্যাতিত হয়েছেন—কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হোল না, দমবার মানুষ নয় এটি'। ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বর মাসে অসুস্থতা বশতঃ নলিনীনাথ দেহত্যাগ করেন। প্রমথনাথের মায়ের নাম ছিল সরোজবাসিনী দেবী। পাবনা জেলার

গোপালনগর গ্রামের মজুমদার বংশের মেয়ে তিনি। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা ছিলেন। ১৯৩৬ খৃঃ অসুস্থতাবশতঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রমথ বিশীরা সাত ভাই ও পাঁচ বোন। বর্তমানে জীবিত আছেন দুই ভাই ও তিন বোন। হীরেন্দ্রনাথ বিশী দমদমের বাসিন্দা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকুরিয়া। বীরেন্দ্রনাথ বিশী ছিলেন মোঘলসরাইতে ডাক্তার।

অনুজ ভাই বোনদের শিক্ষালাভ ও বিবাহাদি ব্যাপারে দায়িত্বশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতার কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন প্রমথনাথ। হয়তো তাঁর পিতা এসব ব্যাপারে কিছুটা ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়ে ছিলেন বলেই তাঁকে বেশী সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়েছিল। ভাইবোনেরাও এই স্নেহশীল অগ্রজের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন।

প্রমথনাথের বয়স যখন তিন বছর সেই সময় স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্ধানে পিতৃদেব নলিনীনাথ সপরিবারে এসে উঠলেন বিহারের দেওঘরে ভাড়াবাড়িতে। জমিদারীর প্রয়োজনে মাঝে মাঝে জোয়াড়ী গ্রামে গেলেও এখানেই তিনি কাটাতেন বছরের অধিকাংশ সময়।

এইভাবে কখনও দেওঘরে, কখনও জোয়াড়ীতে থাকতে থাকতে প্রমথনাথ পদার্পণ করলেন দশম বর্ষে। নয় বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ীতেই লেখাপড়া করেছেন। এই সময় তাঁর ডাক নাম ছিল 'ননী'; রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতো, মাঝে মাঝে তিনি নিজেও সুর করে পড়ার চেষ্টা করতেন। ইতিমধ্যে তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রয়োজন দেখা দিল। পিতা নলিনীনাথ হয়ে উঠলেন চিন্তিত। বিদেশী শাসকের প্রতি এই স্বদেশ প্রেমিক ও স্বাধীনচেতা মানুষটির ছিল ভীষণ অশ্রদ্ধা। কাজেই ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত বিদ্যালয়ে তাঁর পুত্রের শিক্ষা যে একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ হয়ে গড়ে উঠবে এ আশঙ্কা তাঁকে পীড়িত করতো। হঠাৎ তিনি লোক পরম্পরায় জানতে পারলেন কবিগুরু শান্তিনিকেতনের মৌলিক শিক্ষাধারার কথা। দেখতে পেলেন আশার আলো। সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলেদের সেখানে পড়াবেন। তারপর পিতৃসমভিব্যাহারে দুইভাই প্রমথ ও প্রফুল্ল গিয়ে হাজির হলেন শান্তিনিকেতনের বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে কোন এক কুঁড়ে ঘরে, ১৯১০ খৃঃ এর কোন এক গোধূলি লগ্নে। 'একদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম'।^৩ বাসস্থান নির্দিষ্ট হল বীথিকাগৃহে। এ যেন প্রাচীন ঝরির তপোবন। মহাঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ তার পুরোধা। তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন এই বালকদ্বয়কে - শুরু হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রথম দর্শনেই পাঠদানরত রবীন্দ্রনাথের যে সহাস্য ও শিশুপ্রেমী মূর্তি প্রমথনাথের হৃদয়কে নন্দিত করলো তাই হয়ে উঠল তাঁর

প্রবাসী বাল্যজীবনের বিশ্বস্ত নির্ভর ও চিরজীবনের অক্ষয় স্মৃতি। শিক্ষাজীবনের যাত্রা শুরু হোল। 'আমার যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ দিয়া আমাদের পাঠ আরম্ভ হয়। সেটা বোধ হয় নিম্নতম শ্রেণী ছিল, অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ের ঠিক উপরের ধাপ। শিশুর 'কাগজের নৌকা' আমার প্রথম - পঠিত রবীন্দ্র-কবিতা - প্রথম শব্দটার উপরে খুব জোর দিতে চাই না, কারণ তার আগে বোধ হয় আর কারো কবিতা পড়ি নাই - কুন্তিবাস, কাশীরামদাস ছাড়া^৪। এই সঙ্গে ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত 'ছেলেদের মহাভারত'। এইভাবে রবীন্দ্র কবিতা ও রামায়ণ মহাভারতের আনন্দলোকে অবাধে বিচরণ করে চলতো প্রমথনাথের শিশুমানস। শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রকৃতি, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা, পাঠ্যবহির্ভূত সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয় সংস্কৃতি চেতনা, উপযুক্ত শিক্ষকের উষ্ণ ও স্নেহ সান্নিধ্য ও যথাযথ শিক্ষাদান, সর্বোপরি গুরুদেবের সর্বব্যাপী প্রভাব প্রমথ-মানসের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে এক বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন তেজেশচন্দ্র সেন, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, শরৎকুমার রায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, এইচ. পি. মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, জাহাঙ্গীর ভকিল, ভীমরাও শাস্ত্রী এবং সর্বোপরি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

লেখাপড়ায় ছাত্র হিসাবে প্রমথনাথ ছিলেন মাঝারি স্তরের। তবে অন্ধ ছিল তাঁর কাছে বিভীষিকা। বারো বছর বয়সে একবার এক অঙ্কের পরীক্ষার খাতায় সবকটি অঙ্কের ভুল উত্তর দেওয়ার পরেও একটি কবিতা রচনা করে পরীক্ষকের বিরক্তি ভাঞ্জন হয়েছিলেন। কবিতাটি এই -

'হে হরি, হে দয়াময়,
কিছু মার্ক দিয়ো আমায়,
তোমার শরণাগত,
নহি সতত,
তবু এই পরীক্ষার সময়'^৫

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ প্রভাবে পরীক্ষকের হাত থেকে সে যাত্রা প্রমথনাথ রক্ষা পান।

শান্তিনিকেতনে প্রমথনাথ 'বিশী' নামেই পরিচিত ছিলেন সকলের কাছে। দোহারা চেহারা, মাথায় খাটো, কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল, ভাসা ভাসা চোখ, প্রাণাবেগে চঞ্চল, বুদ্ধিতে দীপ্ত। প্রত্যক্ষভাবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বীতশ্পৃহ।

৪। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - পৃঃ ২৩

৫। তদেব - পৃঃ ১৫

দুঃসাহসিক কাজে বা দৈহিক শক্তি প্রয়োগে অনিচ্ছুক। কিন্তু যে কোন কাজে অগ্রণী হয়ে যে কোন ব্যক্তিত্বের সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ছিল অদম্য সাহস। যে কোন প্রয়োজনে অত্যন্ত সহজভাবেই তিনি গুরুদেবের সম্মুখীন হতে পারতেন। আবার বয়সোচিত দুষ্ট বুদ্ধিতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যেমন সঙ্গীত শিক্ষাদানরত ভীমরাও শাস্ত্রীর পাঞ্জাবীর সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে তাঁর আসনের বন্ধন সাধন, শীতকালে প্রাতঃস্নান থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে চৌবাচ্চার জল অপসারণ, সমমনা কতিপয় সহপাঠীর সহায়তায় কর্তৃপক্ষের অগোচরে ডিমের ওমলেট ভক্ষণ ইত্যাদি তাঁর সকৌতুক চাপলোর পরিচয়বাহী।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রমথনাথ হয়ে উঠলেন সপ্রতিভ, মুখর; শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে পরিচিত হলেন বাক্যবাগীশ রূপে। 'নিপুণতার সঙ্গে পরিহাসমূলক বাক্যবলায় সে সত্যই ছিল ওস্তাদ'।^৬

তদানীন্তন শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া ছিল সাহিত্যরসসিক্ত। সংগীত - নৃত্য, আবৃত্তি - অভিনয়, চিত্র - ভাস্কর্য, সভা - সাহিত্য, পত্র - পত্রিকার উর্বর ভূমিতে বালক ও কিশোর প্রমথনাথের মানসবীজটি অতি সহজেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন পূর্ব সংস্কার ছিল না, কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদগম যে এখানেই ঘটত্যাছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই'।^৭

তৎকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক সাহিত্যসভার অনুসরণে ছোটদের সাহিত্য সভার আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা নেন প্রমথনাথ। আর কবিতা রচনা সমস্যার সমাধান করেন বিচিত্র ভাবে - 'রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য পাঠ্য ছিল। সেই কাব্যমালঞ্চে ডাকাতি করিয়া কবিতা লিখিত হইল। তিনটি ছত্র বা কবির, চতুর্থ ছত্রটি কবি যশোজিঙ্গুর'।^৮ 'এইভাবে আশ্রমের ফুলে ডালে সাজানো প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে বালক মনের কাঁচা সোনার মতো বাসনা মিশিয়ে প্রমথনাথের সাহিত্য জীবনের উদ্যালয়'।^৯

আশ্রম - শিক্ষক কালিদাস বাবুকে দিয়ে নিজের কবিতা সংশোধন করিয়ে নিতেন প্রমথনাথ। 'কোনক্রমে গোটা-তিনচার লাইন লিখিয়া লইয়া যাইতে পারিলেই তিনি একটা নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া দিতেন। সেটা যে আমার কবিতা নয়, কখনো সে সন্দেহ তিলমাত্র মনে উদ্ভিত হইত না'।^{১০}

৬।	ছাত্রাবস্থায় প্রমথনাথ বিশী - সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, পৃঃ	১৪৯১
৭।	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	পৃঃ ৫৩
৮।	তদেব	পৃঃ ৫৪
৯।	কথা সাহিত্য (ভাদ্র - আশ্বিন)	পৃঃ ১৫০৯
১০।	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,	পৃঃ ৫৬

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে তখন সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রেরণা জাগাতেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রমথনাথ তাঁর কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। 'তখন কিন্তু কলেজ হয়নি - বড় ছেলে ছিল না - ম্যাট্রিকের মধ্যে সীমিত ছিল সবকিছু। সেই ছেলেদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার আনন্দটুকু উদ্বোধিত করতেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রমথ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল'।^{১১}

শুধু তাই নয়, দশমবর্ষীয় বালক প্রমথনাথ সেই সময়েই সুন্দরভাবে শুছিয়ে সরস ও উপভোগ্য করে রম্যরচনাও লিখতে পারতেন। 'প্রমথনাথ শিশুদের সাহিত্য সভায় রায়পুর ভ্রমণকে কেন্দ্র করে যে সরসরচনা পাঠ করেছিল তার প্রশংসা তখন মুখে মুখে আশ্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন তার বয়স বড় জোর দশ'।^{১২}

বালক কবির খ্যাতি পৌঁছাল বিশ্বকবির কানে। প্রমথনাথের কবিতা দেখতে চাইলেন তিনি। সংবাদ পেয়ে শিষ্য গেলেন গুরু সন্দর্শনে— হাতে সদ্যরচিত কবিতা। বিষয় রবীন্দ্র - বন্দনা। তার দুটি ছত্র নিম্নরূপ :

'সেই মহাগীতছন্দে সেই মহাতালে
তুমি গাহিয়াছ গান উবাসন্ধ্যাকালে'।^{১৩}

এই কবিতাটির জন্য গুরুদেবের কাছ থেকে প্রশংসার বিকল্প রূপে মিলেছিল এক প্লেট আনারস, পুডিং আর সামান্য স্নেহস্পর্শ।

১৯১১ খৃঃ [বাং ১৩১৮ সাল] শিশু সমিতির তরফ থেকে ছোটদের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করেন প্রমথনাথ। নাম 'শিশু'। হাতে লেখা। শান্তিনিকেতনে এখনও এই পত্রিকা সময়ে পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

১৯১৫ খৃঃ শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাসে ও প্রমথনাথের জীবনোপন্যাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই বছরেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে উপস্থিত হন সতীক মহাশয়াগান্ধী। সঙ্গে আফ্রিকার ফিনিক্স আশ্রমের কুড়িজন ছাত্র। তাঁর পরামর্শে আশ্রমের জীবনযাত্রাকে আরও সরল ও স্বাবলম্বী করার চেষ্টা চলে। তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুতে কিশোর ছাত্রগণ সহ সেখানকার শিক্ষকবৃন্দও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। 'যে কয়দিন মাত্র তিনি আশ্রমে ছিলেন আশ্রম জীবনে বিপ্লব ঘটাইয়া দিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট'।^{১৪} এই সময় প্রমথনাথ সহ আশ্রমের বসন্ত আক্রান্ত বহু রোগীকে গান্ধীজির পরামর্শমত সিগ্রিগেশন ওয়ার্ডে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। সেবা

১১। কথাসাহিত্য, ভাদ্র - আশ্বিন, ১৩৭৩, পৃঃ ১৩৪৯

১২। তদেব পৃঃ ১৪৯২

১৩। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, - পৃঃ ৫৬

১৪। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - পৃঃ ৯৮

ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং গান্ধীজি। খুব সম্ভব এই সময় থেকেই গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ এক আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন প্রমথনাথ, যা অক্ষয় হয়ে ছিল আজীবন। প্রমথনাথের স্বদেশপ্রেমের বীজ উগ্ধ হয়েছিল পিতা নলিনীনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অনুকূল পারিবারিক ও মানসিক ক্ষেত্রে, আর তা অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করেছিল গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও ব্যক্তিত্ব। 'আমার মনে হয় তাঁর সেই দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল সিগ্নিগেশন ওয়ার্ডে গান্ধীজির সঙ্গে একুশ দিন ঘনিষ্ঠভাবে থেকে'।^{১৫} অবশ্য ১৯২১ খৃঃ গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি।

ম্যাট্রিক পাশের পূর্বেই প্রমথনাথ শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত বাগান, প্রভাত, শান্তি প্রভৃতি হাতে লেখা পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন এবং আশ্রমের বিভিন্ন ছোট বড় সাহিত্যসভায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করতেন। অধিকাংশ সভাতেই গুরুদেব সভাপতিরূপে যোগ দিতেন এবং শিষ্য কবির কঠোর সমালোচনা করতেন। 'কঠোর সমালোচনা দ্বারা আমার যুগান্তকারী রচনাগুলিকে তিনি তছনছ করিয়া দিতেন। . . . আমি ক্ষত-বিক্ষত পৃষ্ঠে ঘরে ফিরিয়া আত্মপ্রশংসার প্রলেপ লাগাইতাম। . . . এখন বুঝিতেছি, এই সব নিদারুণ আঘাতে আমাদের সাহিত্যিক রুচি তৈরী হইয়া গিয়াছিল'।^{১৬}

১৯১৯ খৃঃ প্রমথনাথ ম্যাট্রিক পাশ করেন। তখন শান্তিনিকেতন থেকে সরাসরি এই পরীক্ষা দেওয়া যেত না। 'তখন আমাদের টেষ্ট পরীক্ষা দিয়া আসিতে হইত চুঁচুড়াতে ইন্সকুল ইন্সপেকটোরের অফিসে। যাহারা পাশ করিত তাহাদের নামে পরীক্ষা দিবার একখানা করিয়া অনুমতিপত্র সেই অফিস হইতে পাঠাইয়া দিত'।^{১৭}

ম্যাট্রিক পাশের পর প্রমথনাথ ও অন্ধ্রদেশীয় ছাত্র চলমায় - এই দুজনকে নিয়ে বিশ্বভারতীর গোড়া পত্তন হয় ১৯২১ খৃঃ। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দ্বারভাঙ্গার পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র এলেন প্রমথনাথ ও তার সতীর্থকে পাণিনির ব্যাকরণ শেখাতে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি শেখাতেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ইংরাজী ও বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কাদম্বরী, শকুন্তলা, মেঘদূত ও রত্নাবলী। বিজ্ঞান বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পাঠদান করতেন - 'রসায়নশাস্ত্রের পরে কিছুদিন তিনি মিটরিয়লজি বা আবহবিদ্যা পড়াইয়া ছিলেন'।^{১৮} এই সময়ে ফরাসী ভাষা শেখেন মিঃ মরিসের কাছে এবং ইতালী ভাষায় পাঠগ্রহণ করেন ইতালীয় পণ্ডিত টুচির (Tucci) কাছে।

১৫।	কথাসাহিত্য, ১৩৭৩,	পৃঃ ১৩৯৪
১৬।	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	পৃঃ ৫৮
১৭।	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	পৃঃ ৪৬
১৮।	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	পৃঃ ১২৮

কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেন যে কলেজে বা শিক্ষকের কাছে যথার্থ শিক্ষা হয় না - 'নিজের প্রকৃত শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার স্থান লাইব্রেরী'।^{১৯} এর পরেই প্রমথনাথ অগস্ত্যতৃষ্ণা নিয়ে লাইব্রেরী কক্ষের সববিধ পুস্তক যথেষ্টভাবে পাঠ করতে শুরু করেন। 'আমার পড়াশুনা নিয়মিত ভাবে হয় নাই বলিয়া তাহার মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক রহিয়াছে। অবশ্যপাঠ্য অতিপ্রসিদ্ধ বই আমি পড়ি নাই, আবার অপ্রসিদ্ধ উপেক্ষিত বহু বই অল্প বয়সে পড়িয়া ফেলিয়াছি। এ পর্যন্ত যেটুকু শিখিয়াছি তাহার মূলে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরী'।^{২০} ম্যাট্রিক পাশের পর থেকেই প্রমথনাথ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উৎসাহে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। 'ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পরে শেলি ও কীটসের কবিতার ইন্দ্রজালে বন্দী হইলাম। . . . কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগিল কীটসের নাইটিঙ্গেলের প্রতি কবিতা। কাব্যসংসারে ইহাই আমার প্রিয়তম কবিতা। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটি আমার মনের উপরে যেন সোনার কাঠি ছোঁয়াইল; আজিও তাহার কাজ শেষ হয় নাই। শেলির মেঘলোকে আজ আর প্রতিষ্ঠা পাই না, কিন্তু কীটসের বনভূমি পদতলে তেমনি অচল'।^{২১}

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ স্নেহবশতঃ ফরমায়েশ করে প্রমথনাথকে উন্নততর সাহিত্য সৃজনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করতেন। এমন একটি ফরমায়েশী কবিতা 'পূর্ণিমা' এবং নাটক 'রথযাত্রা'।

১৯২২ খৃঃ শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হলে প্রমথনাথ ও সতীর্থ বিভূতি গুপ্ত 'বৃধবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশী বৃধবার নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শান্তিনিকেতন প্রেস হইতে প্রকাশিত করিতেছেন'।^{২২} একবছরের মধ্যে এই পত্রিকা গতায়ু হয়। এই পত্রিকায় পৌষমাসের উৎসব উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কিছু নূতন গান প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩০ থেকে ১৩৩২ এই তিন বছর ধরে প্রমথনাথ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৩৩২ এর পরে এই পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

১৩২৮ থেকে ১৩৩২ এই কয় বছর প্রমথনাথ বিশী 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লেখক ও সম্পাদক হিসাবে। পত্রিকাটি ছিল হাতে লেখা। 'শ্রী প্রমথনাথ বিশী অনেক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। . . . বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত

১৯।	তদেব	পৃঃ	১২৯
২০।	তদেব	পৃঃ	
২১।	তদেব	পৃঃ	৬২-৬৩
২২।	শান্তিনিকেতন পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯	পৃঃ	১২৪

হবার পরে বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩২৮ সালে বের হয়। সম্পাদক সংঘে ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ বসু, অসিত কুমার হালদার, বিভূতিভূষণ গুপ্ত এবং প্রমথনাথ বিশী'। ২০

শান্তিনিকেতনের ছাত্র জীবনে প্রমথনাথ ও অন্যান্য সহপাঠী বন্ধুগণ মাঝে মাঝে অদূরবর্তী কোপাই নদীর উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। দুঃখ-কষ্টে ঘেরা এই অভিযান ছিল বাস্তবিকই দুঃসাহসিক ও বিঘ্নসংকুল। এই ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই পরে তিনি লিখেছিলেন 'কোপবতী' উপন্যাস।

খেলাধুলায় নিরুৎসাহী হলেও অভিনয়ের ব্যাপারে প্রমথনাথ ছিলেন অতীব উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের ইশা খাঁর ভূমিকায় প্রথম আবির্ভাবেই তিনি আশ্রমিক সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। শারদোৎসব ও অচলায়তন নাটকে তিনি গুরুদেবের সঙ্গে অভিনয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে তিনকড়ির ভূমিকায়, বিসর্জন নাটকে জয়সিংহ ও পরে রঘুপতির ভূমিকায় একাধিকবার সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেন তিনি। সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার' ও 'চন্ডকৌশিকে' যথাক্রমে অশ্বখামা ও হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। 'The King and The Rebel' - - নাটকে Minister এর ভূমিকা সহ একাধিক ইংরাজী নাটকেও তিনি সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

প্রমথনাথ বরাবরই যাত্রা শুভে ভালবাসেন। 'যাত্রা শুনিবার সুযোগ পাইলেই আমি আসরে গিয়া বসিতাম'। ২৪ ম্যাট্রিক পাশের পর ১৯২১ খৃঃ বিভূতি গুপ্ত ও প্রমথনাথ একত্রে একটি যাত্রাপালা রচনা করেন। নাম 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়'। এই পালাটি শান্তিনিকেতনে সেই সময়ে সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছিল। 'শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়' নামে একটি যাত্রাপালা লিখিয়াছিলেন।

... ইহার অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। পূজনীয় গুরুদেব এবং দেশীয় বিদেশীয় অতিথি, অধ্যাপক, নিকটবর্তী অধিবাসী প্রভৃতি উপস্থিত দর্শকগণ এই অভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন'। ২৫ উৎসাহিত প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণ তখন লিখলেন - 'ঘোষযাত্রা' [১৯২২]। তারপর লেখেন 'কর্ণমর্দন' ও 'বিরাটরাজার গোগৃহ'। এগুলিতে ব্যঙ্গের সুর থাকায় স্থানীয় অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন প্রমথনাথ সংসাহস ও সত্যবাদিতাওণে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। 'প্রমথনাথের একটি গুণ ছিল যতদূর আমার মনে পড়ে, যখনই তার দোষ ক্রটির অভিযোগ উঠত, কোনরকম মিথ্যাকথা বলে দোষ অস্বীকার করত

২৩। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে, সুধীর চন্দ্র কর

২৪। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ১৮৫

২৫। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, পৃঃ ৬৩

না, সংসাহসের সঙ্গে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কাপ্তানদের দেওয়া শাস্তি সে শিরোধার্য করে নিত। এই কারণে সে শিক্ষকদের স্নেহভাজন ছিল এবং সতীর্থদেরও প্রিয়পাত্র ছিল।^{২৬} সেই বয়সেই কোন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করার একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল প্রমথনাথের। কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অভাব-অভিযোগ জানাতে হলে তিনি এমনভাবে সেই বিষয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করতেন যাতে পাশে উপস্থিত কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় - 'অর্থাৎ সোজাসুজি বলত না, ঘুরিয়ে বলত'।^{২৭} আবার অল্প বয়স থেকেই প্রমথনাথ সমস্ত বিষয়কে নিজের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে যাচাই করে গ্রহণ করতেন - অঙ্কের মত নির্বিচারে কোন বক্তব্যকে মেনে নিতেন না। 'কোন কথা না বুঝলে বিশী তা মেনে নিতে পারতেন না, তর্কের জন্যও তাই তাঁর খ্যাতি ছিল'।^{২৮}

প্রমথনাথের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'দেয়ালি' কাব্য সংকলন আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৩ এ। এই পুস্তকের নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৫ এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু'। ১৯২৭ এ শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বসন্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা'।

১৩৩০ থেকে ১৩৩২ এর মধ্যে শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকাতে পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'প্রাচীন আসামী হইতে'। ১৯৩৪। কাব্যের কবিতাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। এর অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত এক আসাম বাসিনী সপ্তদশীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেই এই প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাগুলি রচিত হতে থাকে। প্রবীণ আশ্রমিক মহলে এই নিয়ে আলোড়ন ও বিক্ষোভ যখন ফেটে পড়ার মুখে তখন প্রমথনাথ সুকৌশলে এ গুলি 'প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ' নাম দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কৌশলে সকলের সন্দেহ নিরসন করলেও কবিগুরুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও তাঁর স্মিত হাসিতে ছিল স্নেহ প্রশ্রয়ের আভাস।

১৯২১ খৃঃ বিশ্বভারতী পত্তনের সময় প্রমথনাথ বিশী অন্যতম ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নিয়মিত ছাত্র হিসাবে শিক্ষকদের কাছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তিনি বেশী দিন করেননি। স্বাধীন শিক্ষায় ব্রতী হন। ফলে আই. এ. পরীক্ষার ইচ্ছা ও সুযোগ সুদূর পরাহত হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নিয়ম ছিল ম্যাট্রিক পাশের পর কোন ছাত্র অন্ততঃ তিন বছর শিক্ষকতা করলে প্রাইভেটে আই. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রমথনাথ নিজের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে দশম শ্রেণী [ফার্স্ট ক্লাস] পর্যন্ত শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ খৃঃ পর্যন্ত

২৬। কথাসাহিত্য (ভাদ্র - আশ্বিন), ১৩৭৩ পৃঃ ১৪৮৫

২৭। তদেব পৃঃ ১৪৮৫

২৮। যা দেখেছি, যা পেয়েছি — সুধীরঞ্জন দাস (প্রথম খণ্ড) ১৯৬৯

এই শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থেকে তিনি আই . এ. পরীক্ষার দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং ১৯২৭ খৃঃ আই . এ. পরীক্ষায় পাশ করেন ।

শান্তিনিকেতনে তখন বি .এ. পড়া বা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ ছিল না । ফলে তিনি বি. এ. পড়ার জন্য শান্তিনিকেতন ছাড়তে বাধ্য হলেন । এছাড়া - ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনা করে শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষের মনে অসন্তোষ উৎপাদনও তাঁর শান্তিনিকেতন ছাড়ার অন্যতম কারণ বলে মনে হয় । বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের লীলাস্থল, বহু ঘটনার মুক সাক্ষী শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশ ও গুরুদেবের মধুর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে প্রমথনাথ বৃহত্তর জগতের সন্ধানে পা বাড়ালেন জীবনের নূতন কোন পথে । ফলে ১৯২৭ খৃঃ প্রমথনাথের জীবননাট্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল ।

সেই যবনিকা উত্তোলিত হল আবার রাজশাহী কলেজের দৃশ্যে । ১৯২৭ খৃঃ রাজশাহী কলেজে তৃতীয় বর্ষ বি .এ. ইংরাজী অনার্সের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেন প্রমথনাথ । থাকতেন কলেজের নিউ হস্টেলে । তাঁর ভাই পরেশ বিশীও ঐ কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ আই .এস. সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন । বয়সে, শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় প্রমথনাথ ছিলেন রাজশাহী কলেজের অনেক অধ্যাপকের সমতুল্য ।

এই সময় রাজশাহী কলেজে আই .এস. সি প্রথমবর্ষের ছাত্র শ্রী দেবেশ রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে -জীবনের অন্তিম লক্ষ্যেও তাঁদের সেই বন্ধুত্ব ছিল অটুট । প্রমথনাথের এই সময়কার জীবনধারার একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় উক্ত শ্রী দেবেশ রায়ের মন্তব্য থেকে । ' তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, মিতাহারী, পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন । ঘনিষ্ঠ পরিধির ভিতর ভিন্ন আড্ডা দেওয়া, গল্প করা বড় একটা করতেন না । অবসর সময়ে খালি পায়ে বারান্দায় পায়চারি করতেন । অথবা বিছানায় শুয়ে পা দোলাতেন । আর সবসময়ই থাকত হাতে বই । তার বেশির ভাগ ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনা বিশেষ করে শেক্সপীয়ারের' । ২৯ একদিন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্থাগমের দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যরচনার পরামর্শ দিলে প্রমথনাথ বলেছিলেন টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হোত তা হলে তিনি কবিতা না লিখে পাটের ব্যবসা করতেন । প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন এই সময় তাঁর 'দেশের শত্রু ' [১৯২৫] নামক উপন্যাসখানি বিশেষ প্রতিক্রিয়া শুরু করেছিল ।

নিজের মতাদর্শের বিরুদ্ধে তিনি কারও সঙ্গে আপোষ করতে জানতেন না । প্রচলিত হজুগে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করায় এই সময় রাজশাহী কলেজের কতিপয় স্বদেশী ছাত্র তাঁর প্রাণনাশের যড়যন্ত্র করলেও তিনি বিন্দুমাত্র

বিচলিত হননি। নির্ভীক চিত্তে জনমতের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানাতে তিনি ছিলেন নির্দিষ্ট। ১৯২৯ এ বিলিতি বর্জন আন্দোলনের ঢেউ লাগে সর্বত্র। রাজশাহী কলেজে হোস্টেলের ছাত্র সুরেন দাশগুপ্ত বিলিতি সিগারেট মুখে দিয়ে হোস্টেলের ছাত্রদের রোদে মেলা কাপড়গুলো যথেষ্ট পোড়াতে থাকলে অসহায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রমথনাথ গর্জে ওঠেন, 'বিলিতি সিগারেট মুখে দিয়ে অন্যের কাপড় পোড়াতে লজ্জা করছে না?' সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হোল কাপড় পোড়ানো। পরদিন থেকে ছাত্রনেতার মুখে দেখা গেল সিগারেটের পরিবর্তে চুরুট। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে এই ঘটনাটি স্থায়ী হয়ে আছে।

সেই সময় থেকেই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব সহপাঠি ও শিক্ষকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতো।

কলেজের সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনাচক্রে তিনি স্বীয় রচনা পাঠ ও মনোজ্ঞ ভাষণ দান করতেন। এই সময়ে প্রমথনাথের লেখা 'আফিমের ফুল' ও 'প্রজাপতির পক্ষপাত' নামক দুটি নাটকও হোস্টেলেই মঞ্চস্থ হয়। শেষোক্ত নাটকের অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই হোস্টেলেই 'দেনাপাওনা' নাটকে 'জীবানন্দের' ভূমিকায় তিনি সুঅভিনয় করেন।

ছাত্রাবস্থায় প্রায় রোজই কলেজের অদূরবর্তী পদ্মাবক্ষে বন্ধু সমভিব্যাহারে নৌকাবিহারে যেতেন প্রমথনাথ। কখনও যেতেন পদব্রজে পদ্মাতীরবর্তী জনপদ পর্যটনে। এই সময় থেকেই রচিত হতে থাকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'পদ্মা' উপন্যাসের খসড়া।

ইতোমধ্যে জোয়াড়ী গ্রামে পিতা নলিনীনাথের অমনোযোগিতা ও ব্যয়বাহুল্যে জমিদারী ক্রমশঃ ক্ষয়ের পথে চলতে থাকে। চারিদিকে তখন জমিদারী ঘিরে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার জাল জড়ানো। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় প্রমথ বেশী নিজে জমিদারী রক্ষার স্বার্থে দায়িত্বশীল জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে মামলার তদারকি করতেন, উকিলবাড়ি যাতায়াত করতেন এবং প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ দিতেন। ফলে সেই সময়েই তিনি যথেষ্ট বৈষয়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'অশ্বখের অভিশাপ' উপন্যাসে উক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। ১৯২৯ খৃঃ রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। কিছুদিন পরে রাজশাহীর প্রখ্যাত এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্তীর সুদর্শনা কন্যা সুরচিৎসেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। [১৩৩৬ সালের ১লা আষাঢ়]

বিয়ের পর তিনি কলকাতায় এসে ইংরাজীতে এম.এ.পড়ার জন্য ভর্তি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ছয়মাসের বেশী পড়াশুনা চালানো সম্ভব হয়নি।

১৯৩০ খৃঃ পিতা নলিনীনাথ স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে জেলে গেলেন। অন্যদিকে শরিকী সংঘর্ষ ও অনাদায়ী খাজনার চাপে জমিদারীর অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। নেমে এল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কালো ছায়া। এইসব কারণে তিনি

পড়াশুনা ছেড়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলেন নিজ গ্রামে। মনোযোগ দিলেন জমিদারী রক্ষার কাজে। মাঝে মাঝে রাজশাহীতে স্বশুরালয়ে থেকে দীর্ঘদিন ধরে মামলা মোকদ্দমার তদারকি করতেন। এই সময়ে তিনি যে দৃঢ় মানসিকতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বিষয়রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। 'বয়সে তরুণ, স্বভাবে কবি, [তায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ছায়ায় লালিত] সদা বিবাহিত - বিষয় সম্পত্তির জটিল ও দুর্ভাগ্য তত্ত্ব বোঝবার কথা নয় একেবারেই...হারমানবার মানুষ নন উনি - হাল যখন ধরলেন তখন আর সহজে ছাড়লেন না। প্রায় এক বৎসর ধরে সমানে মামলা মোকদ্দমা চালাতে হয়েছে, ঘরে বাইরে অসংখ্য বিদ্বিষ্ট লোকের আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছে, কিন্তু তাতে উনি একটুও দমেননি - সকলের সব অস্ত্রই ওঁর প্রখর বুদ্ধির বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে'। ৩০

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রমথনাথের কঠোর প্রচেষ্টায় বিষয় সম্পত্তির ক্রয়দংশ রক্ষা পেলেও অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠল। এম.এ. পড়ার আশা হয়ে উঠল সুদূর পরাহত। সেই দুঃসময়ে শ্রীমতী বিশী নিজের সঞ্চিত ব্যক্তিগত টাকা খরচা করে স্বামীকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় এম.এ. পড়ার জন্য। বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রমথনাথের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল বলেই শ্রীমতী বিশী ও তাঁর আত্মীয় শ্রী শশাঙ্ক শেখর বাগচির আগ্রহে ও পরামর্শে তিনি কলকাতায় এসে বাংলায় প্রাইভেটে এম.এ. দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কলকাতার শিক্ষাজীবনে একদিন তাঁকে অর্থের অভাবে শুধু জল পান করে ক্ষুধিবৃত্তি করতে হয়েছে। ছাত্র পড়িয়ে প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি কলকাতার ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন। এইভাবে ১৯৩২ খৃঃ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এম.এ. পাশ করেন।

এম.এ. পাশের পরে ১৯৩৩ খৃঃ প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনে যান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কবি গুরু তাঁকে শান্তিনিকেতনে থেকে অধ্যাপনা কার্যে আত্মনিয়োগের কথা বলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শান্তিনিকেতনে থাকতে ইচ্ছা ছিল না প্রমথনাথের। একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা অন্যদিকে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে প্রমথনাথ চলে এলেন কলকাতায়।

১৯৩৩ খৃঃ থেকে ১৯৩৬ খৃঃ পর্যন্ত প্রমথনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে ৭৫ টাকা মাসোহারার বিনিময়ে গবেষণা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই গবেষণা কার্যে সহপাঠীরূপে লাভ করেছিলেন কবি জসিমুদ্দিন, অধ্যাপক এনামুল হক এবং যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যকে। যিনি সিলেট মুরারিলাল কলেজে ও পরে

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন।] প্রমথনাথ ১৯৩৫-৩৬ এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটির সহ-সম্পাদক হিসাবেও কাজ করতেন। সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৩৬ খৃঃ থেকে ১৯৪৬ খৃঃ পর্যন্ত রিপণ কলেজে [বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ] অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৫ এর ২৬ শে জুলাই পর্যন্ত তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকায় আংশিক সময়ের সহযোগী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের ফলে এই কাজে ইস্তফা দেন। ১৩৫০ এর শ্রাবণ থেকে ১৩৬০ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক ছিলেন। তখন সম্পাদক ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এরই মধ্যে রিপণ কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন ১৯৪৬ এর ১লা জানুয়ারী। কলেজের থেকে এখানকার বেতন বেশী হওয়া এবং নিজের সাহিত্যিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগলাভ এই চাকরী গ্রহণের মূল কারণ বলে মনে হয়। তখন আনন্দবাজারের কর্ণধার ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও মুখ্য সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য। চারবছরের কিছু বেশী এখানে কাজ করার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন ১৯৫০ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী। অবশ্য আনন্দবাজারের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করেন নি। 'কমলাকান্ত শর্মা' নামে বিচিত্র বিষয়ে রম্য রচনা জাতীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে যোগসূত্র রেখেছিলেন সুদীর্ঘকাল - ১৯৭১ খৃঃ পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেকচারার থেকে পরে হন রীডার এবং আরো পরে অধ্যাপক। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ছিলেন রথীন্দ্র অধ্যাপক। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ খৃঃ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ এর নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন U.G.C. অধ্যাপক। এর পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে উচ্চতর পদে ও অধিকতর বেতনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রী ত্রিগুণা সেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রী নির্মল সিদ্ধান্ত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি একাধিকবার তাঁকে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু কলকাতার আকর্ষণে তিনি সমস্ত আবেদন ও অনুরোধ এড়িয়ে গেছেন। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হওয়ার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত মাঝে মাঝে আংশিক সময়ের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

শৈশব থেকেই প্রমথনাথ পৈতৃক ও পারিবারিক সূত্রে তখনকার দিনের একমাত্র

শক্তিশালী জাতীয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে ভালোবাসতেন। সেই থেকে আপদে বিপদে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ৬ষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস বিশী ছিলেন কংগ্রেস পরিচালিত শ্রমিক সংঘ 'আই, এন, টি, ইউ, সি' -র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিপরীত কোন শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যক্তির বেলঘরিয়া সদর রাস্তার উপর বোমা ফাটালে তিনি তার আঘাতে মারা যান। সেটা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯৫২ থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় প্রমথনাথের। কংগ্রেস সদস্য না হয়েও কংগ্রেস ভবনে তাঁর আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। এই প্রভাবের মূলে ছিল তৎকালীন কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা শ্রী অতুল্য ঘোষের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব। এরপর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু কর্তৃক মনোনীত বিধান পরিষদের সদস্য এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ এর ২রা এপ্রিল পর্যন্ত ছিলেন রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য। তবে কংগ্রেস দলভুক্ত হলেও যথার্থ রাজনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি রাজনীতি করতে নামেন নি। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে তাঁর মত সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনীতি করে দেশোদ্ধার বা দেশসেবা করা অবাস্তব বা অসম্ভব। অবশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতাপ্রিয় প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্য রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিঃসংশয়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'তাঁহার উত্তরজীবনে রাজনীতির সঙ্গে যোগ ঘটানো হয়েছে। সেখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। সাধারণ রাজনীতিকের মত তিনি সবদিক বাঁচাইয়া চলার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার আনুকূল্য ও প্রতিকূল্যের মধ্যে রক্ষার সেতুবন্ধন সহসা ঘটে না। ফলে তাঁহার ভাগ্যে মিত্রলাভ যত হইয়াছে, সুহৃদ ভেদ ঘটিয়াছে তাহার অনেক বেশী'।^{৩১} কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, প্রমথনাথের অন্যতম বন্ধু শ্রী অতুল্য ঘোষও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন - 'রাজনীতিতে আগের দিনে যাঁদের স্বদেশী বলতো উনি তাই। এবং সে বিষয়ে ওঁর যা মত তা প্রকাশ করতে কোনও দিন দ্বিধা করেন না'।^{৩২}

প্রমথনাথ ছিলেন গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, জগদ্বহরলাল নেহেরু ও মহাত্মাগান্ধীর ব্যক্তিতে আস্থাশীল, ব্যক্তি স্বাধীনতার ভক্ত। হয়তো এই সব কারণেই ব্যক্তি স্বাধীনতা বজ্রিত, বাক্ পরাধীন, সাম্যবাদী রাজনীতির প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। 'প্রমথ বাবু মনেপ্রাণে ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করেন। সেই জন্যই উনি নেহেরুর বিশেষ ভক্ত। আর কতকটা সেইজন্যই কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে ওর অকপট Uncompromising বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষ ওঁর কাছে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের মতই'।^{৩৩}

৩১। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩,

পৃঃ ১৪২৫

৩২। কষ্টকল্পিত—অতুল্য ঘোষ — দেশ, ১৩৮৫,

পৃঃ ১২

৩৩। বড় বিশ্বাস লাগে - গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দেশ, ১৩৬৬,

পৃঃ ১৯৭

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন একাধিক সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলক কাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু নিজেকে সর্বদাই নেপথ্যে রাখতে ভালবাসতেন। 'সব সময়েই নিজেকে অলক্ষ্যে রাখতেন। আমরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে বহু সাহিত্যিককে সংবর্ধনা দিয়েছি। আয়োজনের পুরোভাগে প্রমথনাথ থাকতেন। কিন্তু আমরা কোন দিনই ওঁকে সংবর্ধনা দিতে সক্ষম হই নি'।^{৩৪}

১৩৩১ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় 'বিষ্ণু শর্মা' ছদ্মনামে। 'নূতন কথামালার গল্প' লিখতেন তিনি। কিন্তু ১৯৩১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে পড়াশুনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসার পর থেকেই কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেন। প্রখ্যাত পত্রিকার আনুকূল্য লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি গিয়ে ভিড়লেন - শনিবারের চিঠির সাহিত্যিক চক্রে। সম্পাদক সঞ্জীকান্ত দাস তাকে সাহায্য করলেন - 'আমি তখন নতুন লেখক, বনেদী পত্রিকার দরজা বন্ধ। কাজেই শনিবারের চিঠির মত ব্রাত্য পত্রিকা ছাড়া আর কোথাও স্থান হল না'।^{৩৫} এই 'শনিবারের চিঠির' সরণী বেয়েই মহত্তর সাহিত্য তীর্থে যাত্রা শুরু হল প্রমথনাথের। কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতির পসরা সাজিয়ে সগৌরবে পত্রিকা অফিসে হাজির হতেন। এই পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, মনোজ বসু, বনফুল, পরিমল গোস্বামী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। জি. বি. এস এর অনুসরণে এই সময় নাট্যকার প্রমথনাথ বিশী হয়ে উঠলেন ব্যঙ্গরসিক প্র.না.বি। এই সময়কার প্রমথনাথের একটি মনোজ্ঞ পরিচয় মেলে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় - 'প্রথম সাক্ষাৎ শনিবারের চিঠির অফিসে। . . . প্রমথ বাবুকে সেই প্রথম দেখি। খর্বকায়, সে সময় বেশ একটু দুর্বলও। তবে আলাপের মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাদের এদিকের ভাষায় যাকে বলে হাজির জবাব সেটা তখনও তাঁকে খানিকটা বিশিষ্ট করে রেখেছে। যতদূর মনে পড়ছে পোশাক আশাকে আজকের মতো তখনকার দিনেও ছিলেন উদাসীন। গলাবন্ধলদ্বা চীনে কোট দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে পড়ার জন্যে কিনা বলতে পারিনা, তবে সেদিনও যেন তাঁকে কোঁচা ঝোলানো ধুতির উপর এই কোটেই পাচ্ছি দেখতে'।^{৩৬}

ধীরে ধীরে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তৎকালীন প্রখ্যাত সমস্ত বাংলা পত্র-পত্রিকায় তিনি লেখনী চালনা করেছেন। শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী,

৩৪। দেশ, ১৩৮৫, পৃঃ ১২

৩৫। শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৭-৩৮

৩৬। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩, পৃঃ ১২৮৮

প্রবাসী, কল্লোল, কালিকলম, দেশ, অমৃত, কথাসাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৬৫ তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী'। ১৩৬৬ তে এই উপন্যাসের জন্য তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। পরের বছর আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে প্রমথনাথ বিশীকে 'আনন্দ পুরস্কারে' ভূষিত করা হয় কেরী সাহেবের মুন্সীর জন্য। দুটি পুরস্কারেরই সম্মান মূল্য ছিল ৫০০০ টাকা করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সময়ে তিনি একাধিক পুরস্কার ও উপাধিপত্র লাভ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সর্বদাই একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রেখেছেন। সাহিত্য পরিষদের ট্রাস্টি, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সহ-সভাপতি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি, শান্তিনিকেতন আশ্রমিকসংঘের সভাপতি প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদ ছাড়াও দীর্ঘকাল রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটিতে সদস্য ছিলেন।

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল গভীর। ১৯৪৮-৫০ খৃঃ এর মধ্যে বিভূতিবাবু ও প্রমথবাবু একই সঙ্গে ঘাটশীলায় বহরের বহু সময় পাশাপাশি বসবাস করেছেন। পার্শ্ববর্তী শালবনে একত্রে বসে বহু আলোচনা ও রচনা কার্যে ব্যাপ্ত থেকেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পুস্তকের ভূমিকায়, নিজের কবিতায়, কমলাকান্তের আসরে একাধিকবার তিনি বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক সত্তার প্রশংসামূলক আলোচনা করেছেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরেও তিনি ছোটখাটো বহু কাজে তার আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করে বন্ধু শ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

এ ছাড়া পরিমল গোস্বামী, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, দেবেশ রায়, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কালিপদ রায় (শান্তিনিকেতনে নেপাল রায়ের পুত্র) বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালই ছিল। তবে মোহিতলালের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে [১৯৫০-৫২] উভয়ের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রমথনাথ অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। যে কেউ তাঁকে উপেক্ষা বা অন্যায় কটাক্ষ করলে তিনি আহত বোধ করতেন এবং সুতীত্র প্রতিবাদে মুখর হতেন। রায় বাহাদুর খগেন মিত্রের বাড়ীতে 'রবিবাসরে' উদীয়মান সাহিত্যিক প্রমথনাথকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চেনেন না বলাতে প্রমথনাথের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। ফলে তিনি নিজের নাম শরৎচন্দ্রের মনে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য 'শ্রীকান্তের পঞ্চম

পর্ব' নামক ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প লিখেছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের বায়রণ, শেলী, কীটস, শেক্সপীয়ার, বার্ণাডশ, ম্যাথু আর্নল্ড, ডিকেন্স, হার্ডি, ইয়েটস প্রভৃতি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় লেখক। এছাড়া বিদেশী লেখকদের মধ্যে গ্যোটে, দান্টে, মলিয়ের প্রভৃতিও তাঁর প্রিয়। সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রাজশেখর বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। এছাড়া চার্লিল, নেপোলিয়ান, গান্ধী ও নেহেরুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। নেহেরুর প্রতি পরবর্তীকালে এই ভক্তিদ্বারায় ভাঁটা পড়ে। তাঁর রোগভীতি হাস্যকর। উদ্ভট রোগের কল্পনায় মাঝে মাঝে নিজেকে অসুস্থ মনে করতেন।

বামপন্থী রাজনীতি ও আধুনিক কবিতার উপরে তিনি হাড়ে হাড়ে চটা। নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত পরিবেশে থেকেই ভ্রমণের পক্ষপাতী। ফলে কল্পনার পাখা মেলে মানস ভ্রমণেই তিনি বেশী উৎসাহী। খুব ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরশীল ব্যক্তির সাহচর্যে নির্দিষ্ট দু'একটি স্থান ছাড়া বিশেষ ভ্রমণ করেন না। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই [প্রথম দিকের দু'একখানি কাব্যগ্রন্থ বাদে] পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসে লেখা। রাজশাহী, ঘাটশীলা, দেওঘর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেই তিনি অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। বন্ধুদের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা খুবই সীমিত। সামান্য কারণে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু এই ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী। অনেক ক্ষেত্রে পরে তার জন্য অনুতাপ করেন। তাঁর অবয়বে ও আচরণে অনেক ক্ষেত্রে শিশুর সারল্য, পবিত্রতা ও চাপল্য লক্ষ্যগোচর হয়।

প্রমথ-মানস ভারত চেতনায় বিধৃত। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে বাঙালী বিদ্বেষী বলে মনে হলেও তিনি যথার্থ বাঙালী দরদী। বাঙালীকে ভালবাসেন বলেই বাঙালীর ক্রটি বিচ্যুতিগুলিকে তিনি নির্মমভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকেন। আবার এই বাঙালী প্রীতি তাঁর ভারতপ্রীতিরই এক টি ধাপ, খণ্ডিত ভারত নয়, অখণ্ড ভারতবর্ষই তাঁর সাধনার বেদী, অনুপ্রেরণার উৎস। প্রমথ বাবুর সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা ভারতোপলব্ধির প্রেরণা। তাঁর সাহিত্যের যদি কোন দর্শন থাকে, তা ভারত দর্শন। ৩৭

দীর্ঘ সতের বৎসর শান্তিনিকেতনের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রমথ বিশীকে পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত সাদাসিধে ও উদাসীন করে গড়ে তুলেছিল। সর্বদাই তিনি ধুতি-শাঞ্জাবী, সঙ্গে গলাবন্ধ চীনেকোট বা প্রয়োজনে চাদর ব্যবহার করেন। পায়ে থাকে মোজা ও কাবুলী জুতা। অতিরিক্ত শীত কাতর এবং খাদ্যের ব্যাপারেও সমান উদাসীন তিনি। আহাৰ করেন পরিমিত। চুরুটের বিশেষ ভক্ত। হিন্দুধর্মের কোন বিশেষ পূজা-পার্বণ বা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ দেখা যায় না।

ব্যক্তিগত ভাবে কোন দেব-দেবীর প্রতিও তিনি অনুরক্ত নন। মনে হয় বাল্য ও কৈশোর জীবনে শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে পৌত্তলিকতাবর্জিত, আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বরহীন, ব্রাহ্মধর্ম-প্রভাবিত পরিবেশ তাঁর চিন্তা চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল। শেষ জীবনে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অনুরক্ত হন।

আবাল্য গৃহের বাইরে থাকার ফলে প্রমথনাথ পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার যথার্থ পরিচয় লাভ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। শিক্ষা বা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও পিতামাতার কোন প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। এই সব কারণে তাঁর সাহিত্যে প্রেমিকা, প্রিয়া, যুবতী নারী প্রভৃতির প্রাধান্য। কিন্তু স্নেহশীলা জননী বা স্নেহপ্রবণ পিতার চরিত্র প্রায় অনুপস্থিত।

প্রমথনাথ বিশী ছাত্রবৎসল শিক্ষক, সুবক্তা ও মজলিশী মানুষ ছিলেন। সাহিত্যিক আসর বা গল্পের আড্ডা জমানোর ক্ষমতা প্রমথনাথের স্বভাবজ ও অসাধারণ। উপস্থিতবুদ্ধি, কৌতুক ও ব্যঙ্গের টানাপোড়েন, বিশেষ বাগভঙ্গী, গান্ধীর্ষ ও কৌতুকের ভ্রিমুখী রাজ্যে স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস বিচরণ প্রভৃতি ক্ষমতার সাহায্যে তিনি যে কোন আসরকে মশগুল করে রাখতে পারেন। শনিবারের চিঠি ও বঙ্গশ্রীর অফিসে, মহাত্মা গান্ধী রোডে মিত্র-ঘোষের দোকানে, পুলিন সেনের জিলেপি ক্লাবে, রবিবাসরের বিভিন্ন সভায় সর্বত্রই তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। কোথাও গোপাল ভাঁড়, কোথাও নারদ, কোথাও ফলস্টাফ, কোথাও ডন্ কুইকসোট, যে কোন আসরেই মুখ্য ভূমিকা প্রমথনাথের। তিনিই প্রধান বক্তা ও প্রাণ পুরুষ। 'সব অবস্থাতেই তাঁর মেজাজ হল বৈঠকী আলাপের। মিষ্ট কথা, ইষ্ট কথা, শিষ্ট কথা সব তিনি বলেন হাসির ছিটে দিয়ে। বাঁকা কথা চোখা কথাতেও বাদ পড়ে না এটা'।^{৩৮}

স্পষ্টভাষী প্রমথনাথ সর্বদাই গতানুগতিক চিন্তাধারা-বিরোধী। তাঁর মানসখেয়া সর্বদাই প্রচলিত চিন্তাস্রোতের উজান বেয়ে চলে। 'আসলে কিন্তু প্রমথনাথ আদৌ কাছের মানুষ নন — দূরের আপসা, অস্পষ্ট মানুষ এবং সহজে কাছাকাছি তাঁর যাওয়া যায় না — তাঁর ব্যঙ্গ ও স্পষ্টোক্তির জন্য, তাঁর নিষ্ঠুর সত্যবাদিতার জন্য'।^{৩৯}

এক কথায় তাঁর চরিত্র তাঁর রচনার মতই বৈচিত্র্যবহুল।

১৯৭৫ খৃঃ এর আগে প্রমথনাথ জীবনে বড় অসুখে বিশেষ ভোগেন নি। ১৯৭৫ এ জটিল ধরনের জন্ডিস রোগে বেশ কিছুদিন কষ্ট পেয়েছেন। ১৯৭৮ এর নভেম্বরে তিনি আর একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রস্রাবের কষ্ট শুরু হয়। চিকিৎসার জন্য প্রথমে পি. জি. হাসপাতালে, সেখান থেকে সঙ্কটাপন্ন

৩৮। তদেব - নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

৩৯। তদেব - নীহাররঞ্জন গুপ্ত, পৃঃ ১৪৫৪

অবস্থায় বাড়ীতে, তারপরে বেলভিউ ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ১৯৭৮ এর ১২ই ডিসেম্বর প্রস্টেট গ্রান্ড অপারেশন করানো হয়। তারপর নানারূপ ইনফেকশন হওয়াতে তাঁর জীবন সংশয়ের কারণ খটে। রক্তচাপ কমে যায়, স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। কথাবার্তা হয়ে ওঠে অসংলগ্ন। কিন্তু ধীরে ধীরে বিপদ কেটে যেতে থাকে। সামান্য সুস্থ হয়ে বাড়ীতে নীত হন এবং সেখান থেকে আবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। এখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলেও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ডঃ জ্যোৎস্নাময় মুখার্জী। তার চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানে ক্রমশঃ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেন।

১৯৮৫ খৃঃ এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি বাড়ীতে পড়ে গিয়ে দারুণভাবে আঘাত পান কোমরে। ফলে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় 'রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান' হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সেখানে তাঁর অবস্থা ও স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে অবনতির পথে চলে। এবং ১০ই মে, ১৯৮৫ শুক্রবার তিনি ঐ হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কবি প্রমথনাথ বিশী :

প্রতিভা চিরকালই দুঃস্বপ্ন ও রহস্যময়। কোন ছকে বাঁধা কাঠামোর মধ্যে তার বিচার অচল। আবার ব্যক্তিভেদে তার রূপ ও প্রকাশ স্বতন্ত্র। সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে প্রমথনাথের রচনা - প্রাচুর্য ও প্রকরণ-বৈচিত্র্য অসাধারণ ও বিস্ময়কর। আবার সব শাখাতেই তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য সাহিত্যের কোন একটি বিশেষ শাখার লেখক বলে তাঁকে চিহ্নিত করা অসম্ভব। বস্তুতঃ এই একাধিকরূপে আত্মপ্রকাশ করা তাঁর কাব্য-নিয়তি, চঞ্চলা প্রতিভার অমোঘ নির্দেশ। এই নির্দেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই কারণেই তাঁর সৃজনী প্রতিভার বহু খন্ডরূপ আমাদের মুগ্ধ করলেও তার অখন্ড মৌল রূপটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কাজেই এই সাহিত্যিক-বহুরূপীর যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের মধ্যেই নিহিত আছে প্রমথ-প্রতিভার বিচিত্র সৃষ্টি প্রবাহের মূল উৎসভূমি।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশী একাধিক পরিচয়ে বিশিষ্ট হলেও মূলতঃ তিনি কবি। তাঁর উপন্যাস, তাঁর গল্প, নাটক, রম্যরচনা, সমালোচনা প্রায় সবই মূলতঃ একজন কবির কলমে লেখা। কোন কিছুর উপর চোখ ফেলবার যে বিশেষ ভঙ্গীটি একমাত্র কবির আয়ত্তে, তাঁর সববিধ রচনাতেই তার নিদর্শন সুলভ। তাঁর কবি সত্তারই সম্প্রসারণ ঘটেছে অন্যবিধ রচনায়। গদ্যে পদ্যে সর্বত্রই তিনি কবি। এই বিষয়ে রবীন্দ্র প্রতিভার সঙ্গে প্রমথ প্রতিভার সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠতর।

প্রমথনাথ বিশীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দেয়ালি'। প্রকাশ কাল ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০। নিবেদন অংশে কবি জানানিয়েছেন- 'এই বইটির কবিতাগুলি গত চার বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের লেখা—সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভাবের পরম্পরা খুব কমই আছে। তবু তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া পঞ্চাশটি মাত্র লওয়া হইয়াছে—ইহারা এই চারি বৎসরের বায়ুমন্ডলে উৎক্ষিপ্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন পুষ্পদলের মতই নিতান্ত নিঃসঙ্গ, নিরর্থক ও বৃন্তচ্যুত। . . . পরম পূজনীয় আচার্য রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির নামকরণ করিয়া ইহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন'।^{৪০}

কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে প্রমথনাথের অনেক কবিতা যেমন শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি কিছু কবিতা কবির কৈশোরে রচিত কাঁচা হাতের লেখা ধরে নিয়ে কুণ্ঠিত কবি সেগুলিকে কাব্যাকারে

প্রকাশ করেননি। তবে তাঁর কবিতা রচনার ক্রমবিকাশ জানতে গেলে তাঁর প্রথম কবিতা এবং প্রথম জীবনের কবিতা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেয়ালি কাব্যের কবিতাগুলি মূলতঃ ১৯২০ - ১৯২৩ এর মধ্যে রচিত বলে কবি জানিয়েছেন। কিন্তু ১৯২০ খৃঃ এর পূর্বেও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন - সেগুলিতে চিহ্নিত আছে কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশের পূর্ব প্রস্তুতি।

১৯১০ খৃঃ 'শিশু' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমথনাথের প্রথম রচিত কবিতাগুলির একটি নিম্নরূপ :

বসন্ত

ওগো ঋতুরাজ
দিয়ে কত সাজ
সাজাইলে ধরা,
কত ফুলে ভরা।
কোকিল কুহরে,
মোর মন হরে।
তুমি হে বসন্ত।
ওগে নাই অন্ত।^{৪১}

১৯১২ খৃঃ লেখা 'জাগরণ' নামক একটি কবিতাংশ নিম্নরূপ :

শ্রাবণ গগন তলে মেঘ ভেসে যায়,
তার সাথে প্রাণ মোর ছুটে যেতে চায়।
সুদূর পল্লীর পারে,
শ্যামল ক্ষেতের ধারে,
ছোট ছোট নদীগুলি গান গেয়ে যায়।
তাদের সঙ্গীত বিশ্বে তরঙ্গ উঠায় ॥^{৪২}

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ছন্দ রীতির কথা মনে পড়ায়। ১৯১৬ খৃঃ 'গ্রামের পথে' নামক কবিতায় পথিক কবি সাহিত্যের জটিল ও বিচিত্র পথে দিশাহারা।

৪১। বসন্ত - শিশুপত্রিকা, ১৯১০, শান্তিনিকেতন।

৪২। জাগরণ - 'বাগান' পত্রিকা। শ্রাবণ, ১৩১৯।

তোরা বলগো আমায় বল ।
করিস নেরে ছল,
কোন পথেতে যাবো আমি
পথিক হব কোন পথে,
নানা কথা বলিস নেরে
চলব আমি কার মতে ॥^{৪৩}

১৯১৮ খৃঃ রচিত একটি কবিতাংশ নিম্নরূপ :

ওগো দুর্দাম, ওগো উদ্দাম, ওগো বসন্তবায়ু
ওগো চঞ্চল, ওগো উৎসুক, প্রাণ কম্পিত স্নায়ু
ওগো পুষ্পের ফুল সৌরভে গৌরবে গরীয়ান,
বিশ্বের তালে যোগ করে দাও মোর উন্মন প্রাণ ।^{৪৪}

কবিতাটি প্রকৃতি বিষয়ক, কিন্তু নামকরণহীন। কবি প্রমথনাথের আবেগ কম্পিত চিত্তের উজ্জ্বল প্রকাশে স্পন্দিত, ছন্দিত।

১৯১৮ খৃঃ রচিত, ১৩২৪ সালের চৈত্র সংখ্যা শান্তি পত্রিকায় ১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ঝড়ের আশীর্বাদ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' ও শেলীর "Ode to The West Wind" — এর ভাবানুসারী।

'ফেল' একটি সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক কবিতা — রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যের কাহিনী — কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট — কিয়দংশ উদাহৃত হল —

ফেল করেছে মতি
শুনেই বাবা ক্রুদ্ধ হলেন অতি ।
সরকারদের বাণী
কেমন সুন্দর পাশ করেছে পেয়েছে জলপানি,
খবর শুনে বলল হেসে দাদা
মতিটা যে এতবড়ই গাধা ।
তা শুনে কয় দিদি
পাশ হোত সে ফেল না হোত যদি ।^{৪৫}

৪৩। গ্রামের পথে — 'প্রভাত' পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৩

৪৪। 'প্রভাত' পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৫

৪৫। ফেল — 'প্রভাত' পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৫

কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মতই রবীন্দ্র-শিষ্য প্রমথনাথ জন্ম-রোমান্টিক। তাঁর জীবনে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় দুবার। ইংরেজ কবি বায়রণের 'ডন জুয়ান' এর অনুসরণে 'মন জুয়ান' বলে একটি ব্যঙ্গ কাব্য-শনিবারের চিঠিতে 'স্কট টমসন' ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এই কাব্যটির নামকরণ করেন ঐ পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। পরবর্তীকালে সত্তরের দশকে অতি আধুনিক কবিদের নীরস বুদ্ধিসর্বস্ব, নিরাবেগ, নিরাদর্শ কবিকৃতি উপলক্ষ্য করে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় 'রামকহল শর্মা' ছদ্মনামে 'কলকাতার বাঁশিওয়ালা' নামক মিনি ব্যঙ্গ কাব্য রচনায় প্রয়াসী হন। অবশ্য অসুস্থতার কারণে এটি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুতঃ ব্যঙ্গ কবিতা তাঁর প্রতিভা ও কাব্য নিয়তির অভিপ্রেত ছিল না বলেই দু'বারই এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। আসলে এগুলি তাঁর কবি প্রতিভার স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কাজেই ব্যতিক্রমরূপে চিহ্নিত।

এযাবৎ প্রকাশিত প্রমথনাথের সমগ্র কবিতা মোট পাঁচখন্ডে বিন্যস্ত। এই বিপুল কাব্য সম্ভারকে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) গীতিধর্মী কবিতা, (খ) আখ্যানধর্মী কবিতা, (গ) নাট্যধর্মী কবিতা, (ঘ) চিন্তাধর্মী কবিতা।

প্রতিটি শাখাই বিশদ আলোচনার ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

(ক) গীতিধর্মী কবিতা : কবি জীবনের উষালগ্নে জাত অধিকাংশ কবিতা এই শ্রেণীভুক্ত। আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে গীতি কবিতার আবির্ভাব ঘটে মধুসূদনের হাত ধরে। তারপর বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একাধিক কবি এই কাব্য ধারাকে গতি, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য দান করেছেন। প্রমথনাথ বিশীও নিজ দানের ডালাটি নিয়ে সেই মহার্ঘ দানসত্রের ছত্র ছায়াতলে সামিল হয়েছেন।

গীতি কবিতা মন্বয়। গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ এবং সুতীর কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার গীতি কবিতার প্রাণ। সুরের অনুরণন ও ভাষার ইন্দ্রজাল পার্বতী-পরমেশ্বরৌ মিলে গিয়ে গীতিকবিতাকে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ করে তোলে।

প্রমথনাথের প্রায় সব কবিতাতেই লিরিক বা গীতিসুর থাকলেও মূলতঃ এ পর্যন্ত প্রকাশিত নয়খানি কাব্যকে গীতিধর্মী আখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। [১] দেয়ালি ১৯২৩ [২] বসন্তসেনা - ১৯২৭ [৩] শকুন্তলা-১৯৪৬ [৪] হংসমিথুন - ১৯৫১ [৫] উত্তরমেঘ - ১৯৫৪ [৬] কিংকক বহি - ১৯৫৯ [৭] অগ্রহিতা - ১৯৬০ [৮] রামী ও রাধা - ১৯৮২ [৯] রাখী পূর্ণিমার চাঁদ - ১৯৮২। অবশ্য শকুন্তলা কাব্যখানির মোট চারটি কবিতার মধ্যে কেবল 'বিদ্যাপতির রাধা' কবিতাটি গীতিকা শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

দেয়ালি : দেয়ালি—কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত। পঞ্চাশটি

খণ্ড কবিতার সংকলন। শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থে বা কাব্যগ্রন্থাবলী তৃতীয় খণ্ডে এই পঞ্চাশটি কবিতার কতিপয় অপটুহাতের রচনা মনে করে মাত্র ৩৮ টি কবিতা ছাপা হয়েছে। কবির বক্তব্য - 'দেয়ালি কাব্যের ৩৮ সংখ্যক কবিতাটিতে আমার সমস্ত কাব্যজীবনের মূল বীজটি নিহিত। এই মনোবীজটি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নানা অভিজ্ঞতার বারি সিঞ্চে পুষ্ট হইয়া নানা স্তরে, রূপান্তরে পুষ্পিত, পল্লবিত হইয়া শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে'।^{৪৬}

এই কবিতায় কবি মানসের অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ সত্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ৩৮ নং কবিতায় কবি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

আমি গাবো শুধু প্রেমের গাথা
নাহি ধারি ধার কোন দেবতার
হৃদিমাঝে যার আসন পাতা।
আমি গাবো শুধু নারীর গান
কখনো দেবেরে কোনো মানবেরে
দেবো না বিকায়ে আমার প্রাণ।

[৩৮ নং, 'দেয়ালি' - কাব্য গ্রন্থাবলী - ৩য় খণ্ড]

সমগ্র কবি জীবনে এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছেন পরম বিশ্বস্তভাবে।

শুধু অবিমিশ্র প্রেম নয়, প্রকৃতি-মিশ্র প্রেম-গাথা রচনাই তাঁর মূল কবিকল্পনা।

আমি গাবো গান কেমন করি
ফুলের খবর পায়রে পাতা
কে ভরিয়া তোলে রজনী ধরি
শিশির আখরে ধরার খাতা
আমি গাবো সেই প্রেমের গাথা।

এছাড়া এই কবিতাতেই আছে রোমান্টিক কবি মানসের বেদনাবিধুর চিরকালীন অতৃপ্তি -

ফাগুন যায় রে ফাগুন যায়
সাথে যায় ওই ফুলের দল
অগস্ত্য তৃষ্ণা মিটে না হয়
অশ্রু সাগরে না মিলে তল।

কবি সারাজীবন অসংখ্য কবিতায় প্রেম গীতিহার রচনা করেছেন - বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তুলেছেন। কিন্তু রোমান্টিক মানসের এই প্রেমের মধুর রস কখনও অধ্যাত্ম কথার মিস্টিক রসে রহস্যমেদুর হয়ে ওঠেনি। কবি - জীবনের রহস্যমোচক রূপে দেয়ালি কাব্যের ৮ নং কবিতাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই কবিতা থেকেই জানা যায় যে কবিতাই প্রথমনাথের জীবনের ও সাহিত্যের মৌল উপাদান এবং তার মূল সস্তার শিকড়গুলি কাব্যোদ্যানে প্রোথিত ও সম্বত্ন পোষিত। কবির ভাষায় -

আমার কবিতাগুলি
মোর ইতিহাস
মানস সরসীতীরে
উড়ে আসা হাঁস।
যাদের বেসেছি ভালো
যাদের প্রীতির আলো
মোর মনে ঘুচায়েছে
অধারের বাস
তাহাদেরি সুখে দুঃখে [৮ নং কবিতা, 'দেয়ালি,'
যে ব্যথা বেজেছে বুকে কাব্যগ্রন্থাবলী - ৩য়]
তাই ইহাদের মুখে
মৃদু কল্লোচ্ছ্বাস।

দেয়ালি কাব্যের অধিকাংশ কবিতা প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক। রোমান্টিক কবি-মনের সূক্ষ্ম অনুভব, উজ্জ্বল মুহূর্তের অনপন্যে উদ্ভাস, নৈরাশ্য, বেদনা, প্রাপ্তির উল্লাস অপ্রাপ্তির অতৃপ্তি, বিস্ময়-বিস্ফোর, সুদূরের পিয়াসা, কল্পনার অসীম উৎসার প্রভৃতি রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য কাব্যের মত এই প্রথম কাব্যে ও সুস্পষ্ট।

সৃষ্টি শোভায় কবি-মন মুগ্ধ, বিস্মিত ; তাই সস্তার চেয়েও সৃষ্টি তাঁর কাছে মহিমাময়।

সস্তার প্রতি নাহি মোর লোভ
সৃষ্টিরে যদি বুকেতে পাই। [১২ নং কবিতা, তদেব।]
নিষ্ফল প্রেমের সঙ্করণ দীর্ঘশ্বাস আছে -
বাহুর বাঁধন বিফল হয়েছে, তাই
চাইগো তোমারে বাঁধিতে ছন্দমাঝে,
যে সব ফাগুন দিগন্তে হল হারা
তারাও কবির স্মৃতি নিকুঞ্জে বাজে। [২১ নং, তদেব।]

কবি মনের দোলাচল বৃত্তি ধরা পড়েছে এই কাব্যে। তিনি প্রকৃতি প্রেমিক। শান্তিনিকেতনের পরিপার্শ্ব প্রকৃতি, কোপাই, খোয়াই, লতা, গুম্ব, কান্তার, প্রান্তর, আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, আলো-ছায়া তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে। আবার কলকাতার রুদ্ধ কঠিন শহরজীবন, সেখানকার ভিন্নতর প্রাকৃতিক পরিবেশ, কলিকাতা নগরীর প্রতি কবির একান্ত অনুরাগ ফুটে উঠেছে ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৪ নং শহর-বিষয়ক কবিতা গুলিতে। কবি মনের দোটানা ধরা পড়েছে ২৪ সংখ্যক কবিতায় -

প্রান্তরলক্ষ্মীরে মোর ভালো লাগে, তবু

নগরলক্ষ্মীরে মোর না ভুলিনু কভু। [২৫ নং কবিতা, তদেব]

কুসুমপ্রিয় কবির অধিকাংশ কবিতায় ফুলের ছড়াছড়ি। ২৮ নং কবিতায় আছে একাধিক ফুলের সুরভিত মেলা। শিরীষ, শাল, ঝুমকো, চামেলী, টাঁপা, বেল, শিউলী, লেবু, ঘাস প্রভৃতি ফুলের সমারোহ কবিতাটিকে অপূরণ করে তুলেছে। কবি কীটসের কথা মনে পড়ায়।

এই কাব্যের অধিকাংশ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে কবি-মানসীর উপস্থিতি। প্রেমের ক্ষুদ্রোত্তে প্রকৃতি হয়েছে সরস ও সজীব। এই কারণেই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় -

তুমি যদি চলে গেলে দিবসাবসানে

এই সব প্রকৃতির আর কিবা মানে। [২৭ নং, তদেব]

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের প্রেম বিষয়ক কবিতাবলীর ভাব ও ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় এই কাব্যের অনেক কবিতার।

আমি উদ্দাম হয়ে উঠিতে চাই

চল বিদ্যুত বেগে ছুটিতে চাই

অঞ্চল বাধা সরমের

ঝঞ্ঝার বেগে টুটিতে চাই

তনু সৌরভ লুটিতে চাই।

[৫ নং, তদেব]

কবিতাটি কবিগুরুন্দের নির্ঝরার স্বপ্নভঙ্গের ভাব ও ভাষার কথা মনে পড়ায়।

আবার কবিগুরুন্দের শহর সম্পর্কিত ভাবনার বিপরীতমুখী চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন

ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট
নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা

[বধু - মানসী কাব্য - রবীন্দ্রনাথ]

এবং ইটের পাঁজা নহে মহানগরী আজ
পাঁজরে আছে তার প্রাণের নীড় ।

[৩৫ নং - দেয়ালি]

তরুণ কবি প্রমথনাথের এই কাব্যের কবিতাগুলির স্নিগ্ধ আভা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনকে নন্দিত করেছিল নিঃসন্দেহে। এই কাব্যের দেয়ালি নামকরণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তরুণ কবির প্রাণাবেগে কম্পিত অনুভূতির স্বচ্ছস্নিগ্ধ, প্রীতিপূত আভাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দেয়ালি কাব্যের অধিকাংশ কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক, কিছু প্রেম-কেন্দ্রিক। ভাবের গভীরতা বা ভাষার অলংকার-সমৃদ্ধ কারুকার্য না থাকলেও সহজ, সরল ভাব-ভাষা মিলে কবির ভাবী কাব্যভাবনা ও রূপাদিকের সার্থক প্রস্তুতির পটভূমিকা হিসাবে এই কাব্যের স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এই কারণেই, এই সহজিয়া সৌন্দর্যের গুণেই তৎকালীন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় দেয়ালি প্রশংসিত হয়েছিল। 'এই তরুণ কবির কবিতাগুলি আজকাল মাসিক পত্রের অনেক কবির কবিতাপেক্ষা সুখ পাঠ্য। কবিতাগুলির ভাবের দৈন্য নাই, ভাবারও সৌন্দর্য্য আছে'।^{৪৭}

বসন্তসেনা : ১৯২৭ খৃঃ শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত এই কাব্যখানির মূলে নাম ছিল 'বসন্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা'। কবিতা সংখ্যা ছিল ৩০। ১৩৬৭ সালে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে এর ২৪ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্য গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ডে 'নন্দকুমার' নামক একটি কবিতা বাদে মোট ২৯ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যের কয়েকটি কবিতা 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকায় এবং অধিকাংশ কবিতা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কাব্যাকার আত্মপ্রকাশের পূর্বে।

রবীন্দ্রনাথ বসন্তসেনা পাঠ করে পত্র মাধ্যমে তাঁর ভালো লাগার কথা এবং কাব্যটি প্রথম শ্রেণীর বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। - 'তোমার বসন্তসেনা পেয়ে ভালো লেগেছে।^{৪৮} কিংবা - 'আমি যখন বলছি বসন্তসেনার কবিতা ভালো হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে আমি যদি টিকিট পরিদর্শক হতুম তাহলে এগুলিকে উচ্চশ্রেণীরই অধিকার দিতুম'।^{৪৯}

-
- | | | | |
|-----|--|-----|-----|
| ৪৭। | প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩০, | পৃঃ | ৩৮৫ |
| ৪৮। | শুভাকাঙ্ক্ষী, রবীন্দ্রনাথ-পত্র সংখ্যা ৪, | পৃঃ | ১২ |
| ৪৯। | তদেব — | পৃঃ | ১৫ |



এ গ্রন্থের কবিতাগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে ত্রিধাবিভক্ত করা যায় -

- (১) প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা
- (২) প্রেম বিষয়ক কবিতা
- (৩) প্রেম ও প্রকৃতি-মিশ্র কবিতা

এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'বসন্তসেনা'- য় কবি দেহের জয়গান করেও দেহাতীত রহস্যের আবরণ উন্মোচনে বদ্ধপরিকর। 'কে দেখেছে ভেদ করি মাংসের জঞ্জাল রহস্য আত্মার,' বা

'আত্মার বিদ্যুৎদীপ্ত সে রহস্যখান
আজিও অচেনা
আছে আশা একদিন পাইব সন্ধান
হে বসন্তসেনা।'

কবির কাছে প্রেম গতিশীল ও চিরন্তন -

জীবন যবে অস্তে যাবে তখনো নাহি ভয়
প্রেমেরি হবে জয়।

[প্রেমের জয় : বসন্তসেনা]

রোমান্টিক মন বৈচিত্র্য পিয়াসী এবং চির অতৃপ্ত, ফলে বেদনাবিধুর -

কাহারে চাই আমি কি তাহা জানি।
ওগো অরূপ ওগো অচিন তুমি !
বৃন্ত হতে ছিঁড়িয়া মনখানি
নিঙাড়ি তারে যে সুধা টেনে আনি
চাহি কি তাহা ? তাও তো নাহি জানি।
বেদনা শুধু বেড়েই চলে যায়
ওগো অরূপ ওগো অচিন তুমি !

'পূর্ণিমা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ফরমায়েশ মত কোন একটি পূর্ণিমা রাতে শান্তিনিকেতনে সাহিত্য আসরের জন্য খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে রচিত হয়। মাটির পুতুল, বৈশ্বানর প্রভৃতি কবিতা ছন্দোবদ্ধে ও বক্তব্য বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের বিস্ময়রণী কাব্যের 'দীপশিখা' কবিতাকে স্মরণ করায়। অবশ্য এই মিল যতখানি বহিরঙ্গগত, ততখানি অভ্যন্তরীণ নয়। 'কুণাল' কারুণ্যসিক্ত একটি কাহিনীমূলক কবিতা।

উত্তরমেঘ : ১৯৫৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তখন মোট কবিতার সংখ্যা ছিল ১৭ টি। 'শ্রেষ্ঠ কবিতায়' এদের মধ্যে ১৩ টি স্থান পেয়েছে। এই কাব্য সম্পর্কে কবির বক্তব্য - 'এই কাব্যে গদ্যছন্দ, গদ্য পদ্যের সংমিশ্রণে নানারূপ পরীক্ষার চেষ্টা আছে'।^{৭০}

স্পষ্টতঃই বোধ্য যে কবির পূর্ব প্রকাশিত কাব্যমালার সঙ্গে এ কাব্যের পার্থক্য অনেকখানি। বিষয় বস্তুতে না হলেও রূপ-রীতিতে অভিনবত্ব সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস বিধৃত আছে সবকটি কবিতায়। এই কাব্যের গদ্যছন্দ বিশেষত্বযুক্ত। প্রথম কবিতা 'যুগছন্দ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। বাংলা পয়ারকে কেন্দ্র করে কবি তাঁর সমস্ত কাব্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন তারই প্রেক্ষাপটে আধুনিক কাব্যের ছন্দহীনতার স্বরূপকে নিষ্ঠুর সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বাঙ্গালী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন ছন্দের বিচিত্র প্রয়াসের মূল্যবান ইঙ্গিত। সব যুগেই যুগ-প্রতিনিধি কবির আবিষ্কৃত ছন্দ তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় বনিয়াদে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক যুগে মানব চরিত্র এত সংশয়-সংকুল, জটিলতাপূর্ণ ও আত্মপ্রত্যয়হীন যে এ যুগের কবি বা কাব্যের নিজস্ব কোন ছন্দ বা আঙ্গিক নেই।

প্রতি যুগ সন্ধান করে আপন ছন্দ।

এ যুগের ছন্দ কই ?

কুয়াশার চাঁদ যেমন হাতড়ে হাতড়ে পথ চলে

এযুগের বাণী তেমনি অন্ধ,

তেমনি ছন্দোহীন।

এযুগের ছন্দ কই ? [যুগছন্দ : উত্তরমেঘ]

যুগ-বাণীকে, যুগ-সাহিত্যের অন্তঃস্পন্দকে, যুগ-স্রষ্টাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এমন সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট। কবি নিজে গদ্যছন্দে এই কাব্যের একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু ছন্দের অন্তঃস্পন্দ ও শব্দচয়নের লালিত্য এবং সুরসঙ্গতি তাকে পদ্যছন্দের মতোই কিংবা তার থেকে বেশী মহিমান্বিত করেছে। কবির প্রতিভার যাদুস্পর্শে গদ্য পদ্যের সীমানা একাকার হয়ে গেছে অথচ উৎকৃষ্ট কাব্যরস উদ্বোধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 'দলমা পাহাড়ে' কবিতায় মানব ও প্রকৃতির ভেদাভেদ গেছে মুছে। ভাষা ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষার ঘটেছে চূড়ান্ত। এটি মূলতঃ একটি সুদীর্ঘ গদ্যকবিতা। ৫ টি স্তবকে বিভক্ত কবিতাটির তৃতীয় স্তবকটি সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত। অথচ সে গদ্য ছদ্মবেশী পদ্য। 'সাঁওতাল পরগণার মাঠে' আছে প্রকৃতির অঙ্গনে মানবসংসারকে দেখার দুর্লভ ক্ষমতা। নিরেট বস্তুরসকে কাব্যরসে উন্নীত করা হয়েছে। কবির দেখার চোখকে সাহায্য করেছে তাঁর মনের চোখ। দুয়ে মিলে দর্শনের পূর্ণতা লাভ ঘটেছে। 'যৌবনের সূর্যাস্ত' কবিতাতে আছে প্রেমিকা নারীর কৈশোর, যৌবন ও উত্তর যৌবনের তুলনামূলক বর্ণনা। উপমা অলংকারের কারুকার্য ও প্রবহমান পয়ারের ছন্দে ছন্দে ছন্দিত হয়েছে প্রেমিকা নারীর

নন্দিতরূপ । বিচ্ছুরিত হয়েছে সর্বাংগবের লাবণ্যদীপ্তি । প্রকৃতির রঙ-বেরঙের তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে নারী দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু আর পরিণতি পেয়েছে সৌন্দর্যশতদলে ভরা পূর্ণতার সমুদ্রসঙ্গমে । 'আমি টাইম টেবল পড়ি'— কবিতায় মানস ভ্রমণলিঙ্গ কবির মনসিঙ্গ বাস্তব চিত্র বাস্তবকেও হার মানিয়ে দেয় । শালবনের ছায়ায় নদী পরিবৃত পাহাড়, রেল স্টেশনের খুঁটিনাটি, ট্রেনের বিচিত্র গতিভঙ্গী সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির লেখনীর যাদুস্পর্শে; কবি প্রিয়ার কল্পিত বাসস্থান, তাঁর দেহতটের নিখুঁত বর্ণনা, কিছু প্রেমভিত্তিক তত্ত্বকথা বাস্তবের জারক রসে জারিত হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত । আর কবির প্রকাশভঙ্গী এত অব্যাহত, অনায়াস ও গতিশীল যে পাঠক হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে তোলে । একেই বলে বোধ হয় আন্তর্ভাব (Inner reality) । একটি সার্থক কবিতা ও অনবদ্য শিল্পসম্পদ এটি ।

নুলিয়া, দুজ্জের, পৃথিবীর প্রতি, সমুদ্র, দ্বৈত এই চারটি কবিতা সমুদ্র বিষয়ক । প্রথম পরিচয়ে পুরীর সমুদ্রের গহন-গভীর রহস্যময় রূপ, তার বিশালতা ও বৈচিত্র্য কবিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবিয়ে তুলেছিল । তারই প্রশস্তি ও বিশ্লেষণ এই কবিতাগুলি ।

কিংকবহি : ১৯৫৯ খৃঃ প্রকাশিত এই কাব্যটি সম্পর্কে কবির মন্তব্য— 'কিংকবহি কাব্যেও গদ্যে পদ্যে মিশাইয়া নূতন রূপ প্রস্তুতের চেষ্টা আছে । আমার অধিকাংশ কাব্যের মতো এ কাব্যেও প্রেমের কথাই প্রধান ' ।^{৫১} প্রেমকেন্দ্রিক কবিতার সংখ্যাধিক্য থাকলেও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । গুলমোহরের কুঞ্জে কোকিল, বনস্থলী প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত । এই কাব্যের 'হে সুন্দরী' কবিতার সুন্দরী মনে হয় কবিতাসুন্দরী বা কল্পনাসুন্দরী ।

'কিংকবহি' কাব্যের মুখবন্ধে শ্রী প্রতুল চন্দ্র গুপ্তকে এ কাব্য উৎসর্গ করে একটি কবিতা রচিত হয়েছে । সেখানে বাস্তববাদী আধুনিক কবিদের স্বপ্নের দাস এবং নিজেকে স্বপ্নের প্রভু বলে বর্ণনা করেছেন কবি -

স্বপ্নের যে প্রভু আমি করক ভরিয়া
বাস্তবের সুধা মোরে দেয় যে ধরিয়া
তখন বুঝিতে পারি হেরি নিনিমিত্ত
একই সত্তার তারা এদিক ওদিক ।^{৫২}

বাস্তব ও কল্পনার সার্থক সমীকরণ ও তার সাহায্যে বস্তুকে শিল্পে উত্তীর্ণ করাতেই কবি প্রমথনাথের সার্থকতা ।

৫১ । তদেব, পৃঃ ২

৫২ । কিংকবহি - উৎসর্গ কবিতা - ১৩৬৬, প্রথম সং

অগ্রহীতা : এককভাবে যে কবিতাগুলি কাব্যের আকারে আত্মপ্রকাশ করেনি তাকেই কবি অগ্রহীতা আখ্যা দিয়েছেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে। প্রকাশকাল মাঘ, ১৩৬৭। তখন কবিতাসংখ্যা ছিল ১১টি। মনে হয় 'রেল স্টেশনের গল্প' আখ্যান কবিতা বলেই ঐ রীতির কাব্যসংকলনেই ২য় খণ্ডে তার স্থান মিলেছে। অন্যগুলি সবই গীতিকবিতা শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে ৩য় খণ্ডে ঠাঁই পেয়েছে। সবগুলিই প্রেমের কবিতা। সঙ্গারী রস হিসাবে এসেছে প্রকৃতি বর্ণনা। এদের মধ্যে 'সংসার' কবিতাটি উৎকৃষ্ট, যদিও টমাস হার্ডির একটি কবিতার (World thou hast been faithful to me) - - - অনুপ্রেরণা-সঞ্জাত। এই কাব্যের সম্পর্কে কবির বক্তব্য - 'যৌবন বিদায়ের বেদনা ইহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এ বেদনা সমস্ত বর্ষীয়ান কবিকেই অনুভব করিতে হয়। তবে অনেকে দিব্য প্রতিভা বলে বেদনাকে আনন্দে পরিণত করিতে পারেন, বলা বাহুল্য আমি সেই অতি ক্ষুদ্র সৌভাগ্যবান দলের মধ্যে নই'। (কাব্য গ্রন্থাবলী [৩য়] - পৃঃ-৩)

ইহা কবির বিনয়। কারণ এই কবিতাগুলি কবির অনন্যসাধারণ রোমান্টিক প্রতিভার যাদুস্পর্শে রসোত্তীর্ণ। 'রামী ও রাধা' এবং 'রাধী পূর্ণিমার চাঁদ' প্রেম বিষয়ক গীতিকবিতা - সুরঝঙ্কার, গীতিমুচ্ছনা ও ভাবগভীরতা অসাধারণ।

সনেট : প্রথমনাথ বিশীর গীতিধর্মী কবিতার সম্প্রসারিতরূপ তাঁর সনেট। আধেয় এক, আধার ভিন্ন। অবশ্য গীতি কবিতা থেকে সনেটের বিষয়বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি অনেক কম। সনেট গীতিকবিতা-সমুদ্র মছনসঞ্জাত কৌস্তভমণি। সনেটের অভিনবত্ব আসে মুখ্যতঃ তার অষ্টক ও ষটক বন্ধের মধ্যে ভাবের ভারসাম্য ও সঙ্গতি রচনার অজস্র ও অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ফলে। অবশ্য রীতির দাসত্ব নয়, রীতির উপর আধিপত্য বিস্তারেই কবি-শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিচয়। " In a perfect Sonnet what we admire is not so much the author's skill in adapting himself to the pattern as the skill and power with which he makes the pattern comply with what he has to say." ৫০

কাব্যগ্রন্থাবলী ৪র্থ খণ্ডে সনেট সর্বস্ব দুটি গ্রন্থ সম্বিষ্ট - (১) প্রাচীন আসামী হইতে (২) প্রাচীন পারসীক হইতে। প্রথমটিতে আছে ১৩৩ টি এবং দ্বিতীয়টিতে ১৮০ টি সনেট ১৯৩৪ খৃঃ থেকে ১৯৫৭ খৃঃ মোট ২৩ বছরের ফসল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ইতোপূর্বে দেয়ালি কাব্যে (১৯২৩) কবি ১৩, ১৮, ২২ নং কবিতায় সনেট রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যদিও সেগুলি অপরূপ হাতের অপরিণত রচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের সনেট গুলিতে যেমন একজন কবি-মানসীর উপস্থিতি উপলব্ধ হয়, এই সনেটগুলির মধ্যেও অনুরূপ সত্তার সন্ধান মেলে।

বিশেষতঃ 'প্রাচীন আসামী হইতে' কাব্যে, কবি-মানসী, কোন এক আসামবাসিনী সপ্তদশী। ৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ১৩৩ নং সনেটে তাঁর উপস্থিতি স্পষ্ট। কবি-মানসীর সঙ্গে কবির কাল্পনিক সংলাপে মনে হয় যেন মুখোমুখি বসে প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে চলেছে কবির মুখর ভাষণ। এই ধরনের সনেট - ৪৯, ৫৬, ৫৮, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৮১, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৬, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩০ নং। প্রাচীন আসামী হইতে।। এছাড়া কবি-প্রেমের স্বরূপ, কাব্যের স্বরূপ, উৎস ও জীবনদর্শন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ১৪, ১৬, ২৬, ৪১, ৬৬, ৭৩, ৭৪, ৮১, ৮৭, ৯০, ৯১, ১০৭, ১১৯, ১২১ প্রভৃতি সনেটগুলিতে। প্রাচীন আসামী হইতে।। মনে হয় এই কবি-মানসী ছিল শান্তিনিকেতন-প্রবাসী ও ব্রহ্মপুত্র-নিবাসী। ব্রহ্মপুত্র আসামের অন্তর্গত। এই আসামবাসিনীকে অমর করে রেখেছেন কবি তাঁর সনেটগুলিতে। এই জন্য প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ পত্রে ছিল বাংলায় যার অনুবাদ- 'হে ধানশ্রী তীরবাসিনী, ব্রহ্মপুত্র তীর নিবাসী কবির এই দীন অঞ্জলি গ্রহণ কর।' এক সময় শান্তিনিকেতনবাসী কবি এগুলির নামকরণ করেন 'প্রাচীন অসমীয়া হইতে অনুবাদ।' Lady Browning - এর "Sonnets from Portuguese"- থেকেই কবি উক্ত নামকরণে উৎসাহিত হন। তবে মূলতঃ এগুলি অনুবাদ নয়, মৌলিক কবিতা - যার মূল উৎস মনে হয় কোন অসমীয়া সপ্তদশী। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে এই কবিতাগুলি রচনার অনুপ্রেরণা পান কবি।

১ম সংস্করণের ৫৬ টি কবিতার সঙ্গে আরও ৭৭ টি যুক্ত করে কবি ২য় সংস্করণে এই গ্রন্থের নাম দেন 'যুক্তবেণী'। ১৩৫৫ সন।। পরে তৃতীয় সংস্করণে আবার 'প্রাচীন আসামী হইতে' নামকরণই বহাল রাখেন।

এই কাব্যে প্রকৃতি যেন প্রেমিকা সখীর আনন্দ ও বেদনার নিত্যসঙ্গী। কখনও কখনও একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন - 'প্রেম ও প্রকৃতি কবিচিন্তে যে ছায়াপাত করিতেছে তাহারই আলিম্পন আঁকা হইয়াছে'। ৫৪

আর একজন বিদগ্ধ সমালোচকের মতে সনেটগুলির মিলরীতিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে - 'সর্বত্রই যে ইউরোপীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে তা নয়। কেন্দ্রীয় অনুভূতি ও রূপচিত্র ধ্বনি ও মিলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে একটি মিশ্ররূপের অন্তরালে। বহিরঙ্গের কাঠিন্য থাকলেও কিছু সনেটগুলির মধ্যে লিরিকের উপাদান ও স্পষ্ট। কোনো কোনো সনেট প্রচ্ছন্ন ভাবে গীতিকবিতা'। ৫৫

৫৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪ খণ্ড, সুকুমার সেন, ১৩৬৩ পৃঃ ২৯০

৫৫। কথা সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ পৃঃ ১৪৭৪

প্রাচীন আসামী হইতে কাব্যে সেই অকৃত্রিম প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে যা শিলাপটে মিলনপিয়াসী নর নারীর ভাস্কর্যরূপ, যা চিরমিলিত অথচ চিরবিচ্ছিন্ন :

এস এইখানে বসি, আজ শেষ বার
ওই হাত হাতে দাও, ওই দুটি আঁখি
রাখো মোর মুখ পরে, গাঢ় কেশভার
খুলে যাক, এই মতো কিছুক্ষণ থাকি ।

তারপর চিরদিন এ হিমাদ্রি প্রায়
নিম্নলে মেলিয়া বাহু চাহিব তোমায় ॥

[৪৯ নং সনেট : প্রাচীন আসামী হইতে ।

এই ব্যাকুলিত ও প্রসারিত বাহুর নিম্নলতা আর বাহুর নাগালের বাইরে চিত্রার্পিত নায়িকা, সেই শিলাপট, ধানশ্রী-ব্রহ্মপুত্রের অসমাপ্ত শাস্বত মিলন । 'এক-লক্ষ্য গভীর গতি, সুনির্বাচিত অর্থবহ শব্দের বিন্যাস, মন্তের মতো সংক্ষিপ্ত এবং গভীর, সমাপ্তিতে চতুর্দশ দলের মতো চৌদ্দটি পংক্তি একটি পরিপূর্ণ পদ্য হয়ে উন্মীলিত, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য সেই উন্মীলনের প্রস্তুতি, সমাপ্তির বিকাশে যে আকস্মিক গন্ধোচ্ছ্বাস -তাই সনেটের রসব্যঞ্জনা । 'প্রাচীন আসামী হইতে' -র অনেক কবিতায় এই স্বাদই আমি লাভ করেছিলাম' । ৫৬

'প্রাচীন আসামী হইতে' কাব্যটির বাস্তবভিত্তি ও তার রসসৌকর্য্য বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ শ্রী সুশীল কুমার দে বলেছেন - 'বর্তমান যুগের ভাবজীবন, যে সত্য ও স্বপ্নের, যে বাস্তব সুখ ও অসুখের দ্বারা আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে তাহাই এই প্রেমিক কবির গভীরতম চেতনা ও অন্তরতম অনুভূতির মধ্যে অপূর্ব রসপরিণতি লাভ করিয়াছে । ভাবপ্রবণ হইলেও কবি দেহবাদী কিন্তু দেহতান্ত্রিক নহেন । জীবন তাঁহার নিকট সত্য, সেইজন্য দেহ ও মন উভয়ই তাহার নিকট সত্য । কিন্তু জীবন সত্য বলিয়া যে সত্য জীবনাতীত তাহাকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই । . . . ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি কেবল স্বপ্নের রাজ্যে বাস করেন নাই । ধরণীর মৃত্তিকার উপরই কাব্য শ্রেয়সের সন্ধান করিয়াছেন । . . . ইহা অসুস্থ চিন্তের অপুষ্ট কাকলি নহে, সহজ অনুভূতির সবল উক্তি । সুতরাং আশা করা যায় যে এই . . . কাব্য বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বল্প হইলেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে' । ৫৭

পঞ্চাশ বছর আগের এই মন্তব্য আজও সমান মূল্যবান ।

পরবর্তীকালে রচিত 'প্রাচীন পারসীক হইতে' [১৩৭৫] কাব্যটির সনেটগুলি

আরও পরিণত শিল্পকর্ম হলেও 'প্রাচীন আসামী হইতে' কাব্যের সনেটগুলির প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান। ভাষা-সংযম, মিল-বিন্যাস ও ভাব-ভাবনা আরও পরিণত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কবির প্রেমিক হৃদয় আরও বেদনা-বিধুর ও সংযম-সমুজ্জ্বল।

উক্ত গ্রন্থ দুটিতে বিভিন্ন সনেট রীতির বিচিত্র রূপায়ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পেত্রার্কান, শেক্সপীরীয়, মিলটনীয়, স্পেন্সারীয়, ফরাসী সনেট তো আছেই সেই সঙ্গে আছে প্রতিভাবান কবির স্বকপোল কল্পিত, স্বরচিত বিভিন্ন মিল বিন্যাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। Wordsworth - যেমন শেক্সপীরারের সনেট সম্পর্কে বলেছিলেন - 'With this key Shakespeare unlocked his heart' - তেমনি বলা যায় প্রমথনাথ বিশীও এই সনেটগুলির মাধ্যমে তাঁর মনোমন্দিরের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করেছেন।

(খ) আখ্যানধর্মী কবিতা : এই শ্রেণীর কবিতা প্রমথ-কাব্য ধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। স্বয়ং প্রমথনাথের মতে আখ্যানধর্মী কবিতা বাংলা কাব্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর কবিতার সরণী বেয়েই বাংলা কাব্যাকাশে নূতন দিগন্তের সূচনা হবে। 'নবীভূত পয়ার ও ন্যারেটিভ কবিতার মধ্যেই বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ'। ৫^ম কাব্যগ্রন্থাবলী ২য় খণ্ডে ১৪ টি কাহিনী-কবিতা স্থান পেয়েছে। এ কাব্য সংকলনটি সংস্কৃত মতে খন্ড কাব্যের সংগ্রহ, আর পাশ্চাত্যমতে বিবরণমূলক কাহিনী কাব্য (Narrative Poems)। ১৯২৯ থেকে ১৯৬৯ মোট ৪০ বৎসর এদের রচনাকালব্যাপ্তি। অবশ্য ১৯২৭খৃঃ প্রকাশিত 'বসন্তসেনা' কাব্যে অবস্থিত 'কুণাল' নামক একটি কাহিনী - কবিতাকেই এই কাহিনী - কবিতাগুলির পূর্বসূরী বলা যায়।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম কবিতা বিদ্যাসুন্দর [১৯২৯]। এই কবিতাটির মূল কাহিনীর উৎস নিহিত আছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে এবং সংস্কৃত চৌর পঞ্চাশিকা আখ্যানের মধ্যে। অবশ্য প্রমথনাথ তাঁর আধুনিক রোমান্টিক কবি-প্রতিভার যাদুস্পর্শে মধ্যযুগীয় ঐ সামান্য কাহিনী-সূত্র অবলম্বনে অপরূপ শিল্পমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, যা একাধারে আধুনিক ও আনন্তিক। কালিকামঙ্গল বা চৌর পঞ্চাশিকার ধর্মভাব ও স্থূলরূচি বিদ্যাসুন্দর কবিতায় অনুপস্থিত। ৪৭৭ পংক্তিতে সমাপ্ত এই কবিতায় কবি তাঁর রোমান্টিক কল্পনার উপর নির্ভর করে একটি বস্তুকাহিনীকে চিরন্তন সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করেছেন। এখানেই কবির কৃতিত্ব। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে চিত্রধর্মিতা ও সাঙ্গীতিক মূর্ছনা সৃষ্টিতে ইংরেজ কবি কীটসের 'Eve of St. Agnes'-এর প্রভাব আছে। সেই সঙ্গে চিত্রকল্প ও হৃদয় লালিত্য সৃজনে আছে এডমন্ড স্পেন্সারের 'Faerie Queene'-এর প্রভাব। স্পেন্সারীয়

ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘমহুর পয়ার ছন্দের বিলম্বিত লয় ব্যবহার করেছেন কবি। প্রবহমান এই ছন্দে এগিয়ে চলেছে অজস্র চিত্রের মিছিল। আর এই জন্যই 'এই রোমান্টিক কাব্যে ক্লাসিক সংহতি ও সংযম রক্ষিত হয়েছে। এ কাব্যের চারিদিকে অতীতচারী চিত্রসৌন্দর্যের সঙ্গে ভাস্কর্যরীতির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের যে মায়াক্রম নির্মিত হয়েছে তার জন্য খ্যাতকীর্তি শিল্পীর বর্ণাঢ্যতুলি এবং ভাস্করের ইম্পাতকঠিন ছেদনিকা প্রয়োজন, যা বিশী মহাশয়ের হস্তামলকে পরিণত হয়েছে'।^{৫৯}

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী পাঠকালে মধ্যযুগীয় কবি ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষার চর্চিত চর্চণ নয়; কবির মৌলিক সৃষ্টি।

অতি আধুনিক বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রের পরিধি অতিশয় সীমিত, শীর্ণ ও বৈচিত্রহীন। নিতান্ত আত্মমুখী, ভাবাত্মক কবিতা ছাড়া অন্য সর্বপ্রকারের বিষয় বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ কবিতা বাংলা সাহিত্য থেকে নির্বাসিত হয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা অতি অল্প সংখ্যক দীক্ষিত পাঠক-লেখকের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি। এখন কাহিনী-কাব্যের স্থান দখল করেছে ছোটগল্প ও উপন্যাস। কিন্তু প্রমথনাথ বিশী একজন আধুনিক কবি হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক গোষ্ঠীবদ্ধ কবিদের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত - তাই সাধারণ রসিক পাঠকদের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় ও আকর্ষণীয়। 'লিরিক ও গাথা উভয় শ্রেণীর কাব্যেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনেক সময় লিরিকের জ্বলাভূমিতে কাহিনীর স্থাপত্য শিল্প তেমন সংহত মহিমায় দানা বেঁধে উঠতে পারে না বিদ্যাসুন্দর বা প্রাচীন গীতিকা হইতে-র কবিতাবলীতে আশ্চর্য নিপুণতায় এই ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে'।^{৬০}

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' [১৯৩৭] কাব্যের মধ্যেই আছে তিনটি বড় কবিতা - মহায়া, দস্যু কেনারামের মুক্তি ও মলুয়া। এই তিনটি কবিতার উৎস মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিসম্পদ ময়মনসিংহগীতিকা। অবশ্য প্রায় দু শতক আগের বাংলা পল্লী প্রান্তের লোক-কবিদের ভাব-ভাবনার সঙ্গে আধুনিক কালের শিক্ষিত ও দীক্ষিত এই কবিবরের মিলের থেকে বেশী আছে অমিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। শুধু প্রাচীন কাহিনীর চুম্বক নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে কাব্যমোদী পাঠকের রস পিপাসা চরিতার্থতার এই অপূর্ব আয়োজন বাংলা সাহিত্যে বিরল। মহায়া-র যে কোন একটি স্তবকের উদাহরণ নিলে দেখা যাবে উপমা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে, শব্দ সম্পদে, রসে ও মাধুর্যে 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' কাব্যখানি মনোহর।

যেমন -

৫৯। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৩১৬

৬০। তদেব, রথীন্দ্রনাথ রায়,

পৃ: ১৪৩৩

চামেলি-চমক-লাগা শশী-রাকা নীরব শবরী
 পাখি-জাগা আলো-আঁকা ছায়া-ছাঁকা পথে
 যুগল ঘোড়ার ক্ষুর রহি রহি উঠিল শিহরি ;
 এ সাথে কোকিল ডাকে, কুহস্বর অন্যশাখা হতে,
 সুরের বসন খানি বুনে দেয় স্তব্ধ বায়ুপ্রোতে।
 ধরণীর রসোচ্ছ্বাস কুসুমের অজস্র বুদ্ধদে
 অসহ্য প্রাণের ভরে - বৃত্তপরে কাঁপে শতে শতে
 মৃত্যুর ললাটে দেয় জীবনের পত্রলেখা বুদে,
 সৌরভের স্বয়ম্বরে প্রাণ স্বপ্নে মরণের নেত্র আসে মুদে ॥

(১৮ নং স্তবক : মহায়া - প্রাচীনগীতিকা হইতে)

মহায়ার কাব্যোৎকর্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ' কাব্যে
 তোকে সুচিশিল্পী বললেই হয়, লাইনে লাইনে রেশম, পশমের ফুল কেটে চলেছিস, তার
 মধ্যে সোনালি, রূপালি জরিও ঝলক দিচ্ছে । . . . ভাষায়, উপমায় রচনাটা ঝলমলিয়ে
 উঠেছে, ঘটনা পড়েছে ঢাকা ' । ^{৩১} সত্যিই কাহিনী অংশ গৌণ হলেও এ কাব্যের শিল্পগুণ
 অসাধারণ ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কাহিনী-কাব্যে প্রাচীন বিষয়কে নবায়িত রূপান্তরিত ও
 ভাবদ্যোতনায় যে ভাবে শাস্ত্রত সাহিত্য-মূল্যে ভরিয়ে তুলেছেন সেই পথ ধরেই
 প্রমথনাথ এই কাহিনীকাব্য গুলিকে করে তুলেছেন সুন্দর ও মনোহারী ; অবশ্য
 রবীন্দ্রনাথের মত প্রমথনাথের কাহিনী কবিতায় মৌলিক ভাবনার প্রাধান্য অনুপস্থিত ।
 কবি এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির রসে, ভাষা ও ছন্দের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রাচীন
 কাহিনীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগিয়ে আধুনিক সাজপোশাকে সজ্জিত করে যেভাবে
 আধুনিক পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব ।

ইতিহাসের ছায়াপটে আঁকা এক বিরাট চরিত্রের নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস
 বর্ণিত হয়েছে নেপোলিয়ন [১৯৩৪খঃ] কবিতায় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নেপোলিয়ান ইতিহাসের
 অসম সাহসী, দুর্ধর্ষ বীর চরিত্র, বিরল ব্যক্তিত্ব এবং কবির খুবই প্রিয় চরিত্র । এই
 কবিতা প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য - ' নেপোলিয়ান ' কবিতাটির গতি দ্রুত, মধুর রসের বদলে
 ইহাতে ইতিহাস প্রধান উপজীব্য, সঙ্গে কিছু পরিমাণে তত্ত্বও আছে । . . . বায়রণের
 চাইল্ড হারল্ডের প্রভাব জনিত ' । ^{৩২} ইতিহাসের একক চরিত্র নিয়ে কাব্য রচনার
 উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে বিরল । এছাড়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা তথ্যকে কাব্যিক সত্যে

৬১। শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ, ১৫ নং পত্র, পৃঃ ২৭

৬২। কাব্যগ্রন্থাবলী (২য়), পৃঃ ৫-৬

ও সৌন্দর্যে উন্নীত করা খুবই দুর্লভ ব্যাপার। "The superiority of poetry over history consists in its possessing a higher truth and higher seriousness . . . The superior character of truth and seriousness in the matter and substance of the best poetry is inseparable from the superiority of diction and movement marking its style and manner."^{৬৩}

আঙ্গিক কুশলী কবি প্রথমধন্য ইতিহাসের রসকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যিক সৌন্দর্যে পরিণত করেছেন। তবে এই কবিতাটি সর্বত্রই যে খুব সুখপাঠ্য তা মনে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত কবিতাংশ রসিক পাঠক-হৃদয়ের কাছে নীরস ও দুর্বল ঠেকে।

অকুন্তলা, লালশাড়ি, ক্যালকাটা রোডে ও রেলস্টেশনের গল্প এক জাতের কবিতা। 'এই সংলাপ বহুল কবিতাগুলিতে Romance ও Humour মিশাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কাজটি সহজ নয়। আর ভাষাও প্রয়োজনস্থলে গদ্যের গা ঘেঁষা'।^{৬৪}

এই কবিতাগুলিতে চিত্রিত কাহিনী সম্পূর্ণ এ কালের। একালের জীবনরসে সম্পৃক্ত বেদনার বিষমতা, খুশির প্রসন্নতা, কৌতুক রসি, ঈষৎ ব্যঙ্গের অল্প মধুর স্বাদুতা এই কবিতাগুলির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতিভাবান কবির কলমে প্রাত্যহিক জীবনের আপাত বর্ণনাত্মক রূপও নূতন মহিমা পেয়েছে। 'অকুন্তলা' কবিতায় বোম্বে মেলের ও স্টেশনের সুদীর্ঘ বর্ণনায় বহু গদ্যাত্মক খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। আবেগ বিরল গদ্যাত্মক বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির বাক্ চাতুর্য ও তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী।

'যুগপৎ বহুশব্দ - চা, খাবার জল,
কুলি, কুলি, মিহিদানা, সের কত বল—
শব্দের মৌচাক যেন ভেঙেছে হঠাৎ।
আমারি গাড়ির দ্বারে একি উৎপাত!
উঠিয়া দাঁড়ানু বেগে, আশা ছিল মনে
সাহেবী পোশাক মোর পড়িলে নয়নে
কুলিটা সরিতে পারে। সে আশা নিষ্ফল,
বঙ্গদেশে সিংহচর্ম একান্ত অচল।
না মানে সাহেবে তারা, না মানে পোশাক;
চটিলাম বাঙালীর দুঃসাহসে।' [অকুন্তলা : অকুন্তলা]

৬৩। Essays in Criticism (2nd Series) 1951 — Mathew Arnold, Page — 13.

৬৪। কাব্যগ্রন্থাবলী (২য়) পৃঃ ৬

বলা বাহুল্য এ বর্ণনার মধ্যে গদ্য শিল্পী প্রমথনাথের বাগবৈদগ্ধ্য ঝংকৃত হয়েছে। এছাড়া এন্টিক্রাইম্যাকসের প্রবল ধাক্কায় কবিতাটির আকস্মিক পরিসমাপ্তি - পাঠকচিস্তাকে সচকিত করে তোলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বর্ণরঞ্জিত পরিবেশ ছেড়ে কবি আধুনিক যুগের জটিল ও যন্ত্রনা-বিদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে পদক্ষেপ করেছেন। এ কাব্যে বিষয়বস্তুতে ও কাব্য প্রকাশের ভঙ্গীতে কবিতা ও গদ্যের ব্যবধান লুপ্ত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত বাগবৈদগ্ধ্য ও ভাষার চলতি মেজাজ। বাংলা কাব্যের সীমানাকে এই নূতন রীতি নিশ্চিত ভাবে অনেকখানি প্রসারতা দান করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী জীবনে ও মননে যে পট পরিবর্তনের সূচনা হয়, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন শুরু হয় - বাংলা কাব্যেও তার প্রতিফলন দেখা দেয়। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে প্রতিভাসিত হয় ভিন্ন মুখী জটিলতা ও নূতনত্ব। বস্তুতঃ কোন শিল্পী সাহিত্যিকই স্ব-সমাজ ও স্ব-কাল বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। প্রমথনাথ ও পারেন নি। তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে রচিত 'ত্রিশঙ্কু,' 'ঘটোৎকচ', 'যুগিষ্ঠির ও কুকুর' এবং 'কুরুক্ষেত্রের পরে' কবিতাগুলিতে। 'অনেকে বলিয়া থাকেন আমার রচনায় সমাজ চেতনা নাই। এখন সমাজচেতনা বলিতে যদি বিশেষ এক প্রকার রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিধ্বনি বুঝায় তবে সত্যই নাই। কিন্তু ব্যাপক ও প্রকৃত অর্থে সমাজ চেতনা না থাকিলে এগুলি কখনই লিখিত হইতে পারিত না। একথা আরও সত্য 'বিয়াল্লিশের কথা' কবিতাটি সম্বন্ধে।"

বিয়াল্লিশের বিপ্লব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজনীতি এর মূল উৎস। স্বদেশপ্রেমিতি এর প্রাণস্পন্দন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে কোন কবিতা লিখিত হয় নি। প্রমথনাথ এই কবিতাটির মধ্যে ১৯৪২ এর রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায়ের জালে জড়িত, অত্যাচারিত দেশবাসী এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার কঠিন পণ ও কঠোর সংগ্রাম, দেশ-প্রেমের গৌরব ছটায় দীপ্ত সাধারণ মানুষের অসাধারণ রূপ সব কিছুই সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। দ্রুতগতি প্রবহমান প্যারে রচিত এই বাস্তব জীবন-গাথা বাংলা কাব্যের নূতন পথের দিশারী। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের খনিত পথ ধরেই প্রমথনাথ বাংলা কাব্য বাহনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন।

'স্বচ্ছন্দ অমিত্রাঙ্করে কোথাও বা মিত্রাঙ্কর যুক্ত অমিত্রাঙ্করে সাধুভাষার ঠাটে তিনি একালের রঙ্গময়ীদের চরিত্র আঁকিয়াছেন। এই সমস্ত কবিতার পয়ার ছন্দ কিছু মধুর হইলেও তাহাতে তাঁহার বাক্য কটাক্ষ ও রঙ্গকৌতুক দিব্য জমিয়া উঠিয়াছে।

কয়েকটি কবিতায় এ কালের সমাজ, ইতিহাস ও পরিবেশ বেশ ফুটিয়াছে, কোথাও বা ব্যঙ্গ ও খিক্কারের ভিতর দিয়া দেশপ্ৰীতি আত্মপ্রকাশের পথ করিয়া লইয়াছে।

কবিতাগুলিতে কবি-চেতনা মূলতঃ রোমান্টিক, এবং রোমানস প্রধানতঃ চিত্রগীতিময়। বিভিন্ন বর্ণসূচমা, ক্লাসিক যুগের দুটি একটি চিত্র, স্নিগ্ধ গম্ভীর অলংকরণ এবং ধ্বনি সুখকর শব্দ ঝংকার কবিতা কয়টির চারিদিকে প্রীতি নিষিক্ত আবরণ রচনা করিয়াছে। . . . তাঁহার কবিতার প্রধান আবেদন হৃদয়ের কাছে। আবেগ ও কল্পনার পাখায় ভর করিয়া কবি একাল ও সেকালের আকাশে যথেষ্ট উড়িয়া বেড়াইয়াছেন। এবং পাঠককেও দুই বাহু ধরিয়া সেই আকাশের অবকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন। বুদ্ধির ইতস্ততঃ উকিঝুঁকি যে একেবারে নাই তাহা নহে। তবে তাঁহার কাব্য-যাত্রার প্রধান নাবিক বুদ্ধি নহে। কল্পনা তাঁহার কাব্য-তরণীর হাল ধরিয়াছে, পুরাতন পালে নূতন হাওয়ার বেগ সামলাইয়াছে। বুদ্ধির হিংটিংহেট বা মননের abracadabra - র হেঁয়ালি, দুরাশয়, দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতা প্রভৃতি অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তিনি আবির্ভূত হন নাই। . . . ইহাতে ছদ্ম তত্ত্বকথার উৎকট গাঙ্ঘীর্ষ নাই, বিচ্ছিন্নতা নামক আধুনিক মানসিক ব্যাধির বাড়াবাড়ি নাই, "নির্জন, নিঃসঙ্গ, একাকী" প্রভৃতি কৃত্রিম অশান্তির অকারণ হাহতাশ নাই। . . . যাঁহারা কাব্য-কবিতা হইতে বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারের মীমাংসা চাহেন না, ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থকীট হইতে যাঁহারা ভোগের আনন্দ পাইতে উৎসুক, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রমথনাথের এই কবিতাসঙ্কলন [২য় খণ্ড] হইতে একটি স্বাদু উপলব্ধি লাভ করিবেন'। ৬৬ প্রমথনাথের সমস্ত আখ্যানধর্মী কবিতা সম্পর্কে সমালোচকের এই বিশ্লেষণ ও রসোপলব্ধি রসিক পাঠক কুলের আন্তরিক স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হবে বলেই বিশ্বাস।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচনাশৈলী, ভাবের সঙ্গে ভাষা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এই কাহিনীমূলক কবিতাগুলির বাহন সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপুষ্ট শক্তিশালী পদ্যছন্দ—পয়ার। কৃষ্ণিবাস, কাশীরাম দাস থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের কলম ছুঁয়ে পয়ার আধুনিক যুগে মধুসূদনের হাতে নবরূপ লাভ করে। মধুসূদন-সৃষ্ট সেই পয়ারভিত্তিক অমিত্রাক্ষরের পায়ে অন্ত্যানুপ্রাসের নূপুর পরিয়ে এই পদ্যাতিক ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যশীলা করে তুলেছেন। প্রবহমান পয়ার বা মুক্তক ছন্দ এই নূপুর পরা অমিত্রাক্ষরের রূপান্তর ব্যতীত কিছু নয়। এই প্রবহমান পয়ারকেই প্রমথনাথ বিশী করে তুলেছেন আরও স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল, সর্বপ্রকারের ভাবাবেগ বা চিন্তাভাবনার উপযুক্ত বাহন। কখনও এই পয়ারকে গদ্য পদ্ধতির অধিবাসী বলে মনে হলেও সে সর্বদাই আত্মস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল থেকেছে।

ভাবের সঙ্গে ভাষার, বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচনাইশৈলীর এমন সার্থক সমীকরণ উচ্চাঙ্গের কবি-প্রতিভার পরিচায়ক।

(গ) নাট্যধর্মী কবিতা : প্রমথনাথ বিশীর কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডে যে চারটি কবিতা স্থান পেয়েছে তার সব কটির মধ্যে [পলাতক বিধাতা বাদে] নাটকীয়তা এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও বিশেষ করে 'নবান্ন' কবিতাটিকেই নাট্যধর্মী কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কাব্য গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ডে 'যুধিষ্ঠির ও কুকুর' নামে একটি কবিতা আছে। এটিকে নাট্যধর্মী কবিতা আখ্যা দেওয়া যায়। এই কবিতায় নাটকীয় নৈর্যাত্তিকতা বজায় রেখে পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে কুকুররূপী ধর্মরাজ ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের আন্তরসত্তা, স্ব-স্ব চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ ঘটানো হয়েছে।

মূলতঃ 'নবান্ন' কেই নাট্যধর্মী কবিতা বলা সম্ভব। যদিও এর মধ্যে তত্ত্বপ্রধান, চিন্তাধর্মী কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। এই কবিতাটি নাটকের আকারে কাব্য। নাটকীয় একটা সুস্বন্দ্র আবরণ থাকলেও মূলতঃ এটি কাব্য। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, কৌতূহল, মৃত্যু প্রভৃতি থাকলেও কাহিনীর একটি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে গীতিময়, ছন্দোময়, কবি-চেতনা সমৃদ্ধ একটি মহৎ ভাবনা স্থান পেয়েছে এ কাব্যে। এই কারণেই কবিতাটিকে নাটক হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন কবি - 'কবিতাই বটে, তবে নাটকের একটা ভাগ আছে'।^{৬৭}

মনে রাখা প্রয়োজন এটি ১৯২৪ খৃঃ অর্থাৎ কবির প্রথম জীবনের রচনা। কবি তখনো নিজের সৃষ্টিপথের নির্দেশ আপন হৃদয়ে অন্বেষণরত। কবিতার মধ্যে নাটকীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও ভাবাদর্শ স্থাপন করে নিজের প্রতিভা বিষয়ে একটা নূতন পরীক্ষায় রত।

পল্লী সভ্যতা ও নগরসভ্যতা, সারল্য ও লোভ-লালসার সংঘাত ফুটে উঠেছে প্রথম দিকে -

আর তারা ফিরিবে না ফসলের ক্ষেতে,
আর তারা ফিরিবে না পল্লী গৃহ কোণে,
আর তারা শস্যকাটি নবান্ন উৎসবে
মিলিবে না একসাথে। আজ হতে তারা

স্বর্ণগড়া মন্ত্রশিখি জাদুবিদ্যাবলে

দিক প্রাবী উচ্চতর শ্রোতে

ভেসে যাবে রাত্রিদিন। [নবান্ন : কাব্যগ্রন্থাবলী-১ম খণ্ড]

তারপর হিরণ্যকের লোভ-লালসা-জীর্ণ জীবনের প্রতি উশীরের দুর্নিবার আকর্ষণ বন্ধ করতেই প্রাণ দিতে হল অংশুমানকে। মৃন্ময়ী ধরণীকে নবান্ন উৎসবের আনন্দে পরিপূর্ণ করতেই শূন্য করতে হলো অংশুমানের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘেরা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ জীবন-প্রদীপ। কিন্তু তার এই মৃত্যু নবজীবনের ব্যঞ্জনা নয় মহীয়ান -

আবার ফিরিয়া পাবে হে বন্ধু আমারে
বর্ষে বর্ষে অঘ্রাণের নবান্ন উৎসবে ॥

[নবান্ন : কাব্যগ্রন্থাবলী-উত্তর পর্ব]

নবান্ন কবিতার বিষয়বস্তু বা নাট্যভাবনায় রবীন্দ্র-প্রভাব থাকলেও প্রকাশ কলায় বা বাণী-শিল্পে কবির নিজস্বতা অবশ্যস্বীকার্য। এ কবিতার রূপদৃষ্টি ও চিত্রকল্পসৃষ্টি কবির নিজস্ব সম্পদ। এ কবিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল-শুধু বিষয়বস্তু বা কাব্যশাখার পরীক্ষা নয়, এখানে আছে ভাষা বা বাহনের পরীক্ষা। সুদীর্ঘ কবিজীবনে প্রমথনাথ মুক্ত পয়ার বা প্রবহমান পয়ার নিয়ে, তার স্থিতিস্থাপকতা, শক্তি, দার্ঢ্য, উপযোগিতা বিষয়ে যে সার্থক এবং বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার সূচনা ঘটেছে 'নবান্ন' নাট্যকাব্যে।

(ঘ) চিন্তাধর্মী কবিতা : কাব্যগ্রন্থাবলী উত্তরপর্ব (১ম খন্ড) - এর অন্তর্ভুক্ত চারটি কবিতার 'পলাতক বিধাতা' [১৯৫৬] 'টুলি' [১৯৭৪] এবং 'তপঃসিদ্ধ' [১৯৭৪] বিশেষভাবে চিন্তাধর্মী কবিতা। প্রতিটি কবিতাই সুদীর্ঘ। কবিতাগুলির রসান্বাদন বোধ ও বুদ্ধি নির্ভর। কবির মননশীলতার পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট। ফলে কাব্যসত্তোগ-কারীকে হতে হবে একাধারে রসিক ও মননশীল। পলাতক বিধাতা কবিতায় ঈশ্বর কেন্দ্রিক একটি চিন্তাগর্ভ তত্ত্বাদর্শকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঈশ্বরকে অবলম্বনে তাঁর অন্য কোন কবিতা নাই।

সৃষ্টিলীলায় যে ভগবান স্রষ্টা, মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-নৈরাশ্যের উৎসাহ-অবসাদের সাক্ষী-এ কবিতা সেই ভগবানের কবিতা। এ ভগবান হিমালয় রচনায় ক্লান্ত হয়ে শিশিরকণা গড়েন, সাহারা রচনায় শ্রান্ত হয়ে ময়ূরের কলাপ রচনায় ব্যস্ত থাকেন, আকাশ থেকে হঠাৎ ধরণীর প্রান্তে নেমে আসেন, মানুষের মাঝেই মুক্তি ও আনন্দ লাভে ধন্য হন।

ক্ষণতরে কাজে লও ছুটি,
পলাতক হে বিধাতা, আমি তব

সঙ্গে এসে জুটি। [পলাতক বিধাতা : কাব্য গ্রন্থাবলী-উত্তর খন্ড]

পাপ-পুণ্য, ধর্মাদর্ম, সত্যাসত্য, সুন্দর-অসুন্দরের উর্ধ্বে যে জীবন আসলে এ হল সেই

জীবনেরই বিশ্বরূপ দর্শন। তাই কবির উক্তি -

জীবনের পূর্ণ করো, রেখো না বঞ্চিত। [তদেব]

আবার উক্ত প্রজ্ঞাঘন উক্তির পরেই উপসংহারে তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব -

এখানে ঘাসের বনে মোর সনে আজ

ধরণী ও হল পলাতকা,

বসেছি দুজনে মোরা পাশাপাশি

তুমি, আমি সখা। [তদেব]

সমালোচকের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় - 'সর্বতোভাবে দার্শনিক কবিতা - অকুতোভয়ে এবং অলঙ্কারভাবে দার্শনিক কবিতা "পলাতক বিধাতা"। এইটিই এ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা'।^{৬৮}

'ঢুলি' কবিতাটির দার্শনিক গভীরতা অনতি প্রচ্ছন্ন, কিন্তু তার প্রকাশিত রূপটি আদ্যন্ত কৌতুকরসসিক্ত।

'এ হল হাসির দর্শনতত্ত্ব, অথবা হাসির বিশ্বরূপদর্শন বা বিপরীতভাবে বিশ্বের হাস্যরূপদর্শন। কবির দৃষ্টিতে হাসিই আদি সত্য ও পরিণাম সত্য। কবিতাটি দেবতা বিষয়ক। কিন্তু সে দেবতা বজ্র বিদ্যুৎধারী নন, পিনাকপাণি নন, সে দেবতা হাস্যময়, হাস্যস্বরূপ - হাসিই তাঁর তন্মাত্র। ঢুলী শিল্পী, সেই হাস্যস্বরূপের দূত - স্বর্গের চক্রান্ত - সেই ঘোষণা করে -

হাসির তুফান নিত্য বহে

জগৎ পারাবারে,

এই তুফানে বাঁচতে প্রাণে

যে পারে সে পারে'।^{৬৯} [ঢুলি : কাব্যগ্রন্থাবলী - ১ম খন্ড]

পয়ারের সহজ, সাবলীল গতিভঙ্গিমায় ও সর্বভার বহনক্ষম নমনীয়তায় ঢুলী অসাধারণ মহিমা লাভ করেছে। এই ধরনের স্মিত হাস্যাধরা প্রসন্ন পয়ারের প্রবহমানতা বাংলা কাব্যোতিহাসে অবিরল নয়। সমালোচকের ভাষায়—'পলাতক বিধাতা এবং ঢুলীর দার্শনিকতার সঙ্গে মিস্টিকরসের মিশ্রণ - কবিতাদুটির ভাবব্যঞ্জনাকে গাঢ়তর এবং দূরপ্রসারী করে তুলেছে সন্দেহ নেই। . . . প্রমথনাথ লঘু কৌতুককরের সঙ্গে সারবান গুরুগম্ভীরকে, নাচের চটুলতার সঙ্গে গদ্যের ভারী চলনকে, সাহিত্যিক চুটকির

৬৮। কথাসাহিত্য, ১৩৮২, পৃঃ ৬২৭ সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

৬৯। তদেব

সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বসিদ্ধান্তকে, হাসির সঙ্গে প্রজ্ঞাকে, শুদ্ধপ্রায় বিবৃতির সঙ্গে সহৃদয় হৃদয় সংবাদকে সানন্দে এবং অনায়াসে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন'। ১০

তপঃসিদ্ধ : একটি চিন্তাধর্মী দীর্ঘ কবিতা। বিষয়বস্তুতে প্রকৃতির প্রতিশোধের কিঞ্চিৎ আভাস আছে, কারণ যে কোন কঠিন ও একদেশদর্শী তপশ্চর্যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে হৃদয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অবশ্য নাট্যকল্পনা ও জীবনদৃষ্টি রাবীন্দ্রিক নয়, কবির নিজস্ব। কবি তাঁর সমসাময়িক যুগের একটি নির্মম সত্যকে এই কবিতার আধারে অতি নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন। সেই সত্যটি হল এ যুগের একদেশদর্শী নির্মম, নিরঙ্কুশ বিজ্ঞান সাধনা ও বিজ্ঞানের অমানবিকতা।

এই কবিতার ভাবের বাহন কবির একান্ত মৌলিক সম্পদ। কাব্যভাষা কবির নিজস্ব। সমিল প্রবহমান পয়ায়ে রচিত এই কবিতার ভাষা যেমন ঐশ্বর্যময় তেমন শক্তিশালী। এই ভাষাই এই কবিতাকে রসোত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছে। এ শুধু বাহন নয় - এই কবিতার অনন্য সম্পদ। তবে একদিকে কন্যাও তার সমস্যা, অন্যদিকে পিতা, কংকাল ও পিতার সমস্যা - মাঝখানে সময়ের ব্যবধান - এর ফলে কবিতার কেন্দ্রীয় ঐক্য বোধ হয় কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে।

এই কাব্য খন্ডের কবিতাগুলি চিন্তাভূয়িষ্ঠ, তত্ত্বপ্রাণ, রহস্য পরিবৃত। কবিতাগুলির সব কটিই বিশেষভাবে রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্সের কল্পলোকে পাড়ি জমালেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্কের মত মর্ত্যপ্রেমে বাঁধা কবিচিন্তা ভূতলের স্বর্গধন্ডকে ভুলে যেতে পারেন নি। বস্তুতঃপক্ষে এক অদৃশ্য মর্ত্য মমতার ফস্তুদ্বারা এই কবিতাগুলির আর এক আন্তরসম্পদ। যেমন -

ঝাঁঝরি ভরিতে চাই জীবনের রসে,
মরীচিকা নদে বাঁধি ঘাট,
ভাঙা ঘরে সযতনে বন্ধ করি
লোহার কপাট ॥

তার চেয়ে ভালো এই সুবর্ণরেখার
শুদ্ধখাত স্বপ্নতোয়া নদী,
সে বারিতে কিবা কাজ মর্ত্যশ্রম
না হরিল যদি
স্বর্গের অমৃত চায় মর্ত্যের পঞ্চল,
সত্য চায় মিথ্যার সঙ্গতি,

পাপের আফিঙফুলে ঘুরে মরে

পুণ্য প্রজাপতি ॥ [পলাতক বিধাতা]

তুলি কবিতাতেও সাধারণ গৃহস্থ মানুষের অসীম জীবনাকৃতি ও ধূলি ধূসরিত সংস্কার ও সংসারের প্রতি সুতীর আসক্তি নিবিড় মমতায় চিত্রিত হয়েছে। বস্তুতঃ কবি প্রমথনাথের এই কাব্যখণ্ডে আছে মর্ত্যমমতার স্বাক্ষর - 'যে প্রেম সময়ের শাসন মানে না, ঘোষণা করে 'Love is not time's fool' — যে কাব্যগ্রন্থে তার সাক্ষাৎ পাই, তা সাম্প্রতিক না হলেও আধুনিক বলেই আমার বিশ্বাস'। ৭১ এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমথনাথকে আধুনিক কবি বলা যায় নিঃসন্দেহে।

প্রমথ কাব্য পরিক্রমা শেষে প্রমথনাথের কবি প্রতিভা বিষয়ে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রমথনাথ বিশী কবি হিসাবে জন্ম রোমান্টিক ; প্রেম ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে, বস্তুজগৎ ও কল্পজগতের রাখী বন্ধনের মাধ্যমে এক অনিন্দ্যাসুন্দর সৌন্দর্যলোক ও রসলোকের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তাঁর কাব্যে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যে বাংলা কাব্যের স্বভাবজ রোমান্টিকতার স্বপ্নিল কল্পজগৎ পরিত্যাগ করে নব্য ইউরোপের বস্তুধর্মী ও বস্তুসর্বস্ব কবিধর্মকে অনুসরণ করার হিড়িক পড়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দেয় বাংলা রোমান্টিক কাব্যের প্রতি আধুনিক কবিদের বীতস্পৃহা, বিদ্রোহ, অবজ্ঞা ও উদ্ভাসিকতা। কিন্তু মূলতঃ বাংলা কবিতা ও তার অনুভূতি-কল্পনা, চিন্তা-চেতনা, মেজাজ ও মানসিকতার সঙ্গে রোমান্টিকত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত। এটাই বাংলা কবিতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অতএব এই স্বাভাবিক জগৎ থেকে কৃত্রিমতা-কণ্টকিত অপরিচিত পথে অন্ধের মত পদক্ষেপ করলে তাতে পদস্থলন ও পথভ্রমের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে এই চিত্রই চোখে পড়ে বেশী। এছাড়া যে মহতী প্রতিভা থাকলে অতি সাধারণ বস্তুলোককে রসলোকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাও আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে নিতান্ত বিরল।

রবীন্দ্রনাথ জগতের মহত্তম জন্ম-রোমান্টিক কবি। আর প্রমথনাথ বিশী সাক্ষাৎ রবীন্দ্রশিষ্য। রবীন্দ্র মানস সঙ্গমের তীর্থোদকে শুচিন্নাত প্রমথনাথ খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা কাব্যে রোমান্টিকতার পথে পদচারণা করেছেন। শুধু রবীন্দ্র প্রভাবে নয় তাঁর মানস প্রকৃতিই ছিল রোমান্টিক। এ ব্যাপারে অন্যদের মতো দ্বিধা-সংকোচ, ভয় বা কুষ্ঠা না রেখে সর্বসমক্ষে সগৌরবে নিজেই রোমান্টিক কবি বলে প্রকাশ করেছেন তিনি। 'আমি রোমান্টিক প্রকৃতির কবি— অনমনীয় অননুতপ্ত, অলঙ্ঘ্য রোমান্টিক

প্রকৃতির '। ৭২

একদিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিরাজ রোমান্টিক। কারণ তারা প্রায় সকলেই বিশেষভাবে ভাব সর্বস্ব ও একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তবে তাতে রূপের অরূপ মাধুরী, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য বা বৈচিত্র্য সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। প্রকৃতির সীলামাধুরী তাঁদের মনোবীণায় কোন সুরের অনুরণন তোলে না, রসের পিপাসা চরিতার্থ করে না। বহুদিন আগে সুকবিতা বিচার প্রসঙ্গে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিবিড় সংযোগের সার্থকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আধুনিক কবিদের কাব্যে এই বহিঃপ্রকৃতি নিতান্তই অনুপস্থিত। আর প্রমথনাথ রোমান্টিক কবি হলেও আধুনিক রোমান্টিক নন - বঙ্কিমচন্দ্রে ইঙ্গিত রোমান্টিক কবি। - 'আজকের রোমান্টিকতার সঙ্গে তাঁর রোমান্টিকতার যোগ খুব গভীর নয়। তাঁর রোমান্টিকতা সেই পুরানো গোত্রের, মিশ্রবর্ণের রোমান্টিকতা যার সঙ্গে রিয়ালিজমের কী দৃষ্টিতে, কী পদ্ধতিতে কোনো ক্ষেত্রেই একটুও বিরোধ নেই। যে রোমান্টিকতা কাব্যের পরিসরের ছুৎমাগী সংকোচন ঘটায়, তাঁর রোমান্টিকতা সে গোত্রের নয়। তাঁর রোমান্টিকতায় পৌরুষের অভাব নেই'। ৭০ রোমান্টিক কবি প্রমথনাথ মনের দিক থেকে চিরনবীন। জীবন ও জগৎ, প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কাছে 'নিতুই নব'। চোখে তাঁর অফুরন্ত বিস্ময়, মনে তাঁর অনন্ত উৎসাহ, অতলাস্ত ভালোবাসা। তিনি চিরপিয়াসী চির অতৃপ্ত -

অগস্ত্যতৃষ্ণা না মিটে হয়

অশ্রু সাগরে না মিলে তল ॥ [দেয়ালি : ৩৮ নং]

এই অতৃপ্তি রোমান্টিক কবির এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

প্রমথনাথ জন্ম সূত্রেই রোমান্টিকমনা। শান্তিনিকেতনের নিসর্গ পরিবেশ, রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য-পরিমন্ডল তাঁর এই মানসিকতাকে পুষ্টি দান করেছে। ছাত্র জীবনে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় কালীদাসীয় ও কীটসীয় সৌন্দর্যলোকের অপার রহস্যজগতে প্রবেশের আনন্দ তাঁর মানসিকতাকে পরিণত করেছে, ভাবানুভূতিকে গভীরতা দিয়েছে। কবির নিজের স্বীকারোক্তি - 'আমি রবীন্দ্র পরিমন্ডলে মানুষ। তবু আমার কাব্যের রূপনগরীর রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন রবীন্দ্রকাব্যের কুক্ষিকায় হয় নাই, হইয়াছে বিদেশী কবির একটি কবিতায় - কীটসের নাইটিংগেল'। ৭১ অন্যত্র তিনি বলেছেন - 'ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পরে শেলি ও কীটসের কবিতার ইন্দ্রজালে

৭২। কাব্যগ্রন্থাবলী - উত্তরপর্ব - ভূমিকা।

৭৩। কথাসাহিত্য, বৈশাখ, ১৩৮২, পৃঃ ৬২৮ - সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

৭৪। কাব্যগ্রন্থাবলী - (তৃতীয়) পৃঃ ১

বন্দী হইলাম। শেলির কাব্যের চিরচঞ্চল নিরুদ্দেশ গতি, রঙের তুফান লাগা, অস্থির-সীমানা, অতীন্দ্রিয়, অনির্বচনীয় মেঘলোকে যেন বিলীন হইয়া গেলাম। আবার কীটসের কাব্যের পুষ্পঘন, তমসুরভিত, লুপ্তপছা, অজস্র উদ্ভিদ, কোকিলাকুল, ইন্দ্রিয় আতুর অরণ্যের পথে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। . . . কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগিল কীটসের নাইটিঙ্গেলের প্রতি কবিতা। কাব্য সংসারে ইহাই আমার প্রিয়তম কবিতা। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটি আমার মনের উপরে যেন সোনার কাঠি ছোঁয়াইল, আজিও তাহার কাজ শেষ হয় নাই। শেলির মেঘলোকে আজ আর প্রতিষ্ঠা পাইনা, কিন্তু কীটসের বনভূমি পদতলে তেমনি অচল।^{৭৫}

কাজেই চিরসুন্দর, চিররোমান্টিক কবি কীটস্ যে প্রমথনাথের রোমান্টিক চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার এই কীটসের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশের পথপ্রদর্শক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরু নিজে একসময়ে কীটসের 'Beauty truth, Truth beauty' - দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আজীবন সৌন্দর্যের পূজারী রূপে খ্যাত ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে কীটসের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিজড়িত শব্দ-স্পর্শ-বর্ণ-গন্ধময় রূপলোকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করলেন কবি প্রমথনাথ। উপরের উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট যে রূপদক্ষ কীটসের আলো ঝলমল, সৌন্দর্য খচিত, বর্ণ বিলসিত, গন্ধ সুরভিত শব্দ মাধুরী কবিকে কতখানি বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছে। ইন্দ্রিয়ের রাজপথ দিয়ে আবেগানুভূতির রাজকীয় আবির্ভাব এক গভীর সংবেদনশীল সৌন্দর্যলোকের স্বর্গীয় সুখমায় ভরিয়ে তুলেছে। পরিদৃশ্যমান নিসর্গশোভার মনোরম চিত্রায়ণে সহায়তা করেছে স্বর্ণাভ ভাষার ঐশ্বর্য ও ছন্দের দোলা। এই ছন্দ ও শব্দের রঙ ও তুলি দিয়ে কীটসের মত বহুরঙা ছবি এঁকেছেন প্রমথ-কবি। প্রমথনাথের গীতিকাব্যের যে কোন কবিতাই এর সাক্ষ্য দেবে।

একদল কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্র প্রভাব অস্বীকার করার জন্যই রবীন্দ্র বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রমথনাথ রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকার করেই তা স্বীকরণে প্রয়াসী ছিলেন এবং স্বীয় স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠার সাধনায় ব্রতী ছিলেন। তাই তিনি অকপটে বলেন - 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে আমি ভয়ে এড়াইয়া না চলিয়া আত্মসাৎ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছি'।^{৭৬} এবং তিনি যে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছেন তাঁর সাহিত্যকৃতিই তার প্রমাণ। বস্তুতঃ পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রমথনাথের উপর গভীর ও সুদূর প্রসারী, অথচ ঠিক প্রত্যক্ষ নয়। 'মানবদেহের উপর সমুদ্র স্রোতের যে ফল হয় তাঁর কাব্যের উপর এই প্রভাবও ঠিক সেইভাবে কার্যকরী

৭৫। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৬২

৭৬। কাব্যগ্রন্থাবলী (২য়) পৃঃ ৮

হয়েছিল। কাব্যদেহ তার স্বকীয়ত্ব হারায়নি, কিন্তু রবীন্দ্রাবগাহনের ফলে তা এক অপরূপ স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ও শুচি শ্লিষ্ট লাবণ্যে ভরে উঠেছে। কাব্যশৈলীর বিচারে এই প্রভাব সামগ্রিক হলেও একে প্রত্যক্ষপ্রভাব বলা চলে না।^{১৭} এই প্রভাব প্রমথনাথ কখনও অস্বীকার করতে পারেন নি বা সে চেষ্টাও করেন নি। রবীন্দ্র কাব্যের প্রধান গুণ লাবণ্যময় স্বাস্থ্য-দুর্বলতা বা রুগ্ন মানসিকতা থেকে মুক্ত। প্রমথনাথ এই গুণের দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই এ প্রভাব নিতান্ত বাহ্যিক নয়, একান্তই কবি-মানসিকতার মর্মমূলে, চেতনার গভীরে, সত্তার অন্তঃপুরে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্র প্রভাবকে স্বীকার ও স্বীকরণ করে রবীন্দ্রভাব-শিষ্য প্রমথনাথ গুরুকর্ষিত শিল্প সমৃদ্ধ কাব্যক্ষেত্রের উর্বরাশক্তি, ধারণক্ষমতা ও উৎপাদন বৈচিত্র্যের সন্ধানে আজীবন আত্মনিয়োজিত থেকে বাংলা কাব্যের প্রসারতা ও বৈচিত্র্য এনেছেন। প্রতিভাবান ব্যক্তি যে পূর্ব প্রদর্শিত পথ বা ভাগ্য-নির্দিষ্ট শক্তিকেই চরম বলে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, অভ্যন্তরীণ চাক্ষুশ্য যে তাদের নূতন নূতন পথের সন্ধানে অনুক্ষণ বিচলিত করে তোলে তার প্রমাণ প্রমথনাথ। রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথেই তিনি বাংলা পয়ার ছন্দের নূতন শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতার আবিষ্কার করে তাকে শিল্প সার্থকতার চরমে পৌঁছে দিয়েছেন।

কবি কীটস্ যেভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে কাব্য প্রতিমার আরতি করেছেন, প্রমথনাথও তেমনি কীটসের অনুসরণে চিত্রকল্প, স্পর্শকল্প, ঘ্রাণকল্প, শ্রুতি কল্প প্রভৃতি অজস্র ইন্দ্রিয়জ উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর কাব্য-প্রতিমা। কয়েকটি উদাহরণ সমাহৃত হল :

চিত্রকল্প :

(১) সন্ধ্যা হলে গ্রামের বধু
ফেরে যখন ঘরে
নদীর পাড়ে বাবলা বনে
আঁধার নেমে পড়ে,
মাঠের পথে গাভীর দলে
উড়ায় ধূলিকণা
রবির তেজে চিকচিকিয়ে
ছড়ায় যেন সোনা। [দেয়ালি - ৭ নং]

(২) ছাতামেলা গুলমোরের সবুজ ছায়ায়
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

কাক ডাকে শালিক চরে,
ধূত কাঠবিড়ালী ছোট্ট আর থমকে দাঁড়ায়
গোরু চরছে,
আসছে তাদের ঘাস ছেড়ার সম্মিলিত ঐকতান।
পথিক বিরল, পথ দীর্ঘ।

[সাঁওতাল পরগণার মাঠ : উত্তরমেঘ]

স্বাধকল্প :

(১) ওই লেবু ফুল তবু ঠাই দিয়ো তারে,
ঘাসের কুসুম যত,
কতটুকু তারা তবু সৌরভে
চেতনা বেদনাহত।
আনো চাঁদের সুধায় সিঞ্চিত করি
অচেনা অজানা ফুল
যার সৌরভময় পাখা মেলে দিয়ে
হৃদয় হারায় কুল।

[দেয়ালি - ২৮ নং]

(২) নদীতে শেহলা শ্যাম, রোদে পোড়া ঘাস,
দন্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি, বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার,
হে পদ্মা তোমার।

[সূর্যাস্তের পদ্মা : হংসমিথুন]

শব্দকল্প :

(১) সাগর গরজনে শ্রবণে পশে মোর
নিঝর ঝরঝর শিখর ঘরে
তেমনি আজি এই নগর কল্লোলে
করুণ সুরপশে হৃদয় পরে।

[দেয়ালি - ৩৫ নং]

(২) ধূমাক্তিত পল্লী পথে ঘন্টা গোধুলির
তালে তালে দাঁড় ফেলা কচিং তরীর

হঠাৎ শব্দে পশে কুলায় অধীর

ধ্বনি বলাকার - [সূর্যাস্তের পদ্মা : হংসমিথুন]

স্পর্শকল্প :

(১) কোমল তব দেহের চাপে

কোমল শয়নেতে

আধেক রেখা আঁকিয়া রাখে আর,

এই খানেতে হাতটি ছিল,

আঁচল খসা বুক

এইখানেতে ছাপ রেখেছে তার ।

[শয্যাবল্লভ : বসন্তসেনা]

রোমান্টিক কবি কীটসের মত প্রমথনাথ কল্পনা প্রিয় হলেও, তিনি কিন্তু কল্পনাসর্বশ্র কবি ছিলেন না । বাস্তবের প্রতি তাঁর কবি মনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ছড়িয়ে আছে তাঁর কাব্যে -

কল্পিতে মনে মনে শ্রেষ্ঠাসন দিয়ে

প্রত্যক্ষেরে অবিশ্বাস পারিণা করিতে -

সম্মুখের সরোবরে অবস্থ ভাবিয়ে

কল্পনায় কুণ্ড মোর পারিণা ভরিতে

চোখে দেখি যাহা

তারাই লেগেছে মোর হৃদয় হরিতে -

[চান্দ্রিক : বসন্তসেনা]

প্রমথনাথের গীতি কবিতাগুলিতে আছে কবির হৃদয় বীণাতন্ত্রে অনুরণিত আবেগ-কম্পিত সুরের মুচ্ছনা, বেদনার আতিশয্যে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙা বন্যা, রসভারানত পরিপক্ব দ্রাক্ষাওচ্ছেদমত আনন্দময় আবেগ-অনুভবের উপচীযমান রসোচ্ছলতা, তার সঙ্গে প্রকাশের ঐশ্বর্য, ছন্দের নিখুঁত সাবলীল গতিভঙ্গী । তাঁর গীতিকবিতায় কখনও শোনা যায় উচ্ছল নটীর নূপুর নিকণ, কখনও খরপ্রোতা জলপ্রপাতের চঞ্চলতা, কোথাও সমুদ্রের অতলান্ত গভীরতা, অসীম ব্যাপ্তি ও নিগূঢ় গাঙ্ঘীর্য, কখনও শঙ্খ নিনাদের উদাত্ত মধুর সুবলয়িত ধ্বনি সম্পদ, কখনও একতারার মেঠো সুর, বাঁশের বাঁশীর করুণ-মধুর নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা, কখনও দেখা যায় ছায়াঘন, মায়াময় শরৎ বনানীর পুষ্প সুরভিত, বিহঙ্গ কুজিত অপরূপ চালচিত্রের অনবদ্য ভাবারূপ । এই সকল বিভিন্ন, বিচিত্র মিহি ও মোটা সুরের ঐকতান প্রমথ-কাব্যকে রূপাঢ্য নন্দন লোকের ঐশ্বর্য ও

মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। সেখানে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীটস, প্রমথনাথ হাতে হাত রেখে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কাব্যদেবীর রূপারতিতে অপিতপ্রাণ।

অবশ্য আঙ্গিক ও ভাবসাদৃশ্য সামান্য পরিমাণে থাকলেও কবি প্রমথনাথের কণ্ঠস্বর অন্যান্য উপরিউক্ত কবিদের থেকে স্বতন্ত্র, একান্তই ব্যক্তিগত।

প্রমথনাথ কবিতার ক্ষেত্রে বাঙালীর চিরায়ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। নতুনত্ব যা আছে তা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকরণ করে গীতিকবিতা, সনেট বা আখ্যান কাব্য সর্বক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। ভারতের পুরাণ, নাটক ও কাব্যের ঐতিহ্যশ্রয়ী ভাব ও রূপকে স্বীয় প্রতিভার রসে জারিত করে তিনি যে মনোরম অথচ চিরায়ত গীতিকবিতার সৃষ্টি করেছেন, তার বিশালতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতা আমাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করে। বহুব্যবহৃত উল্লিখিত হর-পাবতী, দুঃস্বপ্ন - শকুন্তলা, পুরুষবা-উবশী, ভদ্রার্জুন, উষা-পুষ্প, দ্রৌপদী, অহল্যা, শচী, মহাশ্বেতা প্রভৃতি তাঁর কাব্যের রূপ-রাগ, রস ও ভাব ব্যঞ্জনার নিত্যনূতন বাহন। কবি ও রসিকের মনেও এরা চিরায়ত ভাবের বিগ্রহ, রূপের প্রতীক। ফলে স্থায়ী ভাব সৃষ্টিতে সঞ্চারীভাবের মতো এগুলি কাব্যের বিশেষ সম্পদ। যুগ যুগান্তবাহী জাতীয় জীবনের ও কাব্য, সাহিত্য, পুরাণের পলিসমৃদ্ধ উর্বরা জনপদ উপেক্ষা করে নিষ্প্রাণ পাষণ্ডের বন্ধু মাটিতে ফসল ফলাবার অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থতা ও মৃত্যুর পরিচায়ক। প্রমথনাথ এই অপপ্রচেষ্টার শরিক হননি কোথাও। তবে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যসূত্রে গৃহীত রূপকল্পগুলিকে নূতন রূপ-রসে ভরিয়ে তুলে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছেন। এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে 'হংসমিথুন' কাব্যের 'শকুন্তলার উৎকর্ষা,' 'দুঃস্বপ্নের খেদ,' 'শকুন্তলা,' 'পুরুষবা,' 'উবশী' 'ভদ্রার্জুন' প্রভৃতি কবিতায়।

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম উপাদান প্রেম। যুগে যুগে কালে কালে রোমান্টিক কবিদের হাতে প্রেম-কাব্যের নব নব রূপমাধুরী বিকশিত হয়েছে। কারণ প্রেম চিরন্তন। অনাদি কাল ধরে মানব হৃদয়ের গভীরে প্রেমের মূল প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন অনাদিকালের প্রেমের চিরন্তন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় -

'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে

অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।'

কিংবা - 'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

প্রমথনাথও তেমনি বলেছেন -

পুরাতন এ পৃথিবী

পুরাতন আমার হৃদয়

স্মৃতির গোধূলি ক্ষণে
অকস্মাৎ দুজনার একি পরিচয় ।
শারদ সোনার স্বচ্ছ চীনাংগুক তলে
নবতন দৃষ্টি বিনিময় ।

[যুগল : হংসমিথুন]

সুদূর অতীতের চির পুরাতন অথচ চির নবীন প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আধুনিক পাঠক
ও প্রেমিকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে ।

অতৃপ্ত প্রেমের কবি প্রমথনাথ । মর্ত্য-প্রেম তৃপ্তিহীন, তাই তা আকর্ষণীয় ।
সৌন্দর্য পিয়াসী হৃদয় চিরকালই অচরিতার্থ, পিপাসার্ত । 'জনম অবধি হাম রূপ
নেহারলু নয়ন না তিরপিত ভেল / লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলু, তবু হিয় জুড়ন না
গেল' ।

[বিদ্যাপতি]

প্রমথনাথও বলে ওঠেন -

'অগস্ত্য তৃষ্ণা মিটে না হয়
অশ্রু সায়রে না মিলে তল ।' [৩৮ নং দেয়ালি]

" Ode on a Grecian Urn " কবিতার চিত্রকোদিত চিরন্তন অচরিতার্থ প্রেমিক যুগলের
ন্যায় প্রকৃতির পত্রপুটে প্রেম ও প্রেমিকের পরিচয় প্রকীর্ণ করেছেন প্রমথনাথ
'অনিবচনীয়া' কবিতায় -

'আকাশ কেন এত সুন্দর ?
পৃথিবী কেন মোহাঞ্জন ময় ?
তোমার দিকে তাকালে
উত্তরের যেন আভাস পাই ।
তোমার মুখে চোখে কপোলে,
তোমার অঞ্চলের মালিনীতে,
তোমার কুন্তলের ভূজঙ্গপ্রয়াতে,
তোমার কণ্ঠের সঙ্করায়,
মন্দাক্রান্তায় তোমার চরণের
তোমার ললাটের বসন্ততিলকে
আর
তোমার বক্ষের শিখরিণীছন্দে

এই রহস্যের সদুত্তর যেন লিখিত ।
 হে সুন্দরী,
 তুমি এই বিশ্বকাব্যের
 অনির্বচনীয় মনোরমা টীকা ।
 তোমাকে দেখে ওদের কতক বুঝি ।

[অনির্বচনীয় - উত্তর মেঘ]

প্রেমিকের হৃদয় ও রূপের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির বিস্ময়-বিচিত্রিত, রহস্যগুপ্তিত
 সৌন্দর্যের শতদল পাপড়ি মেলে । আসলে 'প্রমথনাথ প্রেমের কবি, প্রকৃতির কবি ।
 আর মর্ত্যের মৃৎপাত্রেরই আশ্বাদ্য তাঁর হৃদয় বা চিন্ময় অমৃত । এ অমৃতে তৃষ্ণার একান্ত
 নিবৃত্তি নেই, তাই এর সূচির আকর্ষণ' । ৭৮

মাঝে মাঝে এই প্রেম-রহস্য উপনীত হয়েছে প্রেম-তত্ত্বে । প্রেমিক মৃত্যুর অধীন,
 কিন্তু প্রেম মৃত্যুঞ্জয় ।

কালের নভতলে রঙীন আলোসম
 মিলায়ে যাবে যবে সুদূরে তুমি
 মরণহীন কোন্ কবির মনপটে
 তখনো রবে তব স্মৃতিটি চুমি । [দেয়ালি : ৩৫ নং কবিতা]

আবার দৈহিক প্রেমের ক্ষণিক নশ্বরতা কবিকে পীড়া দেয় । দেহের দেউলে আশ্বার
 যে অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠা সেই চেতনার বৃন্তে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে কবিতাকুসুম :

কে দেখেছে ভেদ করি মাংসের জঞ্জাল
 রহস্য আশ্বার
 মুক্ত সে যে অকলঙ্ক শানিত বিশ্বাস
 নগ্ন তরবার ।
 কারু সুললিত ওই স্বর্ণ কোষখান
 জানি মধুময়
 কেহ না লভিল হায় এই যে কৃপাণ
 তার পরিচয় ।
 দেহের বিলান তলে ব্যাঘ্র দুই চোখে
 চলি হাতড়িয়া
 জানি একদিন চক্ষু হঠাৎ আলোকে

যাবে ঝলসিয়া ।
 আশ্বার বিদ্যুৎদীপ্ত সে রহস্যখান
 আজিও অচেনা
 আছে আশা একদিন পাইব সন্ধান
 হে বসন্ত সেনা ।

[বসন্ত সেনা : বসন্তসেনা]

কখনও কখনও নারীদেহ ভোগাকাঙ্ক্ষী কবির সঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের বলিষ্ঠ
 ভোগবাদের সাধর্ম্য সাময়িক ভাবে লক্ষ্য গোচর হয় -

মানুষের তনুভোগে নাই কোন পাপ
 এ বিশ্বে একটি কথা বুঝেছি অন্তত
 এই দেহ পরে আছে বিধাতার ছাপ
 নহিলে এ দেহ হেন সুন্দর কি হত !

বলুক যে যাহা
 আমি এই দেহ স্বপ্নে আছি তন্দ্রাহত ।
 বিধাতার তাম্বলিপি আত্ম অধরে ।
 এনেছে বহন করি তনুতীর্থা নারী
 রহস্য লোলুপতাই দুটি চক্ষুতরে
 নির্গিমেষ চেয়ে আছি বৃষ্টিতে না পারি
 হে চারু চার্বাক

উদ্ভাটিয়া দাও তারে আলোকে সঞ্চারি ।

[চার্বাক : বসন্তসেনা]

কিন্তু পরক্ষণেই আবার শাস্বত প্রেমের জয়গানে তিনি মুখর এবং এটাই তার কবি
 আশ্বার মর্মবাণী, মনোবাণীর মূলসূর -

জীবন যবে অস্তে যাবে তখনো নাহি ভয়
 প্রেমেরি হবে জয় ।
 আমার চির মিলন আশা
 অগাধ মম যে ভালোবাসা
 নূতন শাখে বাঁধিবে বাসা
 ক্ষণিক সেতো নয়

প্রেমেরি হবে জয় ।

[প্রেমের জয় : বসন্তসেনা]

'অতীর্থ' কবিতায় অঙ্গপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন অনঙ্গপ্রিয় -

মনেতে রেখো দেহের বাতায়নে ।

দেহাতীতের ফিরি অধেষণে ।

[অতীর্থ : বসন্তসেনা]

'অকুন্তলা' কাব্যের 'বিদ্যাপতির রাধা' কবিতাটি বিভিন্ন দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । এই কবিতার মধ্যে প্রমথনাথের প্রেমচেতনার প্রথম স্তরের অন্তিম পর্যায় লক্ষ্য গোচর হয় । 'দেয়ালি', 'বসন্তসেনা', 'প্রাচীন আসামী হইতে' প্রভৃতি কাব্যে কবি-হৃদয়ের তপ্ত প্রেমের আনন্দ-বেদনার ঘনীভূত নির্যাস নেই, আছে অনুভূতি-বিলাসের চিহ্ন । 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'মহুয়া'তে এই প্রেমানুভূতির রস আরও ঘনীভূত, প্রেম-প্রবাহ আরও গহীন, গম্ভীর । একদিকে সুগভীর সৌন্দর্য্যরতি, অন্যদিকে সুতীর ইন্দ্রিয়োপভোগ—এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা অসাধারণ আসব-মস্ততার সৃষ্টি করেছে । 'একথা বেশ জোর করে বলা যেতে পারে যে প্রেম ও প্যাসনের এই মেঘ-বিদ্যুত সংযোগে প্রমথনাথ যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাংলাদেশের আধুনিক অনাধুনিক আর কোন কবিই তা দেখাতে পারেন নি ।

তারপর কামনার কড়াপাকে প্রেমের মধুর রস আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে । 'বিদ্যাপতির রাধা' কবিতায় সে রস ঈষৎ ঝাঁঝালো-এমনকি ঈষৎ তিক্তও বলা চলে । প্রেমে পাপবোধের আভাস দেখা দিয়েছে - যা অমৃত, তাই-ই আবার হলাহল । এ প্রেমকে শিল্পোত্তরণের পছা ধরে উদ্ধারিত করতে না পারলে প্রেমিকের রক্ষা নেই । তাই বিদ্যাপতি কবি । সমগ্র বাংলা কাব্য সাহিত্যে এবং যতদূর খোঁজ রাখি, ইংরাজিতেও 'বিদ্যাপতির রাধা' প্রেম কাব্য হিসাবে অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয় । প্রমথনাথ নিজেও এমন কবিতা আর রচনা করেন নি' । ৭৯

আধুনিক মানসিকতায় প্রেম দেহনির্ভর । বলিষ্ঠ ভোগবাদী কবি মোহিতলাল দেহাতীতের অধেষণে কালক্ষেপ না করে দেহের জয়গানে মুখর হয়েছেন -

হায় দেহ ! নাই তুমি ছাড়া কেহ-

জানি তাহা প্রাণে প্রাণে ।

মোহিতলাল দুঃসাহসী কবি । তাই তাঁর প্রেম শীর্ণ, রুগ্ন বা দুর্বল নয় । তিনি তাই

ভীরু কল্পনাবিলাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন -

'মধুরাতে মাধবীটি তুলে নিতে হল না সাহস / ওঠে হাসি, নেত্র জল বুঝিলে না
অপরূপ জ্বালার হরষ।'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বহুক্ষেত্রে প্রেমের আবেগঘন বর্ণনা ও পরিবেশ সৃজন বা
প্রেমিকার দেহ-সৌন্দর্যের অকুণ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্যগোচর হয়। 'কড়ি ও কোমলে'র
সনেটগুলি বা 'উবশী,' 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতা তার প্রমাণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত
তিনি দেহের মধ্যেই দেহাতীতের সন্ধান পেয়েছেন, উগ্রতার মধ্যে স্নিগ্ধতার আবিষ্কার
করেছেন। এক কথায় প্রেমের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন যোগী বশিষ্ঠ, আর মোহিতলাল
যেন তান্ত্রিক বিশ্বামিত্র।

প্রমথনাথের সমসাময়িক কবি বুদ্ধদেব বসুর প্রেম রোমান্টিক। তিনি তাই দূর
থেকে দেহের সৌন্দর্য দেখে নিজের মনের আকাশ রাঙিয়ে তোলেন। এ প্রেমের বাস
কবি-কল্পনায়। অবশ্য 'কঙ্কাবতী'তে প্রত্যক্ষ বাস্তবের স্পর্শ দুলক্ষ্য নয়। আধুনিক
মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর প্রেমচেতনাকে নূতন মাত্রা দিয়েছে। দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব,
আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত, প্রবৃত্তি ও প্রেমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর প্রেম কবিতার
বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গক্রমে 'অমিতার প্রেম', 'প্রেমিকা' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। 'শেষের
রাত্রি' কবিতায় তাঁর প্রেমের স্মৃতি 'এলোমেলো প্রেতের মতো'।

সুধীন্দ্রনাথ দস্ত প্রেমের নশ্বরতা ও তার ফলে মানব হৃদয়ের গভীর যন্ত্রনাকে
বাণীরূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর প্রেমচেতনা ক্ষণকালের মধ্যে শাস্বতকে
আবিষ্কার করে। প্রেমের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, কিন্তু হৃদয়বৃত্তিকে
অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। প্রেমিকার বিচ্ছেদ আনে গভীর হতাশা। তবুও
প্রেমিকা তাঁর কাছে সৌন্দর্যের দূতী, ক্ষণিকা তাই হয়ে ওঠে শাস্বতী। গভীর বিশ্বাসের
কেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি আবেগে স্পন্দিত। 'অনুষঙ্গ',
'মহাশ্বেতা', 'শাস্বতী' প্রভৃতি কবিতাগুলি তার প্রমাণ।

বুদ্ধদেব বা সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার ভাব ও ভাষায় সংহতি অসাধারণ।
তুলনায় প্রমথনাথের বিদ্যাপতির রাধা কবিতায় আবেগতারল্য ও ভাষাসৌকর্য বেশী।
মানবী নারীর দৈহিক কামনা-বাসনা ও সৌন্দর্যকে কবি অপরূপ বাণীমূর্তি দিয়েছেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে সর্বদা একটা সংশয়, সন্দেহ, ঈর্ষা ও অতৃপ্তির দোলা
লক্ষণীয়। প্রমথনাথের মধ্যেও তার কিছুটা পরিচয় মেলে -

তারে বলি প্রেম

নহে তাহা সুখ, নহে দুঃখ নিরবধি,

অসীম সমুদ্র নহে, নহে ক্ষুদ্র নদী,

নহে পাওয়া, নাহি পাওয়া, নহে আশা দেহ,
বুকে বেঁধে কাঁদা আর উথলিত মেহ
বাহুপাশ মুক্ত করি। (বিদ্যাপতির রাধা)

ভাবের দিক থেকে প্রমথনাথ এখানে বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়।

'বিদ্যাপতির রাধা' কবিতায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বিরহ ও মিলন একীভূত।
রাধা যেন কবি বিদ্যাপতির প্রিয়া, নিখিল প্রেমিকের প্রিয়া -

জানো সবে রয়েছে বসিয়া
সম্প্রাপনে বিদ্যাপতি আর তার প্রিয়া। (তদেব)

'হেরি কাহার নয়ান রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে'— বলে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন
তুলেছিলেন তাঁরই ভাবশিষ্য ও আধুনিক-মনস্ক কবি প্রমথনাথ এখানে তার উত্তর
দিয়েছেন। এই কবিতায় প্রমথনাথ অবশ্য আধুনিক যুগের সংশয়, কুণ্ঠা বা দুর্বলতাকে
পরিহার করে অসঙ্কোচে প্রেমিক-প্রেমিকার বলিষ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগানুভূতির বর্ণনা
দিয়েছেন।

আমি ধীরে ধীরে
কুসুম কোমল কর লইলাম টানি।
তারপরে কি হয়েছে কিছুই না জানি।
তখন ছুঁইল চন্দ্র ধরার কপোল
খসে পড়া পুষ্প পেল ধরণীর কোল,
সারারাত্রি সাধনায় চঞ্চল সমীর
কুয়াশা অঞ্চলখানি গৌরী শিখরীর
তখন ঘুচালো সবে, ...
. তখন আধারে
তরুণায়া এক হয়ে গেল একেবারে। (তদেব)

নর-নারীর দৈহিক মিলনের অকপট বর্ণনা আছে এখানে। কিন্তু মোহিতলাল, বুদ্ধদেব
বা সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে যে এই বর্ণনা অনেক বেশি কবিত্বমন্ডিত ও ব্যক্তনাথমী সে বিষয়ে
সন্দেহ নেই।

এরপরও তিনি বহু প্রেম কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তার অধিকাংশ প্রেম কুজনই
সংশয়ের বাণ- বিদ্ধ, সন্দেহে দোলায়িত, রহস্যে আচ্ছাদিত।

প্রমথ-কাব্যের প্রেম-দেউলে দেখি দেহ ও মনের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। শেলীর মত
Intellectual Beauty-র মহাকাশে প্রেমভিসারে ভেসে যাওয়া প্রমথ-মানসিকতার

বিরোধী। দেহ-বিচ্ছিন্ন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমণ্ডিত আদর্শলোকে তিনি যেতে নারাজ। আবার দেহসর্বস্ব পঙ্কিলতায় আকষ্ট নিমজ্জিত হওয়াও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি দেহের মধ্যেই দেহাতীতের অঙ্গেই অনন্দের, পক্ষে পঙ্কজের সন্ধানে ব্রতী। তাঁর প্রেম-চেতনার সঙ্গে প্রকৃতি-চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে তাঁর পরবর্তী কবিতাবলীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অধিকতর। 'রামী ও রাধা' এবং 'রাখী পূর্ণিমার চাঁদ' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রমথনাথের কবিতার প্রেম ভাবনায় বিশেষতঃ রূপ সাধনায় ও সৌন্দর্যচেতনায় কবি কীটসের ব্যাপক প্রভাবের মূলে মনে হয় কীটসের ইন্দ্রিয় সচেতনতা। কবি কীটসের মানসিকতা ছিল জড় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই সীমাবদ্ধ। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা বা রোমান্টিকতা আধুনিক জগতের মিস্টিক পথে পরিক্রমা করে নি। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য জীবনে প্রাথমিক ভাবাবেগ, প্রেমচেতনা, প্রকৃতি-বর্ণনার জগৎ থেকে রহস্যমেদুর আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছেন। কীটসীয় চেতনাপুষ্ট প্রমথ-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টা বিষয়ে আগ্রহী নন। বরং সৃষ্টির মনোরম রূপলোক তাঁর আরাধ্য। তাঁর কাছে সৌন্দর্যই সত্য।

- Beauty is truth.

অবশ্য প্রমথনাথ কীটসের সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা প্রভাবিত হলেও একসময় তিনি কীটসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্রতিভা এত বৈচিত্র্য পিয়াসী যে তাঁর সৌন্দর্য চেতনার মধ্যে নানা পরিবর্তন, রূপান্তর ও স্তরপরস্পরা দেখা দিয়েছে।

হংসমিথুন [১৯৫১] থেকেই কবির পূর্বতন প্রেম ও প্রকৃতি চেতনায় নূতন সুর, নূতন রং, নূতন ভাবনার স্পর্শ লেগেছে। এই কাব্যে পদ্মা বিষয়ক কবিতাগুলি শুধু ইন্দ্রিয়ারতি, আবেগানুভূতি বা কীটসীয় সৌন্দর্য্য নয় - মনোগ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের আধার। কবির সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে এখানে। কীটসের হাত ধরে কীটস-প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে চলেছিলেন প্রমথনাথ। কিন্তু ক্রান্ত কীটস যখন নবতর বৈচিত্র্য সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বিশ্রামরত, প্রমথনাথ তখন নূতন পথের সন্ধানে নবোদ্যমে অগ্রসরমান।

বলা বাহুল্য উক্ত পদ্মা বিষয়ক অধিকাংশ কবিতাই একাধারে নিসর্গকাব্য এবং জীবনকাব্য।

প্রমথ-কাব্যের স্থায়ী ও প্রধান সুর এই জীবননিষ্ঠা। এই জীবন ইন্দ্রিয় নির্ভর। অতীন্দ্রিয় জীবনের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ নির্মোহ ও আস্থাহীন। 'প্রমথনাথ পৃথিবীর কবি, পার্থিব জীবনের কবি, পার্থিব প্রেমের কবি'।^{১০} এটাই প্রমথনাথের কবি-প্রকৃতির যথার্থস্বরূপ।

অনেকের ধারণা প্রমথনাথ আধুনিক যুগের কবি হলেও ঠিক আধুনিক কবি আখ্যার যোগ্য নন।

আধুনিক শব্দটি অত্যন্ত আপেক্ষিক। কোন সময় থেকে আধুনিক কালের শুরু, কিংবা আজ যা আধুনিক আগামীকাল তা অতীত হবে কিনা, কিংবা আজ যা প্রাচীন বলে চিহ্নিত একদিন তা আধুনিক ছিল নাকি - প্রভৃতি প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। বস্তুতঃ পক্ষে কাব্য, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি চিরায়ত বস্তু। মানুষের রস-পিপাসা চরিতার্থ করার ক্ষমতা যার আছে সে তো শাস্ত্রত কালের সম্পদ; যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, মন থেকে মনান্তরে তার অবাধ বিচরণ। যা চিরন্তন তা সব সময়ই আধুনিক - তবে যা আধুনিক তা চিরন্তন নাও হতে পারে।

সত্যকারের রসের কোন নির্দিষ্ট কালসীমা নেই। আর রসসৃষ্টি ও রসোপভোগই হচ্ছে কাব্যের মূলকথা।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির মাধ্যম ভাষা ও রূপান্তিকের পরিবর্তন ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে, কিন্তু রসসৃষ্টি বা রসোপভোগের পদ্ধতির কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কাব্যরূপ আধুনিক হতে পারে কিন্তু কাব্যরস যথার্থই কালজয়ী। 'প্রমথনাথ বিশীর কাব্য কালজয়ী কাব্য। এবং তিনি আধুনিক কবিও বটেন। কারণ তাঁর কাব্যান্তিকের পারিপাট্যে, ভাষাভঙ্গীর পরিচ্ছদে ও প্রসাধনে রূপকল্প নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত অভিনবত্বে আধুনিক মানস-বৈশিষ্ট্য অতি সুস্পষ্ট। . . . কাব্যের এই আধুনিকত্ব নিতান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার। অন্তরঙ্গ বিচারে প্রমথনাথ কাল নিরপেক্ষ রসস্রষ্টা'।^{৮১}

যথার্থ কাব্য সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী। কাব্য বা যে কোন শিল্প যদি সৃষ্টির পর পাঠক বা রসিকের সহানুভূতি সৃষ্টি করতে না পারে, হৃদয় জয় বা রসাবেদন জাগাতে না পারে তবে সে কাব্য বা শিল্প ব্যর্থ হতে বাধ্য। আধুনিক কবিতার প্রতি আধুনিক রসিক পাঠক কোন আকর্ষণ বোধ করে না। এই জন্য কাব্যকে পাঠক-হৃদয়ে রসাবেদন সৃষ্টির উপযোগী রূপে সৃষ্টি করতে না পারার ফলেই আধুনিক কবিতার আয়ু ও আবেদন হয়ে উঠেছে সীমিত বা ক্ষণস্থায়ী। 'প্রমথনাথকে এ দুর্ভোগ কখনও ভুগতে হয় নি এবং কখনও ভুগতে হবে না। তাঁর কাব্যের communication শক্তি অসাধারণ। অনুভূতি যতই সুস্ব, যতই অন্তরঙ্গ হোক না কেন, ভাষার এবং ভাষাতীত ব্যঞ্জনার সাহায্যে তাকে তিনি সোজা পাঠকের মনের দরজায় পৌঁছে দিতে পারেন'।^{৮২}

'হংসমিথুন' কাব্যের অন্তর্গত পদ্মা বিষয়ক যে কোন কবিতাই উদাহরণ হিসাবে

গ্রহণ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। প্রাচীন নন্দন তত্ত্বের ধ্বনি সমৃদ্ধ কবিতা সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক কবিতা বিষয়ে কবি প্রমথনাথ বিশীর নিজস্ব মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে- 'আমি কাব্যে দেশ কালের সীমানা মানিনা। আদি কবি হইতে আরম্ভ করিয়া কবি মাঝেই একই দেশ কালের অধিবাসী। সে দেশের নাম আনন্দলোক, সে কালের নাম অনন্তকাল। কাজেই কোন কবিতাকে আধুনিক বলিয়া চিহ্নিত করা নিরর্থক। কবি মাঝেই আধুনিক আবার আনন্তিক। আধুনিক কবিতার প্রধান ক্রটি এই যে তাহা হইতে গীতিরস বাদ পড়িয়াছে। রস নিষ্কাশিত ইন্দুদণ্ডের মতো তাহার স্বাদ। কবিত্ব নামক অনির্বচনীয় গুণ এবং গীতিরস মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ কাব্য। ... কবিতা যদি সুখে-দুঃখে, শোকে-সান্ত্বনায় মানুষের জীবনের মূল্য বাড়াইয়া না দিল তবে তাহার সার্থকত্ব কি? আমার কবিতা 'আধুনিক' নহে, 'আনন্তিক'।' ৮০

আর একস্থলে কবি বলেছেন - 'যে রচনায় মনের খাদ্য মেলে সাধারণে তাহাই গ্রহণ করে। আধুনিক কবিরা পাঠকের সেই মনের খাদ্য জোগাইতে পারিতেছেন কি? অনুভূতি ও উপলব্ধির উদার রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা উদ্ভট কল্পনার, অকারণ পাণ্ডিত্যের ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর গলি ঘূঁজিতে কি প্রবেশ করেন নাই? সেই সংকীর্ণ অন্ধকার, অপঘাতবন্ধুর পথে স্বভাবতই সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর। তাঁহারা যদি কবিকে অনুসরণ না করে তবে সে দায়িত্ব কাহার? '৮১ প্রমথনাথের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। তিনি নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে আধুনিক কবিতার যথাযথ মূল্যায়ণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেছেন - 'আধুনিক নারী যেমন পুরুষোচিত গুণের সাধনায় ব্যস্ত, আধুনিক কবিতা তেমনি বুদ্ধিজীবিনী হইয়া উঠিতে সচেষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষভাবে গদ্যের গুণ, তাই আজকার অধিকাংশ কবিতাই গদ্যকবিতা, তাহা গদ্য ছাঁচেই লিখিত হোক, কি পদ্যেই লিখিত হোক। অথচ পদ্য যে বুদ্ধি বিরহিত এমন নয়, তাহাতে বুদ্ধিটা প্রখরভাবে দীপ্তি পায় না এই মাত্র। চাঁদের আলোও সূর্যেরই আলো।

পুরাতনকে আবিষ্কার করাই কবির লক্ষ্য। পৃথিবী পুরাতন, মানুষের হৃদয় পুরাতন। এই দুই পুরাতনের বিবাহবন্ধন সাধনেই কবিরা নিযুক্ত। কিন্তু রহস্য এই যে কবিদের আবিষ্কারের দ্বারাই, কবি-দৃষ্টির জ্যোতিপ্লাবনের অভিষেকেই পুরাতন নূতন বলিয়া মনে হয়। কবির যদি প্রেমের দৃষ্টি থাকে তো পুরাতন তার জীর্ণতার মুখোশ

অপসারিত করিয়া চিরন্তন রূপে দেখা দিবেই।

কোন দুর্বিপাকে জানি না বাঙালী কবিরা এই মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, বোধ করি তাহাদের বৈদেশিক অগ্রজদের দৃষ্টান্তের ফলেই, কারণ বিদেশের সাহিত্যেও আজ এই বোঁকটা প্রবল। ৮৫

কবি-সমালোচকের এই দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আধুনিক কবিতা বিষয়ে প্রমথনাথের মতামত কত দৃঢ় ও গভীর। শুধু এই মতবাদের নিরিখে নয়, রসিক পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকেই দৃঢ়ভাবে একথা বলা যায় যে শাস্ত্রত রসাবেদনের জগৎ থেকে বিপথগামী আধুনিক কবিদের দলভুক্ত নন প্রমথনাথ। কোন তত্ত্বকথার ভারবাহী নন তিনি। তিনি যথার্থ আধুনিক কবি এবং চিরন্তন কবি। তিনি প্রতিভাবান বাঙালী রোমান্টিক কবি। রসতীর্থ পথের চির-পথিক কবি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্যকার প্রমথনাথ বিশী

কবিতা রচনার মত প্রমথনাথ বিশীর নাটক রচনারও হাতে খড়ি শুরু হয় শান্তিনিকেতনে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' নাটকখানি যা পরবর্তীকালে 'কালের যাত্রা' এবং 'রথের রশি' নামান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল তার বিষয়বস্তু, ভাবসম্পদ মূলতঃ প্রমথনাথ বিশীর কাছ থেকে সংগৃহীত। রথযাত্রা সম্বন্ধে কবিগুরু লিখেছেন—আমার প্রেমসম্পদছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোন রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।^{৮৬} ইহার কয়েক মাস পূর্বেই প্রমথনাথ বিশী 'রথযাত্রা' রচনা করেন—বিশ্বভারতী সন্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'রথযাত্রা' নামে তাঁহার স্বরচিত একটি নাটক পাঠ করিয়াছিলেন।^{৮৭} রবীন্দ্রনাথ রথযাত্রার নাম পরিবর্তন করে পরে 'রথের রশি' নামকরণ করেন—'১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে [পৃঃ ২১৬-২২৫] রথযাত্রা নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। রথের রশি তাহারি পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ'।^{৮৮} আবার 'রথের রশি' নামান্তরে হয় 'কালের যাত্রা'। 'রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণে 'কালের যাত্রা' নামে যে নাটিকাখানি লিখিয়াছেন, তাহা কোন নূতন গ্রন্থ নহে, কয়েকবৎসর পূর্বে লিখিত 'রথের রশি'-র সংস্কৃত রূপ'।^{৮৯} এখন এই বিষয়ে স্বয়ং প্রমথনাথের বক্তব্য আলোচনা করলেই সহজবোধ্য হবে যে কিভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'রথযাত্রা' নাটকখানি লিখেছিলেন এবং কেন তিনি এই নাটকের স্রষ্টার দাবী রবীন্দ্রনাথকেই অর্পণ করেন। 'ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া যখন আমি বিশ্বভারতীর ছাত্ররূপে পুরাতন রঙ্গমঞ্চে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইলাম তখন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাইবার সৌভাগ্য ঘটিল। আমি নাটক লিখি জানিয়া আমাকে নাটক লিখিয়া আনিবার একটি গল্প বলিয়া দিলেন। আমি খুব দ্রুত লিখিতে পারিতাম, তিন চারদিনের মধ্যে একখানা নাটক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া তিনি মুখে মুখে পরিবর্তন করিয়া দিলেন এবং খাতাখানা নিজের কাছে রাখিয়া দিয়া পুনরায় লিখিয়া আনিতে বলিলেন। পুনরায় লিখিয়া দেখাইলাম। আবার কিছু

৮৬। রথযাত্রা—'প্রবাসী', ১৩৩০, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২১৬-২২৫।

৮৭। 'শান্তিনিকেতন'—১৩৩০, ভাদ্র, পৃঃ ১৩৮।

৮৮। গ্রন্থ পরিচয়—রবীন্দ্র রচনাবলী—২২ খণ্ড, পৃঃ ৫০৯।

৮৯। রবীন্দ্র জীবনী [৩য়]—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩২।

পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়া তৃতীয়বার লিখিতে বলিলেন। তৃতীয়বার লিখিয়া দেখাইলাম, এবার স্বহস্তে কাটাকুটি আরম্ভ করিলেন। কাটিয়া পরিবর্তন করিয়া স্বয়ং কিছু লিখিয়া একরূপ দাঁড় করাইলেন। নাটক-রচনা শিক্ষার ইহাই আমার একমাত্র শিক্ষানবিশি। ইহাতে আমার চোখ খুলিয়া গেল।^{৯০} ইহার পরিণামেই 'রথযাত্রা' নাটকের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

নাটক রচনার হাতে খড়ি এই ভাবে শুরু হলেও প্রমথনাথ এর আগেই যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন এবং সেখানেও কবিগুরু দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে প্রমথনাথ তাঁর সতীর্থ বিভূতি গুপ্তের সহযোগে 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়' নামে একটি যাত্রাপালা লিখেছিলেন। 'গত ৫ ই রাতে আশ্রমের ছেলেরা একটি যাত্রা অভিনয় করেন। শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়' নামে একটি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। গৌরপ্রাঙ্গণে আসর করিয়া সাজসজ্জা, ঐকতান বাদন, ছোট বড় জুড়িদের সঙ্গীত যথারীতি হনুমান, মহাদেব, রামচন্দ্র, বীরমণি প্রভৃতির লোমহর্ষকর ভীষণ যুদ্ধ প্রভৃতি সহ ইহার অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রী শচীন্দ্রনাথ কর এই দলের অধিকারী ছিলেন। পূজনীয় গুরুদেব এবং দেশীয় বিদেশীয় অতিথি, অধ্যাপক, নিকটবর্তী অধিবাসী প্রভৃতি উপস্থিত দর্শকগণ এই অভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।^{৯১} কাল্পনিক কাহিনীভিত্তিক এই যাত্রাপালায় লেখক নিজেও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন - 'আমাদের প্রথম পালার নাম 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়'। কাহিনীর খানিকটা পৌরাণিক, খানিকটা কাল্পনিক। ... গৌসাইজি ও লেখকের জন্য একজোড়া কমিক ভূমিকা ছিল'।^{৯২}

এই যাত্রাপালার সার্থকতায় উৎসাহিত হয়ে লেখকদ্বয় আর একটি যাত্রাপালা রচনা করেন। তার নাম 'ঘোষযাত্রা'। এই পালাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন দুস্তাপ্য। 'ঘোষযাত্রাও আসরে পরম উৎসাহে অভিনীত ও গৃহীত হইল'।^{৯৩} সম্ভবতঃ এটি ১৩২৯ সালের চৈত্র মাসে অভিনীত এবং তাহার কিছু পূর্বে রচিত হয়। 'আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী একখানি 'ঘোষযাত্রা' নামে গীতাভিনয় লিখিয়াছিলেন। ... এই যাত্রাটি আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়দের দ্বারা ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যায় শিশু বিভাগে অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে কয়েকজন বিদেশী অতিথি ও পূজনীয় গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়টি দেখিয়া দর্শকবৃন্দ

৯০। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ৬০।

৯১। শান্তিনিকেতন - ১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৩।

৯২। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - পৃঃ ১৮৬।

৯৩। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - পৃঃ ১৮৬।

বিশেষ কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন'।^{৯৪} এই যাত্রাটির কোন কোন অংশ পদ্যে রচিত এবং এতে ০ টি গান আছে।

অতঃপর প্রমথনাথ 'কর্ণমর্দন' ও 'বিরাটরাজার গোগৃহ' নামক দুখানি যাত্রাপালা রচনা করেন। এ দুটি ১৩৩৪ সালে রচিত বলে মনে হয়। দুখানি গৃহই ছিল শ্লেষাত্মক। দ্বিতীয়টিতে শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষের প্রতি বিদ্রোহ ও কটাক্ষ থাকায় প্রমথনাথকে আই.এ. পাশের [১৩৩৪ সালে] পর শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল - 'সেখান [শান্তিনিকেতন] থেকে বিদায় হবার পথ নিজের অজান্তেই তৈরী করেছিল এবং কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেইপথই দেখিয়ে দিলেন - নইলে তার কী দশা হত তা বলা কঠিন।

দুবুদ্ধি হলো। 'বিরাট রাজার গো-গৃহ' নামে নাটক লিখে শান্তিনিকেতন প্রেসে নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের নিয়ে অভিনয় করলে। . . . এই অভিনয়ের সাফল্যের পর 'বাজেটে' প্রমথের নাম পাওয়া গেল না'।^{৯৫}

এই নাটকের বক্তব্যটি নিম্নরূপ : শান্তিনিকেতন আশ্রমই যেন বিরাট রাজার গোগৃহ। রাজা বিরাট, তাঁর গোশালা বিরাট, কিন্তু ভালো গোরুর অভাব। এই মন্তব্যে তৎকালীন কর্তৃপক্ষের ক্ষুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই নাটকের দু একটি গান তখন সমগ্র আশ্রমে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং মুখে মুখে ফিরত।

১৩২৮ সালের 'শান্তি' পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রমথনাথের লেখা 'নির্বাসন' নামক একটি নাটক আত্মপ্রকাশ করে। তবে গ্রন্থাকারে এটি মুদ্রিত হয় নি। দেব ও মানবের যুদ্ধ এবং পরিণামে দেবতাদের জয় এই নাটকের বিষয়বস্তু। দেবতাদের মধ্যে 'অরুণ' মানবের পক্ষে থাকায় তাকে মর্ত্যে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। এর সংলাপগুলি কবিত্বমণ্ডিত ও স্বচ্ছন্দ।

রাজশাহী কলেজে বি.এ. পড়ার সময় প্রমথনাথ কলেজ হস্টেলে থাকতেন। সেই সময় তাঁর রচিত দুখানি নাটক 'আফিমের ফুল' ও 'প্রজাপতির পক্ষপাত' এই হস্টেলে অভিনীত হয়েছিল। এগুলির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯২৮ - ২৯ খৃঃ। দুটি নাটকই অমুদ্রিত।

এরপর 'শনিবারের চিঠি'-র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে এবং বার্নার্ড শ এর নাট্য-প্রতিভার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। তবে তাঁর প্রথম সার্থক নাটক 'ঋণ কৃত্য' শ' এর দ্বারা প্রভাবিত মনে হয় না। ১৩৪২, কার্তিক সংখ্যা, 'শনিবারের চিঠি'তে 'ঋণ কৃত্য' নাটকের আত্মপ্রকাশ শুরু হয়। পরে ১৯৩৫

৯৪। শান্তিনিকেতন - ১৩৩০, পৃঃ ৫৭ [আশ্রম সংবাদ]

৯৫। কথাসাহিত্য-শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৩, পৃঃ ১৩৫০ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

খঃ, রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে এটি প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে এবং আরো পরে নাট্যনিকেতনে সার্বকতার সঙ্গে অভিনীত হয়।

'ঋণ কৃত্তা' নাটকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত কৌতুককর। সনৎকুমার ঋণ শোধের ক্ষুলের প্রতিষ্ঠাতা। সে ব্যক্তিগত জীবনে বহুজনের কাছে ঋণী থেকে ও কৌশলে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্যান্য ঋণী ব্যক্তির উপকারে ব্যবহার করতে চেয়েছে। অবশ্য এই কৌতুককর ও কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়টির বিকাশ ও পরিণতি যথাযথ ভাবে এই নাটকে চিত্রিত হয়নি। সে কারণে ঘটনাটি নাটকের মধ্যে কোন গতিসঞ্চার বা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি। এই নাটকে ব্যঙ্গ নয়, কৌতুকরসেরই প্রাধান্য। কাহিনীর প্রেমঘটিত জটিলতা ও বিভিন্ন উদ্ভট পরিস্থিতির উদ্ভব এবং পরিণামে নায়ক-নায়িকার মিলনান্ত পরিণতি নাটকটির হাস্যরসকে উত্তরোল করে তুলেছে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের কথা এই নাটক পাঠের সময় মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সমালোচকের ভাষায়—'সনৎ-মঞ্জরী এবং ললিত-মণিকার প্রেমঘটিত কৌতুকময় জটিলতা ও তাহার সমাধানের মধ্যে মলিয়ারের কথা এই নাটক পাঠের সময় মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সমালোচকের ভাষায় - 'সনৎ-মঞ্জরী এবং ললিত-মণিকার প্রেমঘটিত কৌতুকময় জটিলতা ও তাহার সমাধানের মধ্যে মলিয়ার প্রভৃতি নাট্যকারদের অনেক নাটকের কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। মলিয়ারের মত যুগল চরিত্রের ক্রিয়া এবং কথার যুগপৎ সমবেশের দ্বারা নাট্যকার বিচিত্র কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির প্রতি শ্লেষ অমৃতলালের 'খাস দখল' প্রভৃতি নাটকের কথা মনে করাইয়া দেয়'।^{১৬}

এই নাটকখানি বাংলাদেশে বহুল প্রচারলাভ করেছিল। নাটকটির চরিত্রচিত্রণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় মেলে। সনৎকুমার নায়ক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও মুখ্য চরিত্র হর্ষনাথ। সে প্রেমভিখারী, সম্পত্তির প্রতি আসক্ত এবং আদর্শহীন চরিত্র। নাটকের যা কিছু জটিলতা ও সংঘর্ষ সবই এই হর্ষনাথ উকিলের সক্রিয় ভূমিকায় সংঘটিত হয়েছে। সুরদাসবাবু ও সনৎকুমারের মধ্যে বিচ্ছেদ গড়ে তোলা এবং মঞ্জরীর কাছ থেকে সনৎকে বিচ্ছিন্ন করার যা কিছু অপকৌশল সবই নিয়ন্ত্রণ করেছে এই হর্ষনাথ। হর্ষনাথের উদ্যোগে চন্দ্রনাথকে পুনর্গণা সাজিয়ে নাটকে তীব্রতা, গতি ও 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করা হয়েছে। ললিত-মণিকা ও ভজুয়া-পুটির শাখা কাহিনীদ্বয় সনৎ-মঞ্জরীর মূল কাহিনীর সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে মূলের রসধারাকে পুষ্টি ও বৈচিত্র্য দান করেছে। এগুলি মলিয়েরের নাট্যকৌশল সজ্ঞাত বলেই মনে হয়।

'ঘুতং পিবেৎ' বা 'সানি ভিলা' [১৯৩৬] নাটকে সর্বোদর সিংহ নগেন্দ্রনাথের

সহায়তায় রুচিবান ধনীরূপে আত্মপরিচয় দিয়ে বিচিত্র ছলনার আশ্রয়ে প্রতারণার জাল পেতেছেন, রাজপুত্র জামাই লাভের আশায় পুত্রী প্রমীরা কেতাদুরস্ত করার কাজে কৃত্রিমভাবে সক্রিয় করে তুলেছেন। অনুরূপভাবে গাড়ীর ডাইভার ত্রিদিবনারায়ণ তার আত্মীয় বিজয়নারায়ণের সাহায্যে ছদ্মবেশের দ্বারা রাজারূপে নিজেকে পরিচিত করে ধনী পিতার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে বড়লোক হতে চেয়েছে। এর উপকাহিনীতে নীরজা ও মালবিকা, ভূতপূর্ব স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নানা রহস্যঘেরা পরিবেশ পার হয়ে সত্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। নাটকের মধ্যে তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝলসানো শরজাল শেবাবধি রসাল কৌতুক রসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। নাটকের সর্স্বব্যাপী সরস প্রসন্নতার দীপ্তি কৃত্রিম বিবাদবাপ্পে ঢেকে পাঠকের অমূলক উদ্বেগ নিয়ে কৌতুক করেছেন লেখক। নাটকটির মধ্যে মলিয়ারের 'The Cit turned gentleman' নাটকের প্রভাব দৃষ্ট হয়। মলিয়ারের মতে প্র. না. বি. নাটকের মধ্যে সমান্তরাল দুটি ঘটনার সম্মিলন করেছেন এবং বৈপরীত্য জনিত চমকের সৃষ্টি করেছেন।

মিথ্যা মুখোশের অন্তরালে সমস্ত মুখ্য চরিত্রগুলি নড়াচড়া করেছে। স্বাথসিদ্ধির তাগিদে অপরের চোখকে ফাঁকি দিতে বাহ্যাদৃশ্যের প্রতিযোগিতা চলেছে। সম্পাদক, ডাক্তার, কমরেড প্রভৃতির প্রতি বক্র কটাক্ষ সুস্পষ্ট এবং মূল কাহিনী বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে আধুনিক সভ্য জীবনের সমস্ত কিছুই যে অন্তঃসারশূন্য একথা প্রমাণিত করতে হয়তো তাদের অবতারণা করা হয়েছে।

অভিনয় ক্ষেত্রে এই নাটকটি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিল। 'সানি' ভিলা [পূর্বনাম ঘৃতাং পিবেৎ]... অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশে এবং সন্তোষ সিংহের সহযোগিতায় ও প্রয়োগকৌশলে উদ্দাম হাসির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

১৯৪৩ এর বড়দিনে রঙমহলে সানি ভিলা প্রথম অভিনীত হয়।... সানি ভিলার মত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত কৌতুকনাট্য। আসলে মুখোশ পরা ভণ্ড অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ। স্টেজে কমই অভিনীত হয়েছে। এর প্লট যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি তা কৌতুকে মোড়া। এই কৌতুক নাট্যের প্লটের ট্রাজেডির লক্ষ্যে ক্রমবিকাশ আশ্চর্যসুন্দর।

দুদিকের দুটি প্রতারণা সমান্তরালভাবে চলাকালে পরিণতির দিকে দর্শকের আগ্রহ উগ্ররকমে বাড়িয়ে তোলে। প্রধানত নায়িকার ও তার পিতার অসহায়তার ট্রাজেডির উপরে সমস্ত হিউমার প্রতিষ্ঠিত আর সেজন্য এর মানবিক আবেদন অত্যন্ত গভীর'।^{১৭}

তৎকালীন যুগের একটি প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় 'ঘৃতাং পিবেৎ' নাটকের

রসাত্মক সমালোচনা আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল উদ্রেক করে—'চার্বাকবাদের চুম্বক হিসাবে যে ক্ষুদ্র শ্লোকটি প্রচলিত 'ঘৃতং পিবেৎ' তাহার মুখ্য এবং শেষতম অংশ। ইহা আধুনিক সভ্যতার একটি মূল মন্ত্র। এই সভ্যতার জন্মভূমি ইউরোপের অনুকরণে এই মন্ত্রের সাধনায় আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে লেখক এই বইখানিতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশেষ করিয়া বিবাহের দিকটাই বইয়ের লক্ষ্য। ভূমিকায় লেখা হইয়াছে— "ঘৃতং পিবেৎ বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক একখানি অপ-রোমান্টিক নাটক"। ভারতীয় বিবাহে পূর্বরাগের স্থান নাই। অথচ তাহার একটা নিজস্ব রোমান্স আছে। ইহার মধ্যে আধুনিক প্রথায় পূর্বরাগ আসিয়া পড়িয়া একটা জগাখিচুড়ি পাকাইয়া তুলিতেছে। ইহাতে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় তাহার বহুবিধ সম্ভাবনার মধ্যে অন্যতম দুইটি ঢাকুরিয়া লেক বা পটাসিয়াম সাইনাইড। এই পূর্বরাগ আর হিন্দু বিবাহের অচ্ছেদ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া লেখক আধুনিক সভ্যতার অনেকগুলি জিনিস চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন—নিও অ্যারিস্টোক্র্যাসি, কম্যুনিজম, ব্যবসায়তাত্ত্বিক সাহিত্য, আরও অনেক কিছু নাটকের অতিরিক্ত যাহা তাহা ভূমিকায় আছে। প্রবল সিনিকের মতো জাতীয় জীবনের [অর্থাৎ বর্তমানে জাতীয় জীবন যাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার] সমস্ত উপাদানগুলিই নিরপেক্ষভাবে দেখিলে সবসময় লেখকের সহিত একমত হওয়া যায় না। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় G. B. S. এর অনুকরণে তিনি বাঙ্গালা নাটকে যে পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই বহুলাংশে সফল হইয়াছেন। সাহিত্যে সিনিসিজম একটা আর্ট। এই আর্টে সিদ্ধহস্ত হইবার জন্য যাহা কিছু দরকার ভাষার ওজস্বিতা, ব্যঙ্গের তীব্রতা, হিউমার যা হাসির সঙ্গে সঙ্গে গায়ে জল বিছুটি দেয়, সবই তাহার আয়ত্ত, আর বেশ পুরামাত্রায়। নাটকীয় সিচুয়েশন সৃষ্টি করিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রবন্ধাংশে [যথা ভূমিকায়] তাঁহার কলম সবচেয়ে জোরালো। বীরবলের পরে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে এ জিনিসটা বাঁচাইয়া রাখিবেন। বোধহয় নূতন প্রচেষ্টা বলিয়া মাঝে মাঝে শক্তির অপব্যয় হইয়াছে তাহাতে কথাবার্তায় এবং ঘটনাসৃষ্টিতে কোথাও কোথাও জটিলতা আসিয়াছে। শক্তিশালী লেখক এ দোষ নিজে ভবিষ্যতে কাটাইয়া উঠিবেন'। ^{২৫} ঘৃতং পিবেৎ নাটকখানির সার্থক অভিনয় ও নামান্তর গ্রহণের মূলে ছিলেন রসিক সূজন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর কথায়— 'প্রমথর স্বর্ণ কুড়া ও ঘৃতং পিবেৎ দুটি কৌতুক নাটকই যথেষ্ট সুখ্যাতির সঙ্গে নাট্যনিকেতনে ও রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটক করানোর মূলে আমি ছিলাম বলে প্রমথ খুব খুশী হন এবং পেশাদার নাটকে কিছু অদলবদল করা প্রয়োজন বলে তাঁকে বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেই

সকল পরিবর্তন সাধন করেন। এমন কি 'ঘৃতং পিবেৎ' নামটি বদল করে সেটি 'সানিভিলা'য় রূপান্তরিত করতেও তিনি আপত্তি করেন নি। অভিনয় দেখে তিনি খুব খুশীও হন'। ৯৯

'মৌচাকে ঢিল' ১৩৪৫ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। একে নাট্যকার নাম দিয়েছেন 'রাজনৈতিক তর্কনাট্য'। এ নাটকের আঙ্গিকের নূতনত্ব বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মৌচাকে ঢিল' নাটকটির কাহিনী-বয়ন-কৌশল বিচিত্র। কাহিনী দুইটির উপধারা -একটি কাহিনী অষ্টম শতাব্দীর -গোপাল-ভদ্রা -মণিভদ্রের কাহিনী, দ্বিতীয় কাহিনী শ্রীমন্ত-সুভদ্রা-কল্যাণের—এ কাহিনীর পটভূমিকা বিংশ শতাব্দীর কলকাতা। নাট্যকার সুকৌশলে এই দুই কাহিনীর সংযোগ ঘটিয়েছেন। গোপালদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বঙ্কতা সর্বস্বতা ও ভক্ত আদর্শবাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তিনি।

ঐতিহাসিক কাহিনীর অর্থবহ ইঙ্গিত আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ হীনতার পাশাপাশি রেখে বৈপরীত্য জনিত নাটকীয় সংঘাত ফুটিয়ে তুলেছেন আধুনিক জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত নাট্যকার প্র. না. বি.। এ দিক থেকে 'মৌচাকে ঢিল' নাটকটির কাহিনী কিছুটা ঐতিহাসিক হলেও, প্রেরণা আধুনিক।

নাটকরূপে আত্মপ্রকাশের পর 'মৌচাকে ঢিল' যেভাবে পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় এই নাটকের বিস্তৃত ও গভীর সমালোচনায়। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়—"মৌচাকে ঢিল একখানি ব্যঙ্গ নাটক—শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত। আমাদের সামাজিক, ধার্মিক ও রাষ্ট্রগত জীবনের দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে পূর্বনাট্যকারগণ রঙ্গনাট্য বা ফার্সের আশ্রয় লইতেন। প্রমথনাথবাবু যে পছা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমাদের সাহিত্যে নূতন বলিলেও অত্যাধিক হয় না। এ পদ্ধতির প্রধান উপজীব্য হাস্যরস নয়, বস্তুতঃ সূতীর ব্যঙ্গ। বলা বাহুল্য, ব্যঙ্গের মধ্যেও একটা তির্যক হাসি আছে, কিন্তু সে হাসি উচ্ছ্বসিত নয় এবং উচ্ছ্বসিত ও শব্দিত নয় বলিয়াই তাহার নিজের উদ্দেশ্যকে ভাসাইয়া দিয়া উদ্দিষ্টকে অনাহত রাখে না।

আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু আমাদের [অথবা ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে জগতের] বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা। ডেমোক্রেসীর নামে যে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা জগতের চক্ষে ধূলা দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, নাট্যকার তাহার উপর নিজের সন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাত করিয়াছেন। গণতন্ত্র বেশ গালভরা নাম সন্দেহ নাই ; কিন্তু লেখকের মতে বলিতে গেলে—'ভাবিবার চেষ্টা সহজ হইতে পারে, কিন্তু ভাবিবার শক্তি

সহজ নয়—লক্ষজনের মধ্যেও একজনে চিন্তা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। 'এবং 'সেই জনাই ডিক্টেটরশিপের আবশ্যক'। অবশ্য স্বয়ং ডিক্টেটর নয়।

তাঁহার প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত করিবার জন্য নাট্যকার বর্তমান গণতন্ত্রের সহিত বাংলার অষ্টম শতাব্দীর সেই গণতন্ত্রের কাহিনী গ্রথিত করিয়াছেন যাহার প্রজারা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া গোপাল দেবকে গৌড়ের রাজসিংহাসনে বসাইয়াছেন। বইখানির টেকনিকে একটু বিশেষত্ব আছে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রন্থের ভূমিকাঅংশই প্রধান অংশ এবং G. B. S. প্রভৃতির পদ্ধতিতে নাটকটি ভূমিকার সম্প্রসারণমাত্র। ভাষার দিক দিয়া, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া প্রমথ বাবুর নাটকের ভূমিকা বাংলা ভাষায় এক নতুন বস্তু। আমার মনে হয় 'বীরবলের' পর বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে [এ অংশটিকে ঐ নামই দিতে হয়] এমন নূতন ভঙ্গীর অবতারণা আর কেহই করিতে পারেন নাই। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় এবং হিউমারের দীপ্তিতে তাঁহার বাক্যগুলো এক খরধার বজ্র অসির সহিতই তুল্য। তাঁহার মতের সঙ্গে সবজায়গায় মিলিল কিনা সে কথা আলাদা। তাহার লেখার ভঙ্গী এমনই অনবদ্য যে তাহা উপভোগ করিতেই হইবে।

মূল নাট্যাংশে লেখক এক অভিনব পছা অবলম্বন করিয়াছেন—পাশাপাশি গোপালদেবের যুগ এবং বর্তমান যুগের দৃশ্য সংযোজিত করিয়া শেষের দৃশ্যে দুইটি যুগকে মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে দুই যুগের চিন্তা ও কার্যপ্রণালীর সাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য দুই-ই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সুবিবেচিত ঘটনাসংস্থানে, উপযোগী চরিত্রবৃন্দের সমাবেশে ও কথোপকথনের স্বাভাবিকতায়।

মাঝে মাঝে লেখক ফার্সের অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের মতে এটুকু না করিলেই যেন ভালো ছিল, কেননা ইহাতে শুদ্ধ ব্যঙ্গনাট্যের মর্যাদা না ক্ষুণ্ণ হইয়াই পারে না'। ১০০

বস্তুতঃ পক্ষে এই নাটকের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট অংশ বাংলা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে মৌলিক ও মূল্যবান সংযোজন।

'ডিনামাইট ও অন্যান্য নাটক' প্রকাশিত হয় রজন পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৪২ খৃঃ। এই পুস্তকে ৪টি নাটক আছে—সাবিত্রীর স্বয়ম্বর (পৃঃ ১-৩৭) দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা (পৃঃ ৩৯-১১২) পশ্চাতের আমি (পৃঃ ১১৩-১৪৩) ও ডিনামাইট (পৃঃ ১৪৫-২১০) এবং এইগুলো পৃথক পৃথক চার ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত।

'মৌচাকে টিল' নাটকের মত 'সাবিত্রীর স্বয়ম্বর' নাটকের ভূমিকাটিও বার্নার্ড শ-এর আদর্শ ও কৌশল-প্রণোদিত এবং বিশেষ আকর্ষণীয়।

'দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা' শনিবারের চিঠিতে জ্যৈষ্ঠসংখ্যা, ১৩৪৮ সালে

প্রকাশিত হয়। এটি মলিয়েরের 'Romantic Ladies' নাটকের ভাবানুসরণে রচিত বলেই মনে হয়।

'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর' প্রকাশিত হয় রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৪৫ খৃঃ। এটি একটি পঞ্চাংক নাটক এবং রুশ নাট্যকার গোগলের বিখ্যাত নাটক 'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টরের' অনুবাদ। গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টরকে অনুবাদ বলে ধরবার উপায় নেই। কারণ ব্যঙ্গ-নিপুণ প্র. না. বি. গোগলের সঙ্গে এমনই এক-প্রাণতা অনুভব করেছেন যে, মনে হয় গোগল স্বয়ং এসে এই বইখানি এদেশের উপযুক্ত করে বাংলা ভাষায় লিখে গেছেন। বাঙালী পাঠকের উপযোগী হয়েছে এর প্রত্যেকটি কথা এবং পরিবেশ।

১৩৫১ সালের 'দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর' নাটক প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে। গ্রন্থের নিবেদন অংশে নাট্যকার বলেছেন— 'আমার অনেক মৌলিক রচনাকে অনেকে অনুবাদ মনে করেন আর এই বইখানা অনুবাদ বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইহাকে অনেকে আমার মৌলিক রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। . . . সর্বত্র মূলের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অনেক স্থলেই প্র. না. বি. গোগলের মহিমা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। সর্বত্রই আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব হয় নাই—দুইটি নূতন চরিত্রও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে'।

গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর একটি বলিষ্ঠ নাটক। সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে রচিত আন্তর্জাতিক আবেদন-সমৃদ্ধ এই প্রহসনটি ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ ও শ্লেষ মিশ্রিত এক অনবদ্য সৃষ্টি। মুখ্য চরিত্র অনঙ্গ চম্পাটি সহ সমস্ত চরিত্রগুলিই বাস্তব, জীবন্ত ও নিখুঁত। গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টরের আগমন সংবাদে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের মানসিক বিপর্যয় এই নাটকে প্রতিফলিত। বিদ্রোপের বারুদে ঠাসা এই নাটকে নিজের নাম 'প্র. না. বি.'কে নিয়েও পরিহাস মুখর হয়ে উঠেছেন নাট্যকার। নাটকের সমস্ত শব্দ ও উদ্বেগের অবসান ঘটেছে অনঙ্গমোহনের একটি পত্রে। এই পত্র প্রকাশিত হওয়া এবং প্রকৃত গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টরের উপস্থিতি চরম নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করে। আধুনিক বাংলা দেশের চাকুরিয়া শ্রেণীর সজীব চিত্র নির্মাণে নাট্যকারের শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়বহ। তাই এটিকে অনুবাদের পরিবর্তে মৌলিক নাটক বলেই মনে হয়। নাটকটির মধ্যে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও নাট্যকার এদেশের সমাজ জীবনের সঙ্গে তাকে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য দান করেছেন। ক্রাইম্যাক্স-অ্যান্টি ক্রাইম্যাক্সের দ্রুতসঞ্চারী জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে নাটকীয় সূত্র বিচিত্র কৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে।

'পরিহাস বিজয়িতম্' নামক একাঙ্গ নাটকটি কাত্যায়নী বুক স্টল থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল অমুদ্রিত। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে নাট্য-সমালোচনা ও নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য আছে। এই নাটকটির আঙ্গিক রচনা কৌশলও

বিশেষত্বমণ্ডিত। সমালোচকের ভাষায়— 'পরিহাস বিজয়িতম্ নাটকে মিনির জন্মতিথিতে নির্ধারিত নাট্য সংস্থার যখন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য অভিনয় করা সম্ভব হলো না, তখন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের তুমুল তর্ক-বিতর্কে কি ভাবে অভিনয় জমে উঠেছিল, তা কৌতুকে, পরিহাসে, বিদ্রূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। এখানে তেমন কোন প্লট নেই, কৌতুককর পরিস্থিতি ও সংলাপের ঔজ্জ্বল্যই এর প্রাণ'। ১০১

এই নাটকটির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি উপভোগ্য বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। 'অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, ডাক্তার, উকিল কেহই লেখকের বিশীর্ণ হইতে রক্ষা পান নাই। ইহাদের দুর্বল ও অসঙ্গত দিকগুলি সম্বন্ধে লেখকের বক্র ও অকাট্য মন্তব্য ঈষৎ অতিরঞ্জিত চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে'। ১০২

উকিলের সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না থাকলেও অন্যদের সম্পর্কে সমালোচক ঠিকই বলেছেন। যেমন— অধ্যাপক সম্পর্কে বিদ্রূপ :

'রিপোর্টার - আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ?

অধ্যাপক - দেখে কি মনে হয় ?

রিপোর্টার - আমি আড়াইকাঠা জমির উপরে তেতলা একখানা বাড়ী তৈরী করব - ক হাজার ইট লাগবে বলতে পারেন ?

অধ্যাপক - আমাকে এ প্রশ্ন কেন ?

রিপোর্টার - আমি তো শুনেছি — বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এ বিষয়ে সবাই বিশেষজ্ঞ।

আবার ডাক্তারের প্রতি ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। যেমন—

'ডাক্তার - আমাকে বেশী বিরক্ত করবেন না। আমি ডাক্তার। আপনাকে খুন করে ফেললেও আপনারই দোষ হবে। পোস্টমর্টেমে প্রমাণ হবে হয় আপনার হাট দুর্বল ছিল, নয়তো লিভার পচে গিয়েছিল।'

সম্পাদক, মেয়র ও প্রকাশকের প্রতি শ্লেষও আছে। যেমন -

'সম্পাদক - মহাশয়রা! আমাকে ঠাট্টা করলেন কি না বুঝতে পারছি না। বাড়ী ফিরে গৃহিনীর সঙ্গে একবার আলোচনা করব - যদি ঠাট্টা বলে মনে হয় - তবে

হ্যা, দেখতে পাবেন।

মেয়র - কি দেখব?

সম্পাদক - কালকে কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভটা একবার দেখবেন। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। (প্রস্থান)

মেয়র - নাঃ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত হয় নি। সামনেই আমার ইলেকশন্।

প্রকাশক - ঠিক বলেছেন—পুস্তক পরিচয় নাম দিয়ে আমার প্রকাশিত বইয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলো বের হয় — এরপর হয়তো তা হবে না।'

প্রতিটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও সরস সংলাপ বক্তব্যের প্রতি পাঠকের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে।

'ভূতপূর্বস্বামী' নাটকের প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ', কিস্তি প্রকাশকাল অমুদ্রিত। তবে ১৩৬১ সালের পৌষ সংখ্যা, 'দেশ' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা স্তম্ভে এই নাটকটির উপর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই থেকে অনুমান করা যায় যে ১৩৬১ সালের কোন সময়ে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'একখানি নাটক। রস সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহা প্র. না. বি.-র নবতন অবদান। ২য় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মনোজগতে যে বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে তাহারই পটভূমিতে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ'।^{১০০}

জনৈক ভদ্রলোক আপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সিঙ্গাপুর গেছেন এবং যাবার সময় পত্নীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে গেছেন কোন এক বন্ধুর উপর। কিছুদিন পরে ভুলক্রমে তার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় এবং তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত বন্ধুটি সুযোগ বুঝে বন্ধুর শূন্যগৃহে জাঁকিয়ে বসেন, চেষ্টিত হন বন্ধু পত্নীর ফাঁকা মনে আসন পাততে।

সে চেষ্টা অচিরে সফল হয়। বিবাহ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ে যখন আনন্দে নীড় বাঁধতে উদ্যত এমন সময় মহিলার ভূতপূর্ব স্বামী সশরীরে হাজির হন। এইখান থেকে শুরু হয় বর্তমান ও ভূতপূর্ব স্বামীর মধ্যে পত্নীর অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। পরিণামে এই দ্বন্দ্বের কৌতুককর অবসান ঘটে।

'পারমিট'। ১৯৫৬-২য় সং। শ্রীগুরু লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত। যুক্তোত্তর বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে প্র.না.বি.-র পারমিট নাটকটির ঘটনা গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক লোভ ও লালসা মানুষ ও সমাজকে কতদূর অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে— তারই বাস্তবসম্মত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। সংলাপের খরশান ব্যঙ্গবাণ মর্মভেদের

উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সার্থক ।

পারমিট নাটকটিতে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তী ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের নানান্তরের দুর্নীতির ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশা ছবিটি প্রতিফলিত হয়েছে । রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মধ্যবিত্তের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সর্বত্রই যে নীতিহীনতা ও রুচিহীনতা মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই সুন্দর, বাস্তবসম্মত ও রসসিক্ত প্রতিচ্ছবি মেলে এই নাটকে । দুর্নীতি পরায়ণ, চোরাকারবারী ও জেল ফেরত অসাধু ব্যবসায়ী টাকার জোরে সমাজে সকলের প্রশংসার পাত্র । মধুলোভী মৌমাছির মত সকলে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে সুপ্রকাশের স্তাবকতা করেছে । কারণ সে জাল পারমিটের সাহায্যে চোরাবাজারে ভেজালের কারবার করে প্রচুর অর্থের মালিক । ধরা পড়ে তার জেল হওয়া সত্ত্বেও সে সকলের মান্য । সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গের যে ঘোলা জল প্রবেশ করেছিল তারই সুযোগে অনেকে অসাধু উপায়ে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে বড় বড় মাছ ধরার কাজে নেমে পড়েছিল । পচনশীল সেই সমাজে চারিদিকে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল প্রমথনাথ শ্রেষ্ঠ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্রূপ করে তারই চিত্র উপস্থাপিত করেছেন এই নাটকে । যুনুসরা রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ করেছেন । যেমন—

' **খন্দরধারী** - মশায়, আমি আসছি হাতীডোবা প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে - আপনাকে তার সভাপতি হতে হবে ।

সুপ্রকাশ - আপনি কি পাগল হয়েছেন ? কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল — আমাকে করবেন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ।

খন্দরধারী - সে সব ব্যবস্থা করবার ভার আমার উপরে — আপনি কেবল রাজী হয়ে যান ।

সুপ্রকাশ - কিন্তু আমি যে চোরাবাজারী ।

খন্দরধারী - সে কি আর জানি না । কিন্তু কংগ্রেসকে এত সংকীর্ণ হলে চলবে না — কংগ্রেসে সকলেরই স্থান হওয়া আবশ্যক ।

রজত কর - সকলের তো এক কাজ নয় ।

খন্দরধারী - বাঃ বাঃ বেশ কথা বলেছেন । কাপড়ের হ্যান্ডলিং এজেন্সী সুকুমার কৌশলে অমুককে প্রদত্ত হবে, পারমিটের দালালী করবেন হংসবিলাসবাবু আর এই

শর্মা কেবল আঠারোদফা কর্মপদ্ধতি নিয়ে জীবন কাটাতে ! সেটি হচ্ছে না আমি অন্ততঃ একটা পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীশিপ চাই — নইলে I shall break the Congress from within - সেইজন্যই তো এসেছি আপনার কাছে । '

দেশী সিমেন্টের সঙ্গে গঙ্গামাটি মিশিয়ে বিক্রি করে সিমেন্ট ব্যবসায়ীরা তখন অসাধুভাবে প্রচুর মুনাফা লুটত । তার চিত্র পাই এই নাটকে -

" রজত কর - গঙ্গামৃত্তিকা অতি পবিত্র জিনিস । কতগুণ দেখো । প্রথমতঃ বিলিতি বস্তুর শোধন হল, দ্বিতীয়তঃ ওজন বাড়তে প্রচুর লাভ হল । তৃতীয়তঃ যে সেই সিমেন্ট দিয়ে বাড়ী তৈরী করলো বছর না ঘুরতেই তার বাড়ী ফেটে চৌচির হওয়াতে আবার সে তোমার কাছে এলো সিমেন্ট কিনবার উদ্দেশ্যে ।

সুপ্রকাশ - I see ! গঙ্গামৃত্তিকার এত গুণ !

রজত কর - প্রণম্য, প্রণম্য । গঙ্গামৃত্তিকার এসব গুণ প্রাচীনেরা জানতেন না - তাঁরা ফোঁটা তিলক কেটে কত মাটিই না মাটি করেছেন । এই ভাবে ছ'মাস পারমিট বের করলেই দেখো লাখ টাকা হয় কি না ! "

' রত্নাবলী ' একটা একাঙ্ক নাটক - ১৩৬৫ সালের শারদীয়া ' দেশ ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত মধুসূদন দত্তের ' রত্নাবলী ' নাটক দর্শন এবং সেই বিষয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, সিংহ ভ্রাতৃগণ প্রভৃতির পারস্পরিক কথোপকথন এই নাটকের বিষয়বস্তু ।

১৯৪৭ খৃঃ ' মিত্র ও ঘোষ ' থেকে প্রকাশিত ' বেনিফিট অব্ ডাউট ' বইখানি তিনটি নাটকের সমষ্টি - (১) বেনিফিট অব্ ডাউট, (২) কে লিখল মেঘনাদবধ (৩) জাতীয় উন্মাদাশ্রম ; এই তিনখানিকে নাট্যকার নাম দিয়েছেন - ' নাট্যোপন্যাস ' । মুখবন্ধে তিনি বলেছেন - ' বঙ্গদেশে উপন্যাস যে লিখিল না সাহিত্যিক বলিয়া সে গণ্য নয় । তাই মানরক্ষার্থে এই গ্রন্থের নাটকগুলির নামকরণ করিয়াছি নাট্যোপন্যাস - অন্ততঃ আধা সাহিত্যিক হইব এই আশায় ' । মূলতঃ এগুলি নাটক ফলে দৃশ্যকাব্য । কিন্তু উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে সংমিশ্রিত আছে । যেমন ভূমিকায় দীর্ঘ আলোচনা, দৃশ্যসজ্জার খুঁটিনাটি বর্ণনা, মাঝে মাঝে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য, ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি । দু'একটি সংলাপ সুদীর্ঘ ও উপন্যাসিক বর্ণনার সামিল ।

'বেনিফিট অব্ ডাউটে'র বিষয়টা রোহিনী হত্যার অভিযোগে বঙ্কিমচন্দ্রকে ৩০২ ধারা মোতাবেক বিচার এবং বিচার-প্রহসনের শেষে প্রমাণাভাবে বেনিফিট অব্ ডাউটে বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্তি।

'কে লিখিল মেঘনাদবধ?' নাটকে পরিহাসপ্রিয় লেখক মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের পরিবর্তে বিদ্যাসাগরকেই সাব্যস্ত করেছেন।

'জাতীয় উন্মাদাশ্রম' নাটকে ২০০৪ খৃঃ বাংলা দেশের সমস্ত মানুষই যে উন্মাদে রূপান্তরিত হবে সেই রকম আশঙ্কাপ্রসূত একটি বিশ্বস্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লেখকের মতে প্রথমটি 'সমালোচনামূলক ভাবী ঐতিহাসিক নাটক,' দ্বিতীয়টি 'গবেষণামূলক অঘটিত ঐতিহাসিক কমেডি' এবং তৃতীয়টি 'রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবী ঐতিহাসিক কমেডি।' পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে কোন সুনির্দিষ্ট রসপরিণতিতে উপনীত না হওয়াতে এই শেযোক্ত নাটকগুলি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

প্র. না. বি.-র নাট্য প্রতিভার বিকাশ, পরিণতি ও বিশেষত্ব :

প্রমথনাথ বিশীর নাটক রচনার সূত্রপাত হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের অভিনয় দর্শন, অভিনয়ে অংশগ্রহণ, শান্তিনিকেতনের পল্লী প্রকৃতির নাটকীয় পট পরিবর্তন—প্রভৃতি শৈশব থেকেই প্রমথনাথকে নাট্যরস পিপাসু করে তুলেছিল। 'শারদোৎসব' নাটকের সংলাপগুলি শিশু প্রমথনাথকে মুগ্ধ করত। এছাড়া 'রবীন্দ্রনাথের আর একখানি নাটক আমার মনের উপর সোনারকাঠি বুলাইয়া দিল। . . . তখন আমার সদ্যজাগ্রত কৈশোর, চোখে জলস্থলের রঙ বদল শুরু হইয়া গিয়াছে, এমনসময় ফাঙ্কুনী নাটক তাহার গানগুলি ও নবযৌবনের দল লইয়া আসিয়া রত্নাকর দস্যুর মতো আমার উপরে পড়িল। . . . এও এক চাবি খুলিয়া দিল, তবে আরো ভিতরকার মহলের। এরা সব অপরাধের দূতী, সোনার চাবি হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সব সোনার চাবি আমার জীবনের অজ্ঞাত প্রায় কত দরজা-জানলা, কুলুঙ্গি-কুঠুরি খুলিয়া দিয়াছে তাহার ইতিহাস যদি লিখিতে পারিতাম।' ১০৪ এরপর কিছুদিন বাদে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় দেখেন এই শান্তিনিকেতনেই। 'এই নাটক আমার কাছে অপরাধের আর একটা বাতায়ণ খুলিয়া দিল।' ১০৫

শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলাপ্রদর্শনে দ্বিপ্রহরে যাত্রা গান হোত। প্রমথনাথ যাত্রাগান শুনতে ভালবাসতেন— 'যাত্রাগান আমাকে চিরদিন অত্যন্ত মুগ্ধ করে, আমি তন্ময় হইয়া বসিয়া দেখিতাম।' ১০৬ নাটকের প্রতি কবি-কিশোরের যে গভীর আকর্ষণ

১০৪। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - পৃঃ ৩০।

১০৫। তদেব - পৃঃ ৩৩।

১০৬। তদেব - পৃঃ ৩৩।

ছিল, তিনি যে মনে-প্রাণে নাটককে ভালবাসতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় উপরি উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে। এরপর তিনি নিজে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। 'যে অভিনয়ে আমরা আশ্রমের সকলেই সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলাম ও খ্যাতি লাভ করিলাম তাহা রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নামে নাটকখানির অভিনয় উপলক্ষ্যে'। ১০৭ এতে প্রমথনাথ ঈশা খাঁর ভূমিকায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেন। এর পর তিনি রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব, ঋণশোধ, অচলায়তন, বৈকুণ্ঠের খাতা, বিসর্জন প্রভৃতি নাটকে একাধিকবার সার্থকভাবে অভিনয় করেছেন। বাংলা নাটক ছাড়াও বেণীসংহার, চন্দ্রকৌশিক প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে অভিনয় করে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। এইভাবে অভিনয়কলা ও মঞ্চসজ্জাকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে গুরুদেব যে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন বা শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন -নাট্যশিল্পে উৎসাহী প্রমথনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ শিল্পে সংযুক্ত থেকে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন - যা পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের মত তত্ত্বনাট্য, রূপক নাট্য, গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য তিনি রচনা করেন নি। বরং প্রথা-প্রকরণে নূতনত্ব আনার তাগিদে, নাটকে সমাজ বাস্তবতার সজীব স্পর্শ দিতে এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব ও খ্যাতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে নিজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পাশ্চাত্য ভাবধারায় বার্ণাড শ ও মলিয়ার প্রভৃতির অনুসরণে ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে ও রবীন্দ্র নাটকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে প্র. না. বি. রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মার্জিত, সরস, সংহত ও বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল সংলাপ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তা যেমন নাট্যসত্তাকে প্রভাবিত করেছে তেমনি রবীন্দ্রনাট্য ও সমগ্র শান্তিনিকেতনের রোমান্টিক অপরূপত্ব তাঁকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে রোমান্টিক কবি প্রমথনাথকে নাট্যকার প্র. না. বি. কখনও পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তার দৃষ্টান্ত তাঁর নাটকের সর্বত্র। তাঁর নাটকগুলির প্রকাশভঙ্গী ও দৃষ্টিভঙ্গী নাটকীয় হয়েও মূলতঃ কাব্যিক।

যাত্রাপ্রিয় প্রমথনাথ বন্ধু বিভূতি গুপ্তের উৎসাহে ও সহযোগিতায় যাত্রাপালা লেখা শুরু করেন ২২ বছর বয়সেই। পরবর্তীকালে তিনি যাত্রা শিল্পকে পরিত্যাগ করে ব্যঙ্গ রসাত্মক সামাজিক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর মতে'- নাটক ও যাত্রা সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে জটিল শিল্প। তাহার একদিকে লেখক অন্যদিকে দর্শক কিন্তু মাঝখানে আছে অভিনেতা, প্রযোজক, গায়ক, নর্তক, মঞ্চসজ্জাকর, চিত্রশিল্পী। এতগুলি

লোকের সমবেত চেষ্টায় লেখকের রস সম্পূর্ণ উদ্দোষিত হইয়া তবে দর্শকের কাছে পৌঁছায়। তাহাদের চেষ্টার সফলতায় রসের সার্থকতা। তাহাদের চেষ্টা বিফল হইলে ভালো লেখাও ব্যর্থ হইতে পারে। যথার্থ নাটক যৌথ শিল্প; কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের কৃতি নয়।^{১০৮}

নাটকে প্রমথনাথ বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন অবলম্বনে তার কৃত্রিমতা, ক্রটি ও অসঙ্গতিগুলিকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জজরিত করেছেন। উচ্ছ্বল, তীক্ষ্ণ সংলাপ, টাইপ চরিত্র, ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে কৌতুককর অসঙ্গতি আবিষ্কার, প্রমথনাথের নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জি. বি. এস-এর ভাবশিখ্য প্র. না. বি. র কৌশল-চাতুর্য এখানে চরমে উঠেছে।

প্রমথ-প্রতিভা বৈচিত্র্য পিয়াসী। তাই বিষয়বস্তু, রূপ-রীতি বা প্রথা-প্রকরণের ক্ষেত্রে তিনি বারবার রূপ পরিবর্তন করেছেন। তিনি বহুরূপী। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকলেও তিনি অন্য একাধিক স্বদেশী ও বিদেশী বিখ্যাত সাহিত্যিককে অনুসরণ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সবই সাময়িক। সুদীর্ঘকাল ধরে কোন একটি বিশেষ প্রতিভাকে অনুসরণ করে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না - এর মূলে ও সেই বৈচিত্র্য পিয়াসা। তিরিশের দশকে রচিত নাটকগুলিতে বার্নার্ড শ-এর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য। তার কারণ মনে হয় যে তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক খ্যাতির ছত্রছায়াতল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে স্বআলোকে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। অথচ সাহিত্যজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে এমন কিছু করা দরকার যাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই উদীয়মান সাহিত্যিকের প্রতি। এই সময়কার প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছেন - 'নানা উপায়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। বার্নার্ড শও করেছেন, আমিও করেছি, বুদ্ধিমান সবাই তাই করবে। . . . বার্নার্ড শ আর একটি ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিলেন - যখন কী বলব রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে যেতে চাইছি, নাটকের ব্যাপারে। আমার প্রথম নাটক 'রথযাত্রা' রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পরে নাটকে সে প্রভাব ছেদ করতে চেয়েছি-তিরিশের দশকে-এ ব্যাপারে আমার সাহস ও সহায় বার্নার্ড শ'।^{১০৯}

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে বার্নার্ড শকে তিনি সাহিত্যজীবনে দীর্ঘদিন অনুসরণ করেন নি। সাহিত্য জগতে প্রথম প্রবেশে প্রতিষ্ঠালাভের বিশেষ উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবার পর তাঁর পক্ষে শ-কে অনুসরণ করার আর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। বরং পরবর্তীকালে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে মলিয়েরের ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছেন। 'মৃতং পিবেৎ' নাটক থেকেই বার্নার্ড শকে অনুসরণ করেন প্র. না. বি.। এই নাটকের প্রথম সংস্করণের প্রথম

১০৮। তদেব - পৃঃ ১৮৫।

১০৯। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩, পৃঃ ১৪০৫, শঙ্করী প্রসাদ বসু।

পৃষ্ঠায় একটি চিত্রে দেখা যায় বার্ণার্ড শ এর পিঠে মই লাগিয়ে তর তর করে উপরে উঠে চলেছেন নাট্যকার প্র. না. বি.। চিত্রটি যেমন কৌতুককর তেমনি বিশেষ অর্থবহ। এই নাটকের ভূমিকা অংশে প্র. না. বি. বলেছেন - 'বিধাতার দুইটি মূর্তিমান ভূমিকা। বিধাতা পুরুষ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বৃদ্ধিতে পারিলেন কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ব্যতীত ইহা দুর্বোধ্য তাই তিনি জি. বি. এস ও প্র. না. বি. নামধেয় দুই ভূমিকাপট্টী লেখককে সৃষ্টি করিয়াছেন'। এই ধরণের উক্তি অনেকের কাছে অত্যন্ত রূঢ় আত্মপ্রচার ও 'অশোভন আত্মসম্বন্ধতা' ^{১১০} বলে নিন্দিত হয়েছে।

বার্ণার্ড শ-এর মতো প্র. না. বি.-র অনেক নাটকে ছোট-বড় ভূমিকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি বহুক্ষেত্রে নাটকের বিষয়বস্তু ও মর্মসত্যকে প্রকাশ করে। কখনও বা নাট্য প্রকরণ ও রীতি-নীতি বিষয়ে আলোকপাত করে। ভূমিকা বহুক্ষেত্রে টীকার কাজ করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনেক নাটকে ছোটখাটো ভূমিকা জুড়ে দিয়েছেন। প্রমথনাথের নাটকে কালিদাস ও মল্লিনাথকে যেন একই আসনে একই কলমে লিখতে দেখা যায়। কেউ কেউ 'ভূমিকাপট্টী নাট্যকার' বলে প্রমথনাথকে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে নাট্যপ্রতিভার ন্যূনতা পূরণের উদ্দেশ্যেই নাটকে ভূমিকার অবতারণা। অনেক সুধী সমালোচকও প্র. না. বি.-কে ভুল বুঝেছিলেন তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোক্ত উক্তিটিতে - 'অমৃতলালের প্রতিভার উত্তরাধিকারী তিনি। সেই জন্য তাঁহার নাটকে কেবল আঘাতের পরে আঘাত, সেখানে বিন্দুমাত্র ক্ষমাসিক্ত সহানুভূতির স্থান নাই। তিনি বার্ণার্ড শ-কে গুরু বলিয়া মানিয়াছেন এবং গুরুর আত্মজরিতা ও বিশ্ববিদ্বের তিনি নকল করিতে চাহিয়াছেন। . . . প্রমথবাবু বুঝিয়াও বুঝেন নাই যে জি. বি. এস এ যাহা শোভা পায়, প্র. না. বি. তে তাহা শোভা পায় না। লোকে অসাধারণ মননশীল বার্ণার্ড শ-এর প্রতিভার কাছে নতিস্বীকার করে, কিন্তু প্রমথবাবুর অশোভন আত্মসম্বন্ধতা মানিয়া লইতে পারে না'। ^{১১১}

সমালোচকের এই বিচার বিভ্রান্তির মূলে নাট্যকার প্র. না. বি. ও কম দায়ী নন। তাঁর বক্তোক্তি ও শ্লেষাত্মক কথাবার্তা এবং স্বাভাবিক ও প্রচলিত নাট্যধারা বা চিন্তাধারার বিপরীত মুখে চলবার প্রবণতা এবং গান্ধীর মতো পরিহাসের হালকা চাল টেনে আনা অনেক পাঠককে তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ করে তুলেছে। যাদের শিক্ষা ও অনুভূতির গভীরতা নেই তাঁরা তাঁর নাটকের রসগ্রহণে হেঁচট খেতে পারেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকের ক্ষেত্রে ও তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য ও একাধিক অর্থবহ কথার মারপ্যাচ, সংলাপের বিষম সমাবেশ এবং কালোকে সর্বদা কালো বলার দ্বিধাহীন

কাঠিন্য ও ব্যক্তিত্ব কিছু পাঠক ও সমালোচককে করে তুলেছে তাঁর প্রতি বিরূপ ও বীতশ্রুহ।

পরিহাসপ্রবণতা প্রমথনাথের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে কৌতুক, গ্লেশ ও বাগবৈদগ্ধ্য তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র ও সাহিত্যিক-সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আবার প্রকৃত ব্যঙ্গ কৌতুকের স্নিগ্ধতা থাকে কম। যদি ব্যঙ্গের সফল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় হয় তবে আক্রমণটা নির্ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ রচনাও যেমন বিরল তেমনি তার বোদ্ধা পাঠক সংখ্যাও পরিমেয়। এই কারণেও মনে হয় প্র. না. বি. বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় নাট্যকার নন।

বার্ণার্ড শ-এর মত প্র. না. বি. ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং ফলত অনেকের বিরূপভাজন। শ' একত্র বলেছেন - "I write plays with the deliberate object of converting the nation to my opinions . . . I have no other incentive to write plays."^{১১২} তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাই দেশবাসীকে কঠোর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাঁর মতাদর্শের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকগুলির মাধ্যমে।

প্রমথনাথ বিশীও দেশপ্রেমিক ও স্বজাতিপ্রেমিক নাট্যকার ছিলেন। বাঙালী জাতিকে বিশেষতঃ 'আধমরাদের ঘা মেরে' বাঁচানোর তাগিদেই তিনি কলম ধরেছিলেন। তাই কোন কোন সময় তাঁকে নির্ভুল বলেই মনে হয়। তিনি বলেন - 'আমার নাটক দেখিতে হইলে শুধু চোখ থাকিলেই চলিবে না। সাধারণ নাটকের দর্শকের পক্ষে চোখই যথেষ্ট, চোখের কাজ অশ্রুপাত, আর নাটকগুলিই যে এক একটি কামার জোলাপ। সঙ্গে মস্তিষ্কও থাকা দরকার। বাঙালীর তাহার একান্ত অভাব'।^{১১৩}

উক্ত মন্তব্যটি নাট্যকারের অহমিকাজাত বা বাঙালী-বিদ্বেষপ্রসূত মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁর অধিকাংশ নাটক তাঁর স্বজাতি ও স্বদেশপ্ৰীতির ফলশ্রুতি। তাই তাঁর বাইরে হাসির ছটা কিন্তু অন্তরে বেদনার ফল্গুপ্রোত। বিভিন্ন দুর্বলতা পরিহার করে, অসঙ্গতি দূর করে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করার জন্য বক্তৃতাটাকের পর্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে নাটকে যে সংলাপ অশনি ভরা বিদ্যুতের মতো অবক্ষয়ে নিমজ্জিত মুমূর্ষু জাতিকে সজাগ ও সজীব করে তুলবে এবং আত্মবিশ্মৃতির অতল গহ্বর থেকে আত্মনির্ভরতার ঐতিহ্যপুষ্ট আলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে - এটাই ছিল প্র. না. বি. -র মূল লক্ষ্য। বঙ্গপ্ৰীতির সুরে মানবতাবোধেরই জয়গান গীত হয়েছে তাঁর নাটকে। তিনি বিশিষ্ট নাট্যকার কিনা সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ থাকলেও তাঁর প্রচেষ্টা যে শুভ ও বিশেষ অর্থবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য তাঁর ছদ্মবেশে ও ছদ্মভাষণে লোকে এমন ভাবে মুগ্ধ হয়েছে বা বলা যায়

১১২। Preface to The Shewing - up of Blanco Posnet - G. B. S. P-319.

১১৩। পরিহাস বিজলিত প্র. না. বি. - পৃঃ ৮৭।

প্রভাবিত হয়েছে যে তাঁর স্বরূপ রয়ে গেছে অনাবিকৃত। ফলে তাঁকে মনে হয়েছে আত্মসত্ত্বী ও খ্যাতির কাঙাল। তাঁর অভিনয়কেই লোকে তাঁর স্বরূপ বলে ভুল করেছে। তাই বহু ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতে হয়েছে। এবিষয়ে তিনি বঙ্কিমের কমলাকান্তের দোসর; বোধ হয় সেই কারণেই পরবর্তীকালে তিনি 'কমলাকান্ত শর্মা' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।

বার্ণার্ড শ-এর নাটকের মতো প্র. না. বি.-র নাটকের মূলরস হিউমার ও স্যাটায়ার। কিন্তু এই স্যাটায়ার বুদ্ধিদীপ্ত 'শেভিয়ান স্যাটায়ার'। শ' ছিলেন মূলত দার্শনিক ও 'শেভিয়ান' দৃষ্টিকোণের অধিকারী। তাঁর চিন্তাধারা ছিল অনেক ব্যাপক ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাই শ-এর নাটকে অঙ্কিত প্রেম-চিত্র আবেগ প্রধান নয়, বুদ্ধিপ্রধান। প্রমথ বিশীর 'ঋণ কৃত্তা' নাটকের পর থেকে পরবর্তী নাটকগুলিতে প্রেমচিত্র আরও বেশী বুদ্ধিগ্রাহ্য। এই আবেগমুক্ত ও বুদ্ধিপ্রোচ্ছল স্যাটায়ার তাঁকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। অমৃতলাল প্রভুতি প্র. না. বি.-র পূর্বসূরী বাংলা নাট্যকারদের ব্যঙ্গরসায়ক নাটকে সেন্টিমেন্টের বা আবেগের প্রাধান্য। কিন্তু প্র. না. বি.-র নাটকে আবেগ বিরল। তাঁর হাসি বুদ্ধিদীপ্ত—যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই কারণেই তিনি যুক্তিবাদী, মার্জিতমনা ও পরিমিত শব্দ সন্ধানী। এ দিক থেকে রাজশেখর বসু ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর প্রতিভার নৈকট্য সমধিক।

শ' ছিলেন সম্পূর্ণ অ-রোমান্টিক ও ভাবালুতাবিরোধী। শ্রীযুক্ত বিশীর কতকটা তাই। তবে যেহেতু তিনি মূলতঃ কবি তাই আবেগানুভূতিবর্জিত ভাবনা, চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপ রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

প্র. না. বি.-র নাটকে চিকিৎসক সম্প্রদায় ও চিকিৎসা কর্মের প্রতি যে বিদ্রোহ-বাণ বর্ষিত হয়েছে তা একদিকে জর্জ বার্নার্ড শ-র 'Doctor's Delimma' [১৯০৬] এবং অন্যদিকে মলিয়েরের 'Love is the best doctor' - - - এর প্রভাবপুষ্ট বলেই মনে হয়। তবে প্র. না. বি.-র পূর্বে ১৯ শ শতকের বাংলা সামাজিক প্রহসনে বহুক্ষেত্রে ডাক্তারদের শঠতা, প্রবঞ্চনা, কামুকতা, মুখতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে বিদ্রোহবিক্ষেপ করে। এক্ষণে কয়েকটি প্রহসন :- ভুবনমোহন সরকার রচিত 'ডাক্তারবাবু' [১৮৭৫] রাজকৃষ্ণ রায় রচিত 'ডাক্তারবাবু' [১৮৯০] এবং রাজকৃষ্ণ দত্ত রচিত - 'যেমন রোগ তেমনি রোজা' [১৮৮২]। কাজেই এ ব্যাপারে প্রমথনাথ শুধু শ'বা মলিয়ের নয়, উক্ত বাংলা প্রহসন রচয়িতাদের প্রেরণাও পেয়ে থাকতে পারেন।

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের প্র. না. বি.-কে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে থাকতে পারেন। ঘটনার বৈপরীত্য জনিত কৌতুক ও কৌতুহল এবং দুটি কাহিনীর সমান্তরাল সমাবেশ প্রভৃতি নাট্যকৌশল মলিয়েরের কথা মনে পড়ায়। মলিয়েরের মতো তাঁর সব নাটকের বিষয়বস্তু সামাজিক মানুষ এবং তাঁর রচনাভঙ্গী সরস ও স্বচ্ছন্দ। কোন

কোন সংলাপ সুদীর্ঘ কিন্তু সরস বলেই ক্লাস্তিকর নয়। কাহিনী চয়ন ও বয়নে আছে নাটকীয়তা। ফলে পাঠক ও দর্শকের কাছে তা রহস্য-কৌতূহলে ঘেরা এক বিশেষ আকর্ষণ। মলিয়েরের 'Le Bourgeois Gentilhomme' - নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে এবং কোন কোন কাহিনী অংশ বা চরিত্রের সঙ্গে প্রমথনাথের 'ঘুতং পিবেৎ' নাটকের মিল আছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তঃসারশূন্যতা বা মধ্যবিত্ত মানুষের অভিজাত হওয়ার কৃত্রিম সাধনা উভয় নাটকেরই মূল প্রতিপাদ্য। অবশ্য মলিয়েরের মত তাঁর নাটকে গানের বাহুল্য বা পদ্যচ্ছন্দের ব্যবহার নেই। তবে কোন কোন নাটকে দু'একটি গানের অবতারণা করা হয়েছে এবং সেগুলি খুব সুপ্রযুক্ত মনে হয় না। একথা ঠিক যে সরস কৌতুকে, সুপ্রযুক্ত ও সংহত সংলাপ সৃজনে এবং জীবনবোধের প্রসঙ্গ গভীরতায় প্র. না. বি. মলিয়েরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। সমালোচকের ভাষায়- 'মলিয়েরের তুলনায় প্রমথনাথ বেশীর জীবন দৃষ্টি গভীর এবং স্বচ্ছতর। তাঁহার সহজাত কৌতুকবোধের স্পর্শে তাঁহার রচনা মাত্রই সরস হইয়া উঠে। তথাপি মলিয়ের অপেক্ষা তাঁহার আঘাত তীব্রতর বলিয়া বোধ হইবে'^{১১৮}।

বাংলা প্রহসন রচনার ধারায় অমৃতলাল বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নাকটগুলি সাধারণ দর্শকের গ্রহণ ক্ষমতার নিরিখে রচিত বলেই বোধ হয় সেখানে একটা হালকা সুর এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে তীব্র ঝাঁঝ বা ছালার অনুপস্থিতি দেখা যায়। তবে সাধারণে এগুলি বেশ উপভোগ করতেন। এগুলির সবই অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রোতার রসপিপাসা চরিতার্থ করত। ঠিক অভিনয়-নিরপেক্ষ শুদ্ধ পাঠের মাধ্যমে নাট্যরস উপভোগের আধার হিসাবে এগুলি লিখিত ছিল না। সে গুণ ছিল রবীন্দ্র নাট্যে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হয়েও রবীন্দ্রনাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের সম্পদ হিসাবে সমাদর লাভ করেছিল। প্রমথনাথও এ বিষয়ে গুরুদেবের পদাঙ্কানুসারী। তাঁর নাটকগুলি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খনি এবং দর্শকমনোপেক্ষা পাঠকমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার সহজাতগুণসম্পন্ন কিংবা উভয় গুণেই সমগুণী।

সাধারণতঃ মঞ্চসফল নাটকেরই চাহিদা থাকে বেশী। প্রমথনাথের নাটক এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর অধিকাংশ নাটক প্রকাশের পূর্বে কোন পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয় নি। প্রকাশের পর সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক অনেকগুলি এবং পেশাদারী মঞ্চে দু'একটি অভিনীত হতে দেখা গেছে। কিন্তু তাঁর নাটকে সাহিত্যিক গুণ বেশী থাকায় সেগুলির পাঠকসংখ্যা দর্শক সংখ্যাকেও অতিক্রম করে যায়। প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব বসু প্রমথনাথ ও বনফুলের নাট্যকৃতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য - "It is notable, however, that both have a definite flare for the drama;

Banaphul's two biographical plays and Pramathanath Bisi's satires being among the most readable plays written after Rabindranath Unlike many of our stage-plays they are both readable and actable."^{১১৫}

যদিও প্রমথনাথের নাটকগুলি আক্ষরিক অর্থে প্রহসন নয়, কিন্তু প্রহসনের অনেক বৈশিষ্ট্য ঐগুলির মধ্যে আছে। বাংলা প্রহসনের সূত্রপাত থেকেই দেখা যায় সমাজসংস্কার এর প্রধান উপাদানরূপে সক্রিয় ছিল। বাঙালীর নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ রামনারায়ণ তর্করত্ন। তবে মধুসূদনের হাতেই বাংলা ব্যঙ্গ রসের একটা বুদ্ধিদীপ্ত নির্মল মান তৈরী হয়ে যায়। পরবর্তীকালে শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু থেকে সীমিত সামর্থ্যযুক্ত নামী-অনামী লেখকের অধিকাংশ প্রহসনই রুচিহীনতায় ক্রিয়। এরপর মলিয়ারের প্রভাবে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন; গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অমৃতলাল বসুর কৌতুকনাট্য ঊনবিংশ শতকের সত্তারের ডালা ভরিয়ে তুলেছে। পরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের রসিকতা অতিশয় সংযত ও মার্জিত। চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতির রসিকতাকে ' Wit ' বলাই বোধহয় সম্ভব হবে। প্রমথনাথও তাঁর নিটোল নিখুঁত বাক্যগঠনে, ধারালো শব্দ নির্বাচনে এবং সরস গাঙ্গীর্যে সরাসরি পাঠকচিত্ত জয় করেছেন। এই সমস্ত কারণেই তাঁর নাটকগুলিকে যথার্থ প্রহসন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। ' অমৃতলালের ন্যায় প্রমথনাথবাবুর লেখাতে ব্যঙ্গের আধিক্য বেশী দেখা যায়। কিন্তু অমৃতলালের ন্যায় তাঁহার নাটক বিচ্ছিন্ন ও শিথিল ঘটনায়ুক্ত নহে। . . . তাঁহার নাটকগুলিতে হাস্যকৌতুকের সুপ্রচুর উপাদান থাকিলেও উহাদিগকে ঠিক প্রহসন বলা চলে না। প্রহসনের ন্যায় ঐগুলি সংক্ষিপ্ত ও উদ্ভট ঘটনা প্রধান, নিরবচ্ছিন্ন কৌতুকরসপ্রধান নহে। উহাদিগকে প্রহসন না বলিয়া কমেডি বলাই সম্ভব। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই বাধা বিপত্তি কণ্টকিত রোমান্সের স্নিগ্ধমধুর ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। . . . ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অনেক স্থলেই অতাবনীয় উদ্ভটত্ব আনিয়া লেখক কৌতুকরস উদ্বেক করিয়াছেন। . . . মলিয়ারের রীতি অবলম্বন করিয়া বিশী মহাশয় চরিত্র ও সংলাপের যুগ্মতা ও পৌনঃপুনিকতা দেখাইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রমথবাবু ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক, কিন্তু তাহার ব্যঙ্গে পক্ষপাতিত্ব নাই এবং ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শোধন ও শাস্তির কোন অহেতুক সদিচ্ছাও তাঁহার নাই। অমৃতলালের নিজস্ব সত্তা যেমন তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের মধ্যে অত্যন্ত উগ্রভাবে ধরা পড়িয়াছে প্রমথবাবু তেমনিভাবে নিজেকে কখনও জোর করিয়া জাহির করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রতিভা পান্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্য সমৃদ্ধ, সেজন্য তাঁহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণধার তরবারির মত চোখ ঝলসান দীপ্তি বিকিরণ করিয়াছে। তাঁহার রসিকতার মধ্যে এমন একটি সুসংস্কৃত ও সুমার্জিতভাব

আছে যে, তাহাতে আহত হইলেও না হাসিয়া পারা যায় না' । ১১৬

শ'এর মত তিনিও চাইতেন নাটকের সঙ্গে সর্বপ্রকারে পাঠক ও শ্রোতাদের বিজড়িত করতে । এই কারণেই প্লটের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ না করে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, কঠোর বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ প্লেষের সাহায্যে পাঠক ও শ্রোতাকে সর্বদা সচেতন ও সক্রিয় করে রাখতেন, তাদের সতর্ক, সজাগ ও মনোযোগী করে তুলতে যত্নবান হতেন । এর জন্য তিনি তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন । বিতর্কিত বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন । কিন্তু তার তর্কাতর্কি বুদ্ধিদীপ্ত, শানিত ও সর্বদাই নাটকীয় ; তা ঝিমঝিম নয়, উত্তেজক । এই কারণে কারও কাছে তিনি মৌলিক চিন্তাবিদ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নাট্যকার আবার কারও কাছে তিনি সামান্য ভাঁড় মাত্র - সরস করে সাধারণ ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে ওস্তাদ ।

তবে নাটকের ক্ষেত্রে তিনি কোথাও গভীর তত্ত্বপ্রচারক বা দার্শনিক নন, বা আবেগের স্রোতে ভাসমান নন । তিনি যথার্থ হাস্যরসিক ও সামাজিক চরিত্র-চিত্রের লিপিকার । তাঁর নাটকগুলি সমসাময়িক সমাজচিত্রের বিশ্বস্ত প্রতিফলন এবং চরিত্রগুলিও একান্ত বাস্তব — ফলে হৃদয়নন্দন । সংলাপ গুলি সর্বত্রই কৌতুক ও ব্যঙ্গের হৃদয়গ্রাহী জরিতে মোড়া । সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে আমরা প্র. না. বি.-কে ব্যঙ্গনাট্য রচয়িতা হিসাবেই দেখি কিন্তু তার প্লেষ ও ব্যঙ্গের মধ্যে যে অন্তর্জালা — অন্তদৃষ্টির অভাবে আমরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না । ব্যঙ্গরস পরিবেশনে তিনি অদ্বিতীয় । কিন্তু এই ব্যঙ্গরস সস্তাধরণের কৌতুক বা কমিক পর্যায়ভুক্ত নয় । ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে নাট্যকারের দৃষ্টদৃষ্টির অপরিসীম বেদনা অব্যবহৃত হয়েছে । নাট্যকার তাই এখানে সংবেদনশীল ও সমাজচেতন শিল্পী । পারমিট, পরিহাস বিজয়িতম প্রভৃতি নাটক স্মরণীয় ।

সংলাপ হচ্ছে প্র. না. বি.-র নাটকের প্রাণ । নাট্যকার ছাড়াও তিনি সার্থক কথা শিল্পী ও বিশিষ্ট কবি । সরস, বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল, কৌতুকদীপ্ত, স্বার্থবোধক শব্দ ও সংলাপ ব্যবহারে তিনি বিশেষ পটু — যেমন মজলিশে, সভা সমিতিতে আড্ডায়, তেমনি নাটকে । তাঁর সংলাপের এই ঔজ্জ্বল্য তাঁর নাটকের বিশেষ মূল্যবান সম্পদ । তাঁর নাটকের বক্তব্যবিশেষকে পাঠক ও শ্রোতার কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে সংলাপকে তিনি করে তুলেছেন কৌতুকরসসিক্ত । কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীর আকর্ষণ বা নাটকীয় গতির তীব্রতা হয়তো অনুপস্থিত । কিন্তু সংলাপের শোভাযাত্রা সৌন্দর্যে মহীয়ান । তাই তাঁর নাট্যাবলী একদিক থেকে নাটকীয়তাপূর্ণ সংলাপ বিশেষ । তাঁর মতে যা মঞ্চের দিকে কয়েকঘণ্টা দর্শকদের ঔৎসুক্য ধরে রাখতে পারে — তাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তাই নাটক। একদিকে যুক্তি তর্ক, অন্যদিকে হাস্যকৌতুক — এই দুয়ের হরগৌরী মিলন ঘটেছে তাঁর নাটকে।

আবার আঙ্গিকের নূতনত্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বার্নার্ড শ যেমন তাঁর 'Caesar and Cleopatra' - নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনীকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এক ধরনের নূতন ঐতিহাসিক নাটকসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, প্র. না. বি. ও তেমনি 'মৌচাকে ঢিল' নাটকে আধুনিক যুগ ও অষ্টম শতাব্দীর বাংলাদেশের গোপাল দেবের কাহিনী ও কালকে জোড়কলমে বেঁধে নবতর রূপে ও রসে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বাংলা নাট্যক্ষেত্রে নূতন দ্বারোদ্ঘাটন করে তার দিগন্তকে তিনি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

'পরিহাস বিজলিতম' নাটকটির রীতি প্রকরণেও অভিনবত্ব আছে। নাটকের পাত্র পাত্রীর সংলাপের ভিতর দিয়েই নাটকের মৌল বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন "প্রণয়ী - এক অঙ্কের নাটক, দৃশ্যটি সম্পাদকের বৈঠকখানা, পাত্রপাত্রী এতে সবশুদ্ধ সাতজন। সম্পাদক, অধ্যাপক, রাজনীতিক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, সিনেমা ডিরেক্টর আর আধুনিক নারী, আর নাটকের নাম তো আগেই বলেছি - মোটেই নাটক নয়। 'ক্রিটিক' পাত্রদের কারও নিজের নাম নেই?"

'প্রণয়ী - হয়তো আছে। কিন্তু নাট্য ব্যাপারে তারা বিশিষ্ট ব্যক্তি নয় - এক একটি টাইপ মাত্র। নাট্যকার একে টাইপ ড্রামা বলেছেন।'

অন্যত্র এবিষয়ে আরও আলোকপাত করা হয়েছে।

'প্রণয়ী - এ নাটকে প্রেক্ষাগৃহ বলে কিছু নেই।

মেয়র - তবে দেখব কোথায় বসে?

প্রণয়ী - উইংস এর আড়ালে বসে।

মেয়র - সে আবার কি?

প্রণয়ী - আগেই তো বলেছি - এ হচ্ছে বিবম রিয়ালিস্টিক নাটক। অভিনেতারা দর্শক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলে নাটকের রিয়ালিজম নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, জীবনে যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে নিষ্ক্রিয় দর্শক বলে, কেউ থাকে না।

ক্রিটিক - এ বার্নার্ড শ-র নকল ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়র - আর কোন্ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে?

প্রণয়ী - যতদূর সম্ভব নিস্তব্ধ থাকবেন, হাসি বা হাততালি দিয়ে অভিনেতাদের সচেতন করে দেবেন না - তা হলেই হবে।'

নাটকটির শেষাংশে একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। এটি একাধারে নাট্যকারের কবিকল্পনা ও মৌল জীবনদর্শনের বাণীমূর্তি। নাট্যকার জীবনবাদী বলেই

মরণকে তুচ্ছ করতে পারেন না — দুটিকেই সমরেখায় দাঁড় করিয়েছেন ।

'মিনির প্রণয়ী - লালফুল সখী জীবন আমার,
শাদাফুল সখী মরণ মোর,
জীবনমরণ যুগল করিয়া
রাখিলাম এই চরণে তোর ।'

প্রমথনাথ বিশীর অধিকাংশ নাটকে একটি বিশেষ ছাঁদ অবলম্বিত হতে দেখা যায় । যেমন - ঋণকৃত্য ঘৃতাং পিবেৎ, মৌচাকে ঢিল, পারমিট, পরিহাস বিজল্পিতম প্রভৃতি নাটকগুলিকে রঙ্গ, ব্যঙ্গ বা বিষাদের আভাস থাকলেও শেষ পর্যন্ত সবকটি নাটকেই নায়ক-নায়িকার মিলনান্ত পরিণতি অঙ্কিত হয়েছে । অধিকাংশ নাটকেই একপক্ষে দুই বন্ধু এবং প্রতিপক্ষে কোন অথলিপ্সু, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিবেকহীন পুরুষ । যেমন- 'ঋণ কৃত্য' নাটকে একদিকে সনৎকুমার ও তার বন্ধু ললিতকুমার এবং প্রতিপক্ষে উকিল হর্ষনাথ । সনৎকুমার ও মঞ্জরী পরস্পরকে ভালবাসে । কিন্তু হর্ষনাথ সনৎকুমারের স্থান গ্রহণে ইচ্ছুক । 'ঘৃতাং পিবেৎ' নাটকে একদিকে ত্রিদিবনারায়ণ ও তার আত্মীয় বন্ধু বিজয়নারায়ণ এবং প্রতিপক্ষে কমরেড । ত্রিদিবনারায়ণ ও প্রমীরা জুটির মাঝখানে দুইগুহের মতো আবির্ভাব ঘটেছে কমরেডের ।

'মৌচাকে ঢিল' নাটকে কল্যাণ ও তার বন্ধু শ্রীমন্ত একদিকে, অন্যপক্ষে মণিময় । মাঝখানে আছে নায়িকা সুভদ্রা । শেষ পর্যন্ত কল্যাণ—সুভদ্রার মিলন ঘটেছে । 'পরিহাস বিজল্পিতম' নাটকটিতে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটলেও মাঝখানে কোন প্রতিপক্ষ নেই ।

'পারমিট' নাটকে অরুণ ও সুপ্রকাশ দুই বন্ধু । হিমানীকে লাভ করার জন্য তাদের অর্থ উপার্জনের সাধনা চিত্রিত হলেও তারা একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে নি । বরং সেই বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দিগ্বিজয় চৌধুরী । তিনজনেরই লক্ষ্য ছিল হিমানীকে জয় করা । কিন্তু হিমানীর টান ছিল অরুণের প্রতি । শেষ পর্যন্ত অরুণ-হিমানীর মিলন সংঘটিত হয়েছে ।

এছাড়া প্রায় প্রতিটি নাটকেই একাধিক প্রেমিক-প্রেমিকা জুটির সাহায্যে সমান্তরাল উপকাহিনী চিত্রিত হয়েছে । যেমন- 'ঋণ কৃত্য' নাটকে সনৎ-মঞ্জরীর পাশাপাশি আছে ললিত-মণিকাজুটি ও ভৃত্যদের মধ্যে ভজুয়াপুটি জুটি । সবকটি ক্ষেত্রেই পরিণতি মিলনান্ত ।

পারমিট নাটকে অরুণ-হিমানী জুটির প্রেমের কাহিনীর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সুপ্রকাশ-নবীনা জুটি এবং ভৃত্য লক্ষণ ও পরিচারিকা মিনু জুটি । সবকটি প্রেমই মিলনান্ত পরিণতি লাভ করেছে ।

কতকগুলি নাটকে ছদ্মবেশ ধারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পরে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাট্যিক কৌতূহল ও চমক সৃষ্টির কৌশল সার্থকতা লাভ করেছে। 'ঋণং কৃত্বা' নাটকে সনৎকুমার একসময় ছদ্মবেশী শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে পাত্রপাত্রীদের সকলকেই বোকা বানিয়েছে এবং কৌশলে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে চন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়ে পুনর্বার সাজিয়ে নাটকের চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে ত্রিদিবনারায়ণ আসলে মোটর ড্রাইভার। কিন্তু সে মহারাজার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে ধনী জমিদার কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করার জন্য। অবশ্য এখানে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষই ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া এই নাটকে নীরজা আসলে ছদ্মবেশী নৃপনাথ এবং মালবিকা ছদ্মবেশী মন্দকিনী - তারা ভূতপূর্ব স্বামী স্ত্রী, বর্তমানে প্রেমিক - প্রেমিকা। 'পারমিট' নাটকে অরুণ তাঁর প্রণয়িনী হিমানীকে দিগ্বিজয় চৌধুরীর সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহ থেকে রক্ষা করার জন্য ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।

অধিকাংশ নাটকেই নায়ক নায়িকার পিতার উইল বা কোন শর্ত নাটকের মধ্যে সমস্যার জটিলতা, গতিবেগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। 'ঋণং কৃত্বা' নাটকে সনৎকুমারের পিতা মঞ্জুরীর পিতার কাছে ৫০ হাজার টাকা ঋণী ছিল। মঞ্জুরীর পিতা উইল করে মঞ্জুরীকেই সে টাকার উত্তরাধিকারিণী করে যায়। ফলে পিতার মৃত্যুর পরে সনৎকুমারের স্বন্ধে সেই বিশাল ঋণের বোঝা চাপে। সে ঋণমুক্ত হওয়ার জন্যই কৌশল করে মঞ্জুরীর প্রাণিগ্রহণ করে। 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে ছদ্মবেশী নৃপনাথ মালবিকার প্রেমে পড়লেও তাকে বিয়ে করতে পারছিল না। কারণ সে ধনী হলেও তার বাবা দানপত্রে লিখে গেছেন যে সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করলে সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। 'মৌচাকে ঢিল' নাটকেও সুভদ্রার বাবা উইল করে গেছেন যে একুশ বছর উত্তীর্ণ হলেও যদি সে অবিবাহিতা থাকে তবে সে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় এবং নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। 'পারমিট' নাটকেও হিমানীর পাণিপ্রার্থী দুইবন্ধুকে হিমানীর বাবা সর্ত দিয়েছিল যে একবছরের মধ্যে যে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করতে পারবে সেই তার মেয়েকে পাবে। তারই পরিণামে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সুপ্রকাশ অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হিমানীকে পায় না। এছাড়া প্রায় প্রতিটি নাটকেই ডাক্তার চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ আছে। মোটামুটি একই ছাঁচের হলেও প্রতিটি নাটকের স্বাদবৈচিত্র্য স্বতন্ত্র। প্রকরণ ও রসপরিণতি একরূপ হলেও সংলাপের ঔজ্জ্বল্য ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের সজীব স্পর্শ নাটকগুলিকে যুগপৎ অভিনয়-যোগ্য ও পাঠ্য করে তুলেছে।

প্রমথনাথের আগে বাংলা নাটকে অভিনেতা ছিলেন মুখ্য এবং নাট্যকার ছিলেন

গৌণ। তিনিই প্রথম নাট্যকারকে অভিনেতার চেয়ে শ্রেয়তর ও মহত্তর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়া বুদ্ধিদীপ্ত এক নূতন শ্রেণীর রুচিশীল পাঠক ও শ্রোতার সৃষ্টি করে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রসচেতনার ধারাকে স্বচ্ছতর এবং গভীরতর করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে তিনি সর্বসাধারণের জন্য নাটক রচনা করেন নি। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত ও রুচিশীল মানুষের মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির এবং তাদের চিন্তা চেতনাকে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর নাটক রচিত হয়েছে। এই কারণে কোন ভাঁড়ামি বা আদিরসাত্মক সস্তা আবেগ জাগানো প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলার গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করে বাংলা নাটক ও নাট্যমোদী মানুষের শক্তি ও সুরুচি বৃদ্ধি করেছেন তিনি। এখানেই প্র. না. বি.-র সঙ্গে বার্নার্ড শ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির আত্মীয়তা এবং এখানেই বাংলা নাটক প্রমথনাথ বিশীর কাছে ঋণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশী

বহুবিভক্ত বিচিত্র প্রমথ-প্রতিভার একটি বড় পরিচয় তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা। বাংলা উপন্যাসের জগতে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি মোট ১৮ খানি উপন্যাসের জনক। এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন - [১] প্রবন্ধোপন্যাস - দেশের শত্রু [২] রোমান্টিক উপন্যাস - পদ্মা, কোপবতী, নীলমণির স্বর্গ, হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স [৩] পারিবারিক ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস - জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, চলনবিল, ধুলোউড়ির কুঠি, অশ্বখের অভিশাপ [৪] ঐতিহাসিক উপন্যাস - সিদ্ধুদের প্রহরী, কেরী সাহেবের মুনসী, লালকেল্লা, বিপুল সুদূর তুমি যে [৫] ব্যঙ্গ উপন্যাস - মহামতি রাম ফাঁসুড়ে [৬] রহস্যোপন্যাস-শাহী শিরোপা [৭] পৌরাণিক উপন্যাস - পূর্ণাবতার [৮] রাজনৈতিক উপন্যাস - বঙ্গভঙ্গ পনেরোই আগষ্ট। প্রতিটি উপন্যাসের স্বতন্ত্র পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রবন্ধোপন্যাস :

দেশের শত্রু :— ১৯২৫ সালে [চৈত্র, ১৩৩১] প্রকাশিত হয়। লেখক তখন শান্তিনিকেতনে বাস করেন। অখ্যাত যুবক প্রমথনাথকে নিজ ব্যয়ে এই গ্রন্থটি ছাপাতে হয়েছিল। প্রকাশন সংস্থা হিসাবে বাণী মন্দির ও প্রকাশস্থান হিসাবে ঢাকার উল্লেখ আছে। লেখক একে প্রবন্ধোপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন।

উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন - ' যাহারা যে কোন দেশে, যে কোন সময়ে, যে কোন উপায়ে মানুষের দেহ ও মনকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদিগকে আজ এই উপলক্ষে স্মরণ করিলাম '।

এতেই বোঝা যায় যে লেখকের মনে তখন কোন একটি বিশেষ আদর্শবাদ সক্রিয় ছিল। মুক্ত, স্বাধীন মানবতার পূজারী ছিলেন তিনি।

ভূমিকা অংশে লেখক জানিয়েছেন - ' এই ছোট রচনাটিকে সহৃদয় পাঠকগণ প্রবন্ধও বলিতে পারেন, উপন্যাসও বলিতে পারেন। ইহা দুই-ই, ইহা প্রবন্ধোপন্যাস। প্রবন্ধের পায়ের সহিত উপন্যাসের পাখা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। . . . প্রবন্ধের চিন্তাশক্তির ও উপন্যাসের কল্পনা শক্তির ইহাতে প্রভাব থাকিলেও ইহা উভয় লোকেই বিচরণ করিয়াছে অর্থাৎ ইহা উভচর।

. ঔপন্যাসিক প্রমথনাথের প্রস্তুতিপর্বের রচনা এটি। সেই কারণে এর মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। ভাব ও ভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও রচনামূল্যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম

পদক্ষেপের দুর্বলতা পরিস্ফুট। এই কারণেই পরবর্তীকালে গ্রন্থটিকে তিনি স্বীয় উপন্যাস তালিকা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন - 'পদ্মা আমার প্রথম উপন্যাস লিখবার চেষ্টা। তার আগে একখানা উপন্যাস লিখেছিলাম সত্য, পাঠক সেকথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। আমি ভুলতে পারলে বাঁচি। পদ্মা থেকেই আমার উপন্যাস রচনা-প্রচেষ্টার সূত্রপাত বলে ধরতে হবে'।^{১১৭}

১৯২২ খৃঃ পরাধীন ভারতের অসহযোগ আন্দোলন এবং মেকী স্বাদেশিকতা ও স্বদেশী কবিদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন তিনি। ফলে তৎকালীন দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ যুবকদের কাছ প্রমথনাথ বিশেষ অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। এমনকি বিপ্লবী যুবকদের ক্ষতম তালিকাতেও তাঁর নাম উঠেছিল। অনেকে তাঁকেই দেশের শত্রু আখ্যা দিতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তৎকালীন রাজশাহী কলেজের ছাত্র লিখেছেন - 'দেশের শত্রু পড়ে আমি খুব মর্মান্বিত হলাম, কারণ তাতে ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও তাতে অংশগ্রহণকারী তথাকথিত স্বদেশ প্রেমিক এবং স্বদেশী কবিদের সম্পর্কে কিছু ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ছিল'।^{১১৮} লেখক নিজেও তাঁর বইখানি প্রচারের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ১৩৩১ সালের মাঘ সংখ্যায় নিজের সম্পাদনায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রচার করেন - 'ইহাতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা আছে, নন-কো স্বরাজ আন্দোলনের তাৎপর্য কি এবং দেশের প্রকৃত শত্রু কাহারা - লেখক এই উপন্যাসখানিতে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।'

এই গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা তৎকালে লিখেছিল - 'লেখক উপন্যাস লিখবার ছলে বর্তমান একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলের বিবিধ কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা সকল স্থানে সমীচীন না হইলেও উপাদেয় হইয়াছে। . . . লেখক পরিহাস রসিক। রসিকতার মধ্যে কোথাও ভাঁড়ামো নেই . . . লেখকের সত্য প্রকাশ করিবার সংসাহস প্রশংসা করিবার যোগ্য'।^{১১৯}

উপন্যাসটি বক্তব্যপ্রধান, বিশ্লেষণধর্মী ও ব্যঙ্গাত্মক, ফলে কিছুটা নীরস। এই কারণেই বোধ হয় লেখক নিজে একে প্রবন্ধোপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন।

রোমান্টিক উপন্যাস :

পদ্মা :— প্রকাশকাল - ১লা শ্রাবণ, ১৩৪২ [১৯৩৫]। এই রোমান্টিক উপন্যাসটি রচনার পূর্বে লেখক কয়েক বছর [১৯২৮-২৯] রাজশাহী কলেজে বি.এ. ক্রাশে পড়াশুনা উপলক্ষ্যে এবং ১৯২৯ এ বিবাহসূত্রে স্বশুর বাড়ী থাকা উপলক্ষ্যে রাজশাহীর পার্শ্ববর্তী পদ্মানদীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন অনুভূতিশীল প্রমথনাথের কবি-মানসের

১১৭। মুক্তবেণী - [১৩৭৮] ভূমিকা, পৃঃ ১।

১১৮। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩, পৃঃ-১২৯৩।

১১৯। প্রবাসী, ভাদ্র [১৩৩২], পৃঃ ৭১৭।

প্রেরণায় পদ্মার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং পার্শ্ববর্তী চরের সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা উপন্যাসে বাণীরূপ লাভ করে। লেখকের নিজের কথায় - 'এই বইয়ের নায়ক বা নায়িকা পদ্মা, গৌণভাবে সঙ্গে রইল চরের বাসিন্দারা। শেষ পর্যন্ত বইখানা সম্পূর্ণ হলে দেখা গেল এ যথার্থীতি উপন্যাস হয়নি। উপন্যাসে কাব্যে মিলে একটা বস্তু হয়েছে যার মধ্যে কাব্যেরই মুখ্যতা'।^{১২০}

আবাল্য শান্তিনিকেতনে লালিত প্রমথনাথের মনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি ছিল স্বাভাবিক আকর্ষণ। অপরদিকে সেই কারণেই মানুষের সংসার যাত্রা ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত। ফলে এই উপন্যাসে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার ঘাটতি ও কবিপ্রাণতার প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য গোচর হয়।

মুখ্যতঃ কবি প্রমথনাথের মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয় এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রকট হয়ে আছে। পদ্মা নদীকে প্রমথনাথ গভীর মনোনিবেশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে দেখেছেন এবং বিভিন্ন স্বত্বতে তার বিচিত্র পরিবর্তনের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন পদ্মা বিষয়ক বিভিন্ন কবিতায়। এই উপন্যাসেও পদ্মার প্রতি লেখকের গভীর অনুরাগের পরিচয় দেদীপ্যমান। এই প্রকৃতি-প্রাধান্যের অন্তরালে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি হয়ে পড়েছে নীরস্ত ও নিঃজীব। সমালোচকের ভাষায়- 'কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির ও কবির চিন্তাশীল মস্তব্যের সংমিশ্রণে ও ভাষা প্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতায় তিনি যে বিচিত্র, কারুণ্যার্থচিত রাজপরিচ্ছদ বয়ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব-দরিদ্র নর-নারীর অঙ্গে তাহা মোটেই শোভন হয় নাই'।^{১২১}

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই অভিযোগ করেছিলেন এই উপন্যাস সম্পর্কে। অবশ্য তাতে প্রশংসাও ছিল। প্রমথনাথ যে পদ্মাকে অত খুঁটিয়ে দেখেছেন তার জন্য কবিগুরু সবিষ্ময় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আবার আখ্যান-বয়ন ও চরিত্র-চিত্রণ যে কবিত্বের ছায়ায় ম্লান হয়ে গেছে সে ব্যাপারেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন - 'তোমার বইটির যে অংশে পদ্মা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিয়েছে সে অংশটি আমার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়ে আলোড়িত হয়েছে পদ্মার আশ্রয় থেকে আমার নির্বাসন দুঃখ। বুঝতে পারলুম যেদিকে তোমার কবির কলম চলেছে সেদিকে রূপের প্রকাশ অপরূপ, কিন্তু উপন্যাসিক এসে যেখানে কলমটা জ্বরদখল করেছে সেখানে অত্যাচার হয়েছে। দুঃখ পেলুম যেহেতু আনন্দ পেয়েছিলুম'।^{১২২}

১২০। মুক্তবেণী, ভূমিকা [১৩৭৮], পৃঃ - ১।

১২১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৪৩।

১২২। শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ - প্রমথনাথ বিশীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি (৯ই নভেম্বর, ১৯৩৫)

ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনী-সংরচন ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্ট
বিসর্জন দিয়ে কবিত্বময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেগুলি কবিত্বের
পরাকাষ্ঠা, সৌন্দর্যশতদলের সুবাসিত পাপড়ি রূপে পাঠকের সৌন্দর্য পিপাসা নিবৃত্ত
করে, কিন্তু উপন্যাসে পাঠকের মন ভরে না। যেমন - রহস্যময়ী পদ্মার এক অপূর্ব
বর্ণনা পাই এখানে - ' মেঘে স্নান, শরতে স্বচ্ছ, শীতে শান্ত এই পদ্মা। কুলে শস্য, জলে
নৌকা, স্থলে লোকালয় এই পদ্মা। বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে সমাকুল, বৈশাখের মেঘ
পতাকার গুড় সংকেতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ, উভয় তীরের ঝাউঝাড় গ্রাসী,
ঘনায়মানা, কলগর্জিতা, স্নেহশীল জননীর কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নতনয়না,
কখনও বা নৃত্যশীলা নটিনীর ন্যায় দ্রুত চরণ চাঞ্চল্যে কল হাস্যময়ী, কখনও বা
শবরদুহিতা, শ্যামা শবরীর মত উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ধনুনিবদ্ধপাণি যুগ্মতীর-তুনীরা,
শ্রান্ত-অঞ্চলা, শরৎ শেষের ক্ষীণ শশীকলাটির প্রায় কখনও দিক্শয়া প্রাপ্ত লগ্না।
বর্ণবৈচিত্র্যহীন বাংলার সমুদয় প্রান্তরতলশায়িনী, একাকারা, বিরাট, বিশাল, উদার
পদ্মা, জগতে সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে দীর্ঘ, সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে একটানা
একখানি আদিঅন্তহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা! বাংলার প্রাণপ্রতীক এই বিশাল
নাগিনী'। ১২৩

এই উপন্যাসের নায়িকা-পদ্মার এই বিচিত্র কুশলী বিশ্লেষণী রূপবর্ণনা নিঃসন্দেহে
চিত্তাকর্ষক, লেখকের গভীর কবিত্বপূর্ণ প্রতিভার পরিচয়বাহী। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে
মানুষের একাত্মতার ছবিটি তেমন নিগূঢ় ভাবে অঙ্কিত করার সামর্থ্য লেখকের ছিল
না। লেখক নিজেও তাঁর এই সীমিত সামর্থ্যের কথা ভূমিকায় অকপটে স্বীকার
করেছেন - ' মানুষের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই আমার অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ ছিল, তার বদলে
প্রকৃতির উপর একটা আকর্ষণ জন্মে ছিল মনে। অভিজ্ঞতার এহেন মূলধন নিয়ে
উপন্যাস লিখতে গেলে যা দাঁড়ায় তাই পদ্মা গ্রন্থ'। ১২৪

বৃহত্তর অর্থে পদ্মা এই গ্রন্থের এই নিয়ন্ত্রী শক্তি হলেও মানবচরিত্রের মধ্যে নায়ক
বিনয়, নায়িকা কঙ্কণ ও প্রতিনায়িকা পারুল। সমগ্র গল্পটিকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা
হয়েছে। প্রথম অংশে আছে রাজশাহী শহরের কাছেই বিচিত্র পদ্মার বুকে গড়ে ওঠা
চরচিলমারীর একটি কৃষক পরিবারের মেয়ে কঙ্কণের সঙ্গে কলেজপড়ুয়া, শহরবাসী
বিনয়ের পরিচয় ও প্রেমের মধুর আলোচনা। এই অংশের নাম ' চরচিলমারী '।

দ্বিতীয়াংশের নাম ' কলিকাতা '। এই অংশে বিনয় কলেজে পড়ার উদ্দেশ্যে
কলিকাতায় এসে অধ্যাপক-কন্যা পারুলের প্রতি প্রণয়সক্ত হয়ে পড়ে এবং পারুলের
ছদ্ম প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত চিন্তে চর চিলমারীতে প্রত্যাবর্তন করে।

১২৩। পদ্মা [মুক্তবেণী] পৃঃ ৫৬।

১২৪। পদ্মা - [মুক্তবেণী] পৃঃ-১।

তৃতীয়াংশের নাম 'চরচিলমারী পুনর্বার'। এখানে প্রণয়ী-বিচ্ছিন্না সন্তানসন্তবা কঙ্কণের করুণমূর্তি, বিনয়ের চিঠির প্রত্যাশায় তার উদ্বেগ ব্যাকুলতা এবং পিতৃ বিয়োগের পর তার অসহায় অথচ প্রেমোচ্ছল মূর্তিখানি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই অবস্থায় মৃত্যুকামী হয়ে সে বসন্তরোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর পরিবর্তে শুধু রুগ্ন, কুশ, মলিন দেহলতা নিয়েই তাকে সঙ্কষ্ট হতে হয় - ক্রমেই দুঃখ কষ্ট বেড়ে চলে। তার পর এল সেই শুভ লগ্ন - বিনয়ের আবির্ভাব সংবাদে সে পুলকিত হলেও তার বিশীর্ণ দেহের কুশ্রীতা চিন্তা করে সে একান্ত আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীর সঙ্গেও সাক্ষাতে সম্মত হল না - বিনয়ের শত অনুরোধেও কোন ফল হল না - 'এ পারে বিনয়ের চোখে জল, ওপারে কঙ্কণের সর্বাঙ্গ অশ্রুসিক্ত, মাঝখানে অটল, অচল, অগলিত রুদ্ধদ্বার'।^{১২৫} দুটি মানবীর কাছে এইভাবে দুঃখ পেয়ে বিনয় প্রকৃতির কোলে সা স্তন্যের সন্ধানে যাত্রা করলো হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। সে লেখকের মতোই প্রকৃতি প্রেমিক। তাই বিশ্বাস করে প্রকৃতির প্রেমে দ্বন্দ্ব নাই, সে ফিরিয়া আঘাত করে না—তাহার মত এমন বিশ্বস্ত প্রণয়ী আর কে আছে?^{১২৬}

চতুর্থাংশে আছে হিমালয়ের উদার অঙ্গনে বিনয় ও পারুলের ঘটনাচক্রে মিলনের কথা। এই অংশে বিনয়ের বকলমে লেখকের কিছু দার্শনিক চিন্তা-চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে সঙ্গে আছে কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার। এখানে পারুল ও বিনয়ের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে; গৃহে ফিরে শুধু শুভ দৃষ্টির প্রতীক্ষা।

পঞ্চমাংশের নাম 'পদ্মগর্ভে'। কঙ্কণ এখন জীবিকার তাগিদে শোলার টোপর ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য তৈরী করে বিক্রি করে। মাতৃত্ব তাকে দৈবী দীপ্তি দান করেছে। প্রতিকূল দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে উপেক্ষা করে শুধু সন্তান-স্নেহ ও প্রেমের মধুর স্মৃতিকে অবলম্বন করে কঙ্কণ দেহ ধারণ করে আছে। পদ্মার ভাঙন শুরু হয়েছে। তার গর্ভে বহু জমি, গৃহ ও মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষার সলিল সমাধি ঘটেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে নাটকীয় ভাবে পারুলের সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের দিনে টোপরের সূত্র ধরে কঙ্কণ ও বিনয় মুখোমুখি হয়েছে - 'কঙ্কণ দেখিল বিনয়; বিনয় দেখিল কঙ্কণ! বিবাহের বেশে বিনয়, বিবাহের মুকুট হাতে কঙ্কণ, কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু'।^{১২৭} অতীত-স্মৃতি-তাজিত দুটি নরনারী অতঃপর চরম মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। অনুতপ্ত বিনয় কঙ্কণকে ফিরে পেতে চাইলেও দুঃখানলে দগ্ধ কঙ্কণ আর ধরা দিল না। শিশু পুত্রটিকে কৌশলে বিনয়ের হাতে সমর্পণ করে বজ্রিমচন্দ্রের

১২৫। তদেব, পৃঃ ১৪৮।

১২৬। তদেব, পৃঃ ১৫২।

১২৭। তদেব, পৃঃ ১৮১।

কপালকুন্ডলার মতো পদ্মাগর্ভে আত্মবিসর্জন করলো সে। 'বিসর্জনের প্রতিমারে মত নিশ্চল কঙ্কণ মূর্তি অগাধ জলের তলে উন্মত্ত শ্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গেল!'^{১২৮} কীর্তিনাশা পদ্মা প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে কোন দিকে জ্ঞাপন না করে নীরবে বয়ে চলল। এইভাবে ট্রাজেডির বেদনা বিধারে পরিসমাপ্তি ঘটেছে এই উপন্যাসের।

এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে কাহিনী ও চরিত্রের টানাপোড়েনের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেমিক প্রমথনাথের ত্রিষ্ঠা মূর্তিটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নায়ক বিনয়ের মনে প্রকৃতি যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে বিনয় যে লেখকেরই নিজস্ব সত্তা তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মোটকথা এই উপন্যাসটি পুরোপুরি কবির কলমে লিখিত। কবির হাত থেকে উপন্যাসিক কখনও কলম কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি। এই টানাপোড়েনে কবিরই হয়েছে জয়। পদ্মা তাই রোমান্টিক উপন্যাস বা কাব্যধর্মী উপন্যাসরূপেই বাংলা সাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পারুল চরিত্রের মধ্যে সঙ্গতির অভাব লক্ষ্য গোচর হয়। তার বাবা অবিনাশবাবু ও মা সর্বেশ্বরী সুচিত্রিত। কঙ্কণের বাবা তারগদাস ট্রাজিক চরিত্র রূপে অবিস্মরণীয়। তবে রূপেন, রমানাথ, পরমেশ প্রভৃতি পারুলের বন্ধুদের কথায় পরিপূর্ণ দ্বিতীয়াংশের ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি মূল কাহিনী বা চরিত্র চিত্রণের পক্ষে অপরিহার্য নয়। বাদল চরিত্রটি দরদ দিয়ে আঁকা। কোন কোন ক্ষেত্রে পারুল, কঙ্কণ ও বিনয়ের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা প্রশংসার্হ। বঙ্কিমী ঢঙে পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে বক্তব্য পরিবেশনের প্রচেষ্টা দেখা যায় [পৃঃ ১৩৯]। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক সংক্ষিপ্ত, সংহত ও অর্থঘন মন্তব্য আছে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এদের বাহ্য্য চোখে পড়ে। এককথায় উপন্যাসিক প্রমথনাথের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই উপন্যাসেই অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়।

কোপবতী [১৩৪৮, ভাদ্র] : — শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত বীরভূমের অন্যতম নদী কোপাই বা কোপবতী। প্রমথনাথ সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন এই নদীর সান্নিধ্যে আসেন। ছাত্রজীবনে তিনি কোপাই নদীর উৎস সন্ধানে বহির্গত হন এবং এই ভ্রমণকাহিনী বিষয়ে ১৩২৫ সালের চৈত্র সংখ্যা, 'প্রভাত' পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ রচনা লেখেন। সেই তথ্য ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। কোপবতী সম্পর্কে তিনি 'মুক্তবেণী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—'এ বইখানারও নায়ক বা নায়িকা নদী, পদ্মার বদলে এলো কোপাই। তখন অনেক কাল হল শান্তিনিকেতন ছেড়েছি, কিন্তু সেখানকার স্মৃতি আমাকে ছাড়ে নি। সেই সব স্মৃতির কথা কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোপবতী রচনা। এখানেও প্রকৃতি মুখ্য, তবে

যে কটি মানুষ আছে তাদের গায়ে রক্ত মাংস লেগেছে। আগে বলেছি প্রকৃতি এখানে মুখ্য, তবে প্রকৃতি বলতে বুঝতে হবে শুধু নদী নয়, সমস্ত বীরভূম জেলার বিশেষ চেহারাটি।'

বইটির ঔপন্যাসিক গুণাবলী বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এর কল্পনার ঐশ্বর্য, ভাষার ঔজ্জ্বল্য, ভাবের গভীরতা, প্রকৃতি-প্রীতির একনিষ্ঠতা, বিশ্লেষণকুশলতা প্রভৃতি অসাধারণ, অভূতপূর্ব। কবির অনুভূতি-গভীরতা ঔপন্যাসিকের বস্তুধর্মী নৈর্যাত্মিকতাকে গ্রাস করেছে। বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অনন্যসাধারণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা কারুকার্যখচিত গদ্য কবিতার সমতুল্য। ভাব ও ভাষার বাগর্থ-সম্পৃক্তি অতুলনীয়।

ঔপন্যাসিক নিজেই কোপাইকে এই গ্রন্থের নায়িকা বলেছেন - 'এই কাহিনীতে কোপাইকে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে এই কাহিনীর নায়িকা কিংবা নায়িকাদের মধ্যে অন্যতর।'।^{১২৯}

ফুল্লরা প্রতিনায়িকা - কোপবতী তার সপত্নী। মানুষ ও প্রকৃতি এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিনী। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির জয় হয়েছে। কোপবতী ফুল্লরার স্বামী বিমলকে চিত্তরে গ্রাস করেছে। কুপিতা কোপবতীর হিংস্র ও ঈর্ষাকুটিলরূপের পরিচয় এবং সে যে ফুল্লরার চরম সর্বনাশে উদ্যত তার ইঙ্গিত লেখক বহুভাবে দিয়েছেন। 'বিমল বলিল—আপনার জন্মতিথির স্মারকরূপে কিছু দেব ভেবে একটা জিনিস সংগ্রহ করেছিলাম। শক্তিত হবেন না, দাম কিছু নয়। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে ঈর্ষাবশে কোপাই সেটা আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিল আমাকে ডুবিয়ে মেরে। সেই জন্যই তো ওকে আমার শত্রু বলছিলাম'।^{১৩০} কিংবা—'নদী হইতে কখনো কারও ক্ষতি হয় নাই - ইহা কে বলিল? আর কিছু নাহোক ডুবাইয়া মারিবার ক্ষমতা তো নদী রাখে'।^{১৩১} কিংবা' ফুল্লরা হাসিয়া বলিল—ও যেন আমার সতীন। আমার মনে হয় কি জানো? এই নদীই তোমাকে আমার কাছ থেকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে'।^{১৩২}

উপন্যাসটি ২টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ২৩টি পরিচ্ছেদ। ২৩তম পরিচ্ছেদে কাহিনী ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। ফুল্লরার সঙ্গে বিমলের বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। ১ম খণ্ডে পূর্বরাগের পালা; ২য় খণ্ডের ১৭টি পরিচ্ছেদে বিবাহোত্তর জীবনে প্রেমের নদীতে ভাঁটার টানও চর্চিতচর্চণ, মান-অভিমানের পালা, ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগানোর বৃথা

১২৯।	কোপবতী	-	৩৭	পৃঃ
১৩০।	তদেব	-	৯৪	পৃঃ
১৩১।	তদেব	-	৯৯	পৃঃ
১৩২।	তদেব	-	১৫৪	পৃঃ

প্রয়াস এবং শেষ পর্যন্ত কোপাই এর হাতে বিমলের আকস্মিক মৃত্যু - করুণতম ট্রাজেডি হয়ে উঠেছে। লেখকের ধারণা—' বিবাহ না করিলে প্রেম কিছুকাল থাকিলেও থাকিতে পারে - কিন্তু শিকল দিয়া শিখাকে বাঁধা যায় ' ১১০০

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যেন রেষারেষি চলে। তাই ঔপন্যাসিক বলেন - 'মানুষকে ছাড়ো প্রকৃতিকে পাইবে। একসঙ্গে দুই সত্তাকে পাওয়া যায় না, কেহ কখনো পায় নাই '। ১০৪

ক্রমে বিমল ও ফুল্লরার প্রেমের প্রাচীরে ফাটল দেখা দিয়েছে। উভয়ের মনোরাজ্যে তীব্র আলোড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে। এই মনোবিশ্লেষণ-কুশলতা প্রশংসার্হ, কিন্তু বাস্তবের সমর্থন পুষ্ট হলে কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও টানাপোড়েন আরো অঙ্গঙ্গী হলে তা বাস্তবনিষ্ঠ ও স্বাভাবিক হতো। ফলে এখানে রোমান্সের আতিশয্য ও কবিকল্পনার প্রাধান্য প্রকট হয়েছে। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের, মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যে চিরবৈরিতাপূর্ণ তারই পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিবাহ না হলেই ফুল্লরা-বিমলের প্রেমে প্রাত্যহিকতার ধূলি মালিন্য জমতো না বা এভাবে দুজনের মাঝখানে বিচ্ছেদের ফাটল রেখা সৃষ্টি করতো না। অবশ্য অন্তিম মুহূর্তে ঘুমের ঘোরে বিমল যেভাবে পাড় ভেঙে কোপবতীর জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে তা অনেকখানি অবাস্তব ও অতিকল্পনার পরিচয়বাহী। ফলে উপন্যাসটির করুণ পরিণতি যতখানি মমবিদারক হয়ে উঠতে পারতো তা হয় নি। তবে মিতনের উন্মাদ অবস্থা এবং বিমলের জন্য আমৃত্যু প্রতীক্ষা বিশেষ হৃদয়দ্রাবী। মিতন চরিত্রটি সামান্য হলেও লেখকের সহানুভূতির রসে অত্যন্ত সুচিত্রিত ও বাস্তবসম্মত। সুরেশ পোদ্দার, হরিহর মুদি, হরি ডাক্তার প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণে লেখকের প্রতিভা ও সৃষ্টিকুশলতা অসাধারণ। অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত চরিত্রগুলি বাস্তবে ও কল্পনায় মিলে সার্থক ও শিল্পসম্মত মূর্তি লাভ করেছে। কিন্তু নায়ক-নায়িকা প্রভৃতি শিক্ষিত চরিত্রের মুখে ও মনে তত্ত্বভাবনা, প্রকৃতিপ্রেম, বিশ্লেষণী দৃষ্টি তথা লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটাতে সেগুলি ততখানি সজীব ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কল্পনা প্রিয় প্রমথনাথের কবি সত্তা তাদের ' Realistic ' না করে ' Romantic ' করে ফেলেছে। তবে তদুপরিচিতে প্রকৃতি বীক্ষণের অনন্যসাধারণত্বে এই চরিত্রগুলি সাধারণ ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য-বিচ্যুত হলেও ভাবানুভূতির গভীরতায় এক স্বতন্ত্র মহিমা ও মর্যাদা লাভ করেছে। এই কারণেই সমালোচক বলেন — ' বিমলের জীবনে নদীর প্রভাব যেন অনেকটা কবিসুলভ কল্পনাবিলাস, নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণ নহে। মানুষের

কামনাকুর আবর্তের মধ্যে উদাসীন প্রকৃতিকে জড়াইতে হইলে উভয়ের মধ্যে যে নিবিড় আত্মীয়তা ফুটাইতে হয় এখানে তাহা পরিস্ফুট হয় নাই'।^{১০০} তাই কোপবতীকে সার্থক উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাসের আকারে এটি একটি বিয়োগান্ত কাব্য, গল্পছলে অপূর্ব গদ্য কবিতা। এখানেই এর স্বাতন্ত্র্য।

প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর উপন্যাসে কালিদাস ও মল্লিনাথ, শ্রুতি ও ভাষ্যকার উভয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এ ভাষ্যও কবির কলমে অঙ্কিত। যেমন 'কোপবতী' উপন্যাসে ঝড় জলের একটি দুর্যোগময় মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার জৈব কামনা-সংক্ষোভ যেভাবে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে তার ব্যঞ্জনাগর্ভ ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত কাব্যিক বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বিরল - 'নদীর গর্ভে পাথরে প্রহত জলে আর ঝড়ে বিষম মাতামাতি কাণ্ড চলিতেছে। ঝড় স্রোতস্বিনীকে সবলে নিষ্পেষণ করিয়া যেন মারিয়া ফেলিতে চায়, নদী তাহাতে ভীত না হইয়া অধিকতর উল্লাসে ঝড়কে সবেগে আকর্ষণ করিয়া ধরিতেছে; ঝড়ের পরন্থ বাহু জলতলের স্বচ্ছ শাড়িখানাকে টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতেছে - নদী প্রাণপণে তাহা নিরস্ত করিতে উদ্যত . . . না ঝড়ের ক্ষান্তি, না নদীর ক্রান্তি।

অবশেষে ঝড় থামিল, নদী থামিল, মহাঝড় মৃদু বাতাসে পরিণত হইয়া নদীর প্রান্তে শুইয়া হাঁপাইতে লাগিল। নদী তরঙ্গ-দুকূল যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া শয্যাপ্রান্তে লীন হইয়া নিশ্বেজ পড়িয়া রহিল। ঝড় ক্ষান্ত; নদী ক্রান্ত, দুজনেরই সেহে অবসাদ, মুখে তৃপ্তি'।^{১০১} এখানে ঝড় বিমলের রূপক আর নদী ফুল্লরার রূপক।

নীলমণির স্বর্গ :— [১৯৫৪] ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একটি উপন্যাস। জাপানী বোমার ভয়ে একটি পরিবার কলকাতা ত্যাগ করে নিরাপদ বিবেচনা করে সুবর্ণরেখার উপকূলে নরসিংপুরে আস্তানা নেয়। পরিবারের কর্তা সারদাবাবু গৃহশিক্ষক হিসাবে সঙ্গে এনেছেন সঞ্জীব বাবুকে। এখানে এসে স্থানীয় একটি পরিবারের সঙ্গে তাদের হৃদয়তা গড়ে ওঠে। দুইবোন ছায়া ও কায়ার সঙ্গে সঞ্জীবের অবাধ মেলামেশা ক্রমে ছায়া ও সঞ্জীবের প্রেমে পরিণতি লাভ করে।

অন্যদিকে স্থানীয় একটি ভালুকওয়ালা 'মুরলী' ও ভালুক 'নীলমণি' ভালুকনাচের মাধ্যমে সঞ্জীব প্রভৃতির পরিচিত হয়ে ওঠে। 'নীলমণির বাপ' নামে পরিচিত অকৃতদার মুরলী বেশী বয়সে বিয়ে করে স্ত্রীর দাপটে কিভাবে তার সাধের ও স্নেহের পোষমানা ভালুক 'নীলমণি', কুকুর 'মুনসি' ও বেড়াল 'সুরকির' কাছ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হল কিভাবে তার স্বাধীন পেশা পরিত্যাগ করে কারখানায় কাজ

নিতে বাধ্য হ'ল, তারই বেদনাবিশুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এইভাবে দুটি পরিবারের দুটি ভিন্ন ধর্মী জীবনচিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। আর এই দুটি কাহিনীর মধ্যে সংযোগসূত্র রচনা করেছে মাষ্টারমশাই সঞ্জীববাবু।

এখানে পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় চরিত্র ও কাহিনী অধিকতর বাস্তবঘেঁষা। আবার এই উপন্যাসে প্রকৃতি বর্ণনা থাকলেও পূর্ববর্তী উপন্যাসে প্রকৃতি যেমন বিশেষ গুঢ়-গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এতে তা দেখা যায় না। তবে এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই জয় হয়েছে। মনুষ্য জগতের কৃত্রিম শৃঙ্খল ছিড়ে প্রকৃতির স্বাধীন, মুক্ত, অব্যাহত আনন্দধামে পাড়ি দিয়েছে নীলমণি নামক ভালুকটি। লেখক অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে পশু হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনার বাণীমূর্তি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ভালুক যেন শোষিত, শুষ্কলিত, দীন-দুঃখী-ব্রাত্যজনের প্রতিনিধি। লেখক তাই ভালুকের চিন্তার মধ্যে মানবধর্ম আরোপ করেছেন। তার স্বপ্ন-কল্পনাও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমগোষ্ঠীয়, তার স্মৃতিচারণাও মানবিক রস সম্পৃক্ত।

মুরলীর স্ত্রী 'ইন্দু' ও পরিচারিকা কিশোরী 'পাপড়ি' চরিত্রদুটি বাস্তবসম্মত ও সুচিত্রিত। মুরারী চরিত্রের পশুপ্রীতির গভীরতা ও বিচ্ছিন্নতাজনিত মর্মবেদনা, আপাত স্বাভাবিক ও সুখী মানুষটির অন্তর্লোকে প্রজ্জ্বলিত অনুতাপানল ও নিরুদ্ধ হাহাকার এবং শেষ পর্যন্ত 'নীলমণিরে' বলে হারিয়ে যাওয়া ভালুকের প্রতি মর্মভেদী আকুল আহ্বান বিশেষ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে ভালুক নীলমণির স্বজাতি ও স্বসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পরও কৃতজ্ঞচিত্তে পূর্ব মনিবের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে যাওয়ার চিত্রটি বিশেষ ব্যঞ্জনাবাহী। স্বর্গের স্বপ্নরাজ্য সকলেরই কাম্য। কিন্তু নিরঙ্কুশ সুখ কোথাও নেই।

এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও উপমাবহুল। কাব্যিক বর্ণনার গুণে ধারাগিরির সৌন্দর্য ও তার জলশ্রোতের কলধ্বনি যুগপৎ পাঠকের নয়ন ও শ্রবণ-রুচিকর।

হিন্দী উইদাউট টিয়াস :— [১৩৭৮]। ঐ বছর শারদীয়া যুগান্তরে এই মিলন মধুর প্রেম পরিপূর্ণ রোমান্টিক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। নাট্যকার, কবি ও উপন্যাসিক প্রমথনাথের সম্মিলন খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এই গ্রন্থে। সম্ভবতঃ এটি তার সবচেয়ে স্বল্পায়ত উপন্যাস। কাহিনীর পরিধি ও চরিত্রের সংলাপ বা জটিলতার বিচারে এটিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি বড়গল্প আখ্যা দেওয়াই ভাল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ; শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' বা রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' প্রভৃতি আকৃতির দিক থেকে এই ধরনের উপন্যাস। তবে প্রকৃতি বিচারে তাদের সঙ্গে অনেক পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয়। কাহিনী অকিঞ্চিৎকর, ঘটনা অপ্রচুর - কিন্তু ঘটনা বিন্যাস ও কাহিনী গ্রন্থনের দক্ষতা অসাধারণ। তবে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে।

এ. আই. সি. আই. কর্পোরেশন নামক একটি সওদাগরী অফিস তার উচ্চপদস্থ তিনজন অফিসারকে অফিস সংক্রান্ত প্রয়োজনে হিন্দী শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করে। এই তিনজনের মধ্যে তারক বোস একজন। শাওড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পত্নী পূর্বীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন মনোমালিন্য ছিল না। বিচ্ছেদের পর দেখা সাফাৎ না হলেও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছিল গভীর। পূর্বা অপূর্ব মিত্র ছদ্মনামে পুরুষের ছদ্মবেশে তারক বোসের হিন্দী শিক্ষক নিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় অফিসার নিত্যজ্যোতি সরকার অবিবাহিত যুবক। মৃত পিতার মৃত বন্ধুর কন্যা শমিতার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার জন্য নিত্যজ্যোতির মা ও বোন কমলা বিশেষ উৎসাহী। কিন্তু নিত্যজ্যোতির উৎসাহের বড় অভাব। শমিতা ভাল হিন্দী জানে। নিত্যজ্যোতির সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কিন্তু সে নিত্যজ্যোতিকে চেনে। তাই নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে এবং নিত্যজ্যোতিকে কিছুটা বিরত করতে মিতা নামে তার হিন্দী শিক্ষার ভার গ্রহণ করল। অপরদিকে তারই অনুরোধে ও বুদ্ধিকৌশলে শমিতার ভাই সমীর কে মীরা ছদ্মনামে ও মেয়েলি পোশাকে সজ্জিত করে তৃতীয় অফিসার রতনের শিক্ষিকা করে দেওয়া হোল। রতন আগে নিত্যজ্যোতির বোন কমলার প্রেমে পড়ে ও বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু হিন্দী শিক্ষা উপলক্ষে সে ক্রমশঃ শিক্ষিকার ছদ্মবেশ ধরতে না পেরে নারী বেশী সমীরের রূপের মোহে বিপর্যস্ত হয়। অন্যদিকে নিত্যজ্যোতিও শমিতার মধ্যে হিন্দী শিক্ষার সূত্র ধরে হৃদয় বিনিময় ও বিয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারক বোস তার স্ত্রীকে চিনতে না পারলেও হিন্দী শিক্ষার ছায়ায় স্ত্রীর প্রতি তার সহানুভূতি ও দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং স্ত্রীকে পুনর্বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়। শেষ পর্যন্ত শমিতা, পূর্বা ও সমীরের বুদ্ধি কৌশলে এবং ঘটনাচক্রে রবীন্দ্র সরোবরে এক জলসায় সকলের প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়ে। শমিতা যে নিত্যজ্যোতির পিতৃবন্ধুর কন্যা ও মাতৃকথিত পাত্রী তা প্রকাশ পায়। ফলে নিত্যজ্যোতির সঙ্গে শমিতার, রতনের সঙ্গে কমলার, পূর্বীর সঙ্গে তারক বোসের মিলনের বাধা অপসারিত হয়। এছাড়া ঐ অফিসের মালিক মিঃ দত্ত যিনি অফিসারদের হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও নিজে বিপত্নীক-তার সঙ্গে বিবাহ সম্ভাবনা গড়ে ওঠে হিন্দী শিক্ষিকা পদ প্রার্থিনী বিশাল বপু ও প্রবল তেজস্বিনী মিস অনঙ্গ মঞ্জরী সেনের। এই ভাবে কাহিনীটি একটি মিলন মধুর পরিণতি লাভ করে। গ্রন্থখানির সর্বত্র প্র. না. বি-র শ্মিত কৌতুকহাস্যের জ্যোতি লক্ষ্যগোচর হয়। 'এ সংসারে মেয়েরা সর্বদা হাফব্যাক খেলছে, সামনে পিছনে ঝুঁকি পোয়াচ্ছে, গোল দেবার সুযোগ কখনো পায় না'।^{১৩৭} কোথাও কোথাও অল্পমধুর বাঁকা হাসির উদ্ভাস দেখা যায়। 'ডুয়েল যুদ্ধ নেই তবে তার বদলি আছে। কুৎসা

রটিয়ে কাগজে চিঠি পাঠান, সাহিত্যিক ওণ্ডা ভাড়া করে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে বই লেখান। এ সব কি ডুয়েলের চেয়ে কম কার্যকরী'।^{১৩৮} তবে বঙ্কিমী ঢঙে প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখকের বক্তব্য পরিবেশন এই স্বচ্ছায়ত ও সংহত উপন্যাসে বেমানান ও শৈথিল্য সূচক হয়েছে। যেমন 'জানি না পাঠক পাঠকাগণ হলে, মেয়ে ও মা এই ত্রিভুজের সংলাপ থেকে ঘটনার কতটা কি বুঝতে পারলেন। সংসারে ত্রিভুজটা অতি বেয়াড়া বস্তু, ক্ষণে ক্ষণে খোঁচা মারতে থাকে। তাই এবারে ত্রিভুজের সঙ্গে লেখক মিলিত হয়ে চতুর্ভুজ সৃষ্টি করতে চলেছে'।^{১৩৯}

উপন্যাসটির বহু জায়গায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙক্তি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রোমান্টিক উপন্যাসে এগুলি সব বেমানান না হলেও উপন্যাসের সাবলীল গতি ব্যাহত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে ব্যবহৃত হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সুদীর্ঘ সমবেত সঙ্গীতও এই বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে।

অন্যান্য উপন্যাসে প্রমথনাথের যে গভীর জীবন দৃষ্টি ও জীবনাভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে এই লঘুচালের হালকা হাসির উপন্যাসটিতে, সেই গভীরতা বা হৃদয় বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। লেখক এখানে খুব আলতোভাবে জীবনের গায়ে টোকা মেরে কৌতুক কণা বিচ্ছুরিত করতে চেয়েছেন। এছাড়া প্রমথনাথের অধিকাংশ উপন্যাস ট্রাজেডি কিন্তু এটি তার বিপরীত--কমেডি।

পারিবারিক ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস : এই পর্যায়ের চারখানি উপন্যাসের মধ্যে প্রথমটির নাম 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' [১৯৩৮]। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার জোড়াদীঘি গ্রামের জমিদার চৌধুরী পরিবারের কীর্তি-কাহিনী, উত্থান-পতন ও বিচিত্র জীবনালেখ্য অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

তৎকালীন যুগের জমিদারতন্ত্রের এক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা এবং অন্য জমিদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের স্বাভাবিক চিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ফলে এখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পথটি রুদ্ধ। জমিদার ও সমাজপতিই তখন সমগ্র সমাজশক্তির ধারক ও বাহক ছিল। সেই প্রখর ব্যক্তিত্বের একক মহিমার ছত্রছায়ায় সাধারণ নরনারী স্তান হয়ে পড়ে। এখানে জমিদার উদয়নারায়ণ তেমনি আপন উযুজ স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের মহিমায় হিমালয়ের মতো অটল, অচল ও গাষ্টীয়পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর পৌত্র দর্পনারায়ণের ব্যক্তিত্বও কম নয়। যদিও সে উদয়নারায়ণের তুলনায় আরো পরবর্তীকালের মানুষ হিসাবে এবং জমিদারী হারিয়ে কিছুটা নিষ্প্রভ।

ঘটনা বিন্যাসের শৈথিল্য ও গ্রহকারের উদ্ভট খেয়াল প্রবণতা কাহিনী রসকে

দানা বাঁধতে দেয়নি। 'পলাশী' নামক অধ্যায়ে যে ১৬টি পরিচ্ছেদ আছে তার মধ্যে ৮টিতে আছে পলাশীর ভৌগোলিক পরিচয় ও পলাশী যুদ্ধের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যা কাহিনীর পক্ষে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস যদি উপন্যাসের শিরায় শিরায় রক্তসঞ্চারে সহায়তা না করে তবে তার নীরস বর্ণনা উপন্যাসে অবান্তর, একঘেয়ে ও ক্রান্তিকর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

উপনদী যেমন মূলনদীকে পরিপুষ্ট করে তেমনি মূল কাহিনীর প্রয়োজনেই উপকাহিনীর উপস্থাপনা ঘটে। মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করেই উপকাহিনী আবর্তিত হয়। কিন্তু এই উপন্যাসে সর্বত্র তা পরিলক্ষিত হয় না। 'চৌধুরী বাড়ী' নামক অধ্যায়ের নয়, দশ ও বারো সংখ্যক পরিচ্ছেদগুলি মূল কাহিনীর পক্ষে অত্যাৱশ্যক নয়। অষ্টম অনুচ্ছেদটি পোড়ো বাগানের বর্ণনা বাছলো পূর্ণ। 'জোড়াদীঘি বনাম রক্তদহ' অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে দুর্গাপূজার জন্য ভট্টাচার্য্য ও বাণীবিজয়ের ফর্দ প্রসূত প্রণালীর অনাবশ্যক দীর্ঘতা পীড়াদায়ক মনে হয়। বাণী বিজয় ও গোপনন্দিনীর অবৈধ প্রেমকাহিনী, ছিদাম বহুরূপী ও আশ্বরের অদ্ভুত প্রকৃতির অর্থহীন খেয়ালীপনা ও সাধারণের দুর্বোধ্য আচার আচরণ মূল কাহিনীর সাবলীল গতির পরিপন্থী। সম্ভবতঃ এই সব কারণেই এই গ্রন্থের কোন কোন বর্ণনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন - 'ইহা কি অতিকথন নহে?' 'অতিকথন আর কাহাকে বলে'।^{১৪০}

পরন্তপ একটি type চরিত্র। অনুরূপ লম্পট, হিংসা পরিপূর্ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নীতিহীন চরিত্র সব সমাজেই সুলভ। 'সে প্রাক আধুনিক বাংলা সমাজের - Stock villain'^{১৪১}।

ছিদাম বহুরূপী, বোবা আশ্বর, পুটি, বাণী বিজয়, বেঙা চৌকিদার, রমেশ ঢুলি প্রভৃতি চরিত্রগুলি অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত ও উদ্ভট রসের বাহন। এদের মাধ্যমে উদ্ভূত কৌতুকরস উপভোগ্য হলেও কাহিনীর সংহতি ও রসগাঢ়তার অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

মহাকাব্যিক পটভূমি, স্থান কালের বিশাল ব্যাপ্তি, কিংবদন্তী-আশ্রিত উত্তরবঙ্গে র ভৌগোলিক পটপরিবর্তন ও সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র রূপালেখ্য এই উপন্যাসের অসামান্য ও অমূল্য সম্পদ। এইগুলির মধ্যে প্রকৃতি প্রেমিক, জীবন রসপিপাসু, রোমান্সপ্রিয় ভাষা শিল্পী ও গভীর অনুভূতিপ্রবণ এক উঁচুদের কবির সন্ধান মেলে।

উদয়নারায়ণ চরিত্রের উদাস্ত-গভীর মূর্তি সন্ত্রম উদ্বেক করে। নিঃসঙ্গ এই একক

১৪০। শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ - পৃঃ ৪১।

১৪১। জোড়াদীঘির উদয়াস্ত — ভূমিকা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - পৃঃ ২৭

ব্যক্তিত্বের দুর্ভেদ্য হৃদয় দুর্গ আমাদের কাছে দুর্গম রয়ে গেছে - ' বাস্তবিক সে যুগের জমিদার যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগেরই একটা মানবিক প্রতিকল্প ; শাস্ত্র, লোকাচার ও বংশগৌরবের খাঁচায় বন্দী অর্ধেক পোষমানা একটি রাজশাদুল । উপন্যাসে তার কোন সঙ্গী নাই । তার হৃদয় কপাট উন্মোচনের কোন উপলক্ষ্য নাই ' ।^{১৪২} উপন্যাসের একেবারে শেষে পাষণ্ডের বুকে নির্ঝরার মতো এই বৃদ্ধের হৃদয় পাষণ্ড বিদীর্ণ করে বেদনার উৎস অব্যাহত হয়েছে ।

দর্পনারায়ণের চরিত্রে আদর্শনিষ্ঠা, আভিজাত্যবোধ, জমিদারী নীলবস্ত্রের দস্ত, প্রতিহিংসা স্পৃহা, থাকলেও যুগের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার মধ্যে অনেকখানি উদারতা ও মানবিকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । পরন্তুপকে শত্রু জেনেও সে মেরে ফেলতে চায়নি । ইন্দ্রানীকে দেখে তার হাত থেকে মশাল পড়ে গেছে, দাদুর কাছে আত্মসমর্পণ করার লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে জমিদারী অধিকার ছিনিয়ে নিতে তৎপর হয়েছে । তবে তাদের দাম্পত্য প্রেমের চিত্রগুলি সবিস্তারে অঙ্কিত হয়নি । যুগের পরিবর্তনে তার মধ্যে পূর্বপুরুষের তুলনায় কিছু আধুনিকত্ব বা সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় মিললেও জমিদারী রক্তের জের হিসাবে রক্তদহের জমিদারদের সঙ্গে চিরন্তন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে । বিশেষতঃ রক্তদহের নবাগত জমিদার পরন্তুপ রায়ের ঔদ্ধত্য এবং জোড়াদীঘির জমিদারকে অপমান করার অপপ্রচেষ্টা তাকে ও তার জাতিভাইদের ক্রোধের আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং পরিণতিতে তারা রক্তদহের জমিদার বাড়ী অবরোধ ও আক্রমণ করেছে । এ যেন মধ্যযুগীয় সামন্তরাজাদের দুর্গ অবরোধের সমতুল্য । তবে এর মধ্য দিয়ে দর্পনারায়ণের হঠকারিতা ও কিঞ্চিৎ-সাহসের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার শৌর্য-বীর্য বা ব্যক্তিত্বের জ্ঞান কোন ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে নি ।

এই উপন্যাসের কোন কোন ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয় । যেমন - চিত্রপ্রতিদ্বন্দ্বী দর্পনারায়ণ ও পরন্তুপের নির্জন স্থানে মশালের আলোয় মৃত্যুপণ অসিযুদ্ধ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের জগৎসিংহ ও ওসমানের কথা মনে পড়ায় । পায়রার পায়ে বেঁধে ইন্দ্রানী বনমালার উদ্দেশ্যে যে চিঠি দিয়েছে তা 'রাজসিংহ' উপন্যাসের অনুরূপ । বুদ্ধিমতী, কুটকৌশলী ও রূপসী, কামনাময়ী চাঁপা চরিত্রটির সঙ্গে বিষবৃক্ষের হীরা চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হয় । বেড়া যেভাবে বৈরাগী সেজে গান গেয়ে বনমালার অন্তঃপুরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রবেশ করেছে তাতে তার সঙ্গে বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্রনাথের অনুরূপ ছদ্মবেশের ও উদ্দেশ্য পূরণের কথা মনে পড়ে । সম্ভবতঃ প্রথমদিক এই উপন্যাসটি রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে

প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রমথনাথও প্রত্যক্ষ উক্তির সাহায্যে পাঠকদের প্রতি উপদেশ দান বা কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেন নি।

নারী চরিত্র প্রসঙ্গে বলা চলে যে মুখ্য নারী চরিত্রাঙ্কনে প্রমথনাথ বঙ্কিমী রীতির অনুসারী। 'তঁার অপূর্ব ব্যক্তনাময় কবিত্বশক্তির দীপালোকে তিনি তাঁর নায়িকাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন'।^{১৪৩} অবশ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও সক্রিয় বলে মনে হয়। বনমালা প্রভাতী শিশিরের মত নির্মল, সুন্দর ও ক্ষণস্থায়ী। বনভূমির সারল্য ও পবিত্রতা তাঁর অলঙ্কার। স্নিগ্ধ পুষ্পমালিকার ন্যায় তাঁর আচারে, ব্যবহারে কথাবার্তায় সমবেদনা ও করুণার প্রলেপ।

ইন্দ্রাণী প্রাত্যহিক জীবনের ধূলি মালিন্যের উর্ধ্বে এক দৈব মহিমায় ও অলৌকিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত, কিন্তু তার চরিত্রের হীরক-কঠিন ব্যক্তিত্ব তাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। দর্পনারায়ণের সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনা বাতিল হলে সে দুঃখিত হয়েছে কিন্তু ভেঙে পড়েনি বা সেই দুঃখের কথা অপরকে জানতে দেয় নি। পরন্তুপক্ষে সে বিয়ে করেছে কেবল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক ভেবে। বীরত্বের কণ্ঠেই বরমালা অর্পণ করেছে সে। কিন্তু স্বামী যখন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা চাঁপার রূপের আওনে আত্মাহুতি দিয়েছে তখন তার কঠোর আদেশ স্বামীকে বিতাড়িত করেছে। তখন সে নির্দয় পাবাণীর ভূমিকা নিয়েছে। তার চারিত্রিক আত্মবিশ্বাস ও অহঙ্কারই তার নিঃসঙ্গ বেদনাময় জীবন-ট্রাজেডির একমাত্র সান্ত্বনা। অন্তর্দাহ ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এই চরিত্রটিকে প্রভূত প্রতিশ্রুতিমণ্ডিত করে তুলেছিল কিন্তু লেখক এই সুযোগ সঠিক ভাবে কাজে লাগাননি বলেই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানস-বিশ্লেষণ বা কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার পরিচয় ঠিকভাবে পরিবেশন করেননি।

বরং চাঁপা চরিত্রটি অনেক বাস্তবসম্মত, জীবনমুখী ও মানবিক। এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েও শেষ পর্যন্ত সে নিজেই কামনা কুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ছিল।

'চলনবিল':— জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের পরবর্তী খণ্ড। জমিদারী রক্ত ও বংশগৌরব নিয়ে দারিদ্র্য লাঞ্ছিত দর্পনারায়ণ এই দুইখণ্ডের মধ্যে সংযোগসেতু রচনা করেছে। অদৃষ্টের কশাঘাতে জর্জরিত, হতকীর্তি, পুত্রমাত্রসম্বল, বাস্তবচ্যুত, প্রৌঢ় দর্পনারায়ণ নিজের অচরিতার্থ প্রতিশোধ-বাসনাকে পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখেছে তার শিশুপুত্রের মাধ্যমে। নিজে সে এই প্রতিশোধগ্রহণে অক্ষম—ধনবল বা জনবলহীন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন ও সাধনা নিযুক্ত হয়েছে চলনবিলের সর্বগ্রাসী মুখগহ্বর থেকে

কৃষিযোগ্য জমি উদ্ধারের মহান ব্রতে । অভিজাত্য ও মর্যাদার উচ্চ চূড়া থেকে তাই সে সাধারণ প্রজাদের সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে ; যুগের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন শুরু হয়েছে । কিন্তু ব্যক্তিতে ও মহাপ্রাণতায় সে উঁচুদের মানুষ হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে, প্রবল জলশ্রোতে আত্মবিসর্জন করেছে এবং এই ভাবে তার স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ-আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে ।

কিন্তু এই পরাজয় ও ধ্বংসলীলার মধ্যে ও, মহতী জীবনসাধনার চরম বিনষ্টির মুহূর্তেও নিঃসঙ্গ মহিমায় দণ্ডায়মান, আত্মবিসর্জনকারী, দৃঢ়সংকল্প দর্পনারায়ণ মহাকাব্যিক সমুন্নতি লাভ করেছে । এই পর্বেও দেখি চির শত্রু পরম্পরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও দর্পনারায়ণ ইন্দ্রাণীর স্মৃতি-বিহ্বলতায় দুর্বল হয়ে তাকে আঘাতে বিরত থেকেছে । অথচ মনে মনে প্রতিশোধের ছুরিতে শান দিয়েছে এবং নিজের বালক পুত্রকে দেহে-মনে তার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে ।

এই খণ্ডে পরম্পর চরিত্র আরও হীনবর্ণে চিত্রিত । চাঁপার প্রতি তার আসক্তি যে সম্পূর্ণ দেহজ তার পরিচয় ফুটে উঠেছে । দুদিনেই চাঁপা তার আসক্তি কেন্দ্র থেকে দূরে সরে গেছে । চাঁপার ও তার মিলন জাত সন্তান তার চক্ষুশূল হয়েছে । আবার অদৃষ্টের নির্মম অঙ্গুলিসংকেতে আত্মজা, কন্যাই তার কামানলের সমিধ হয়ে পড়েছে । এই লম্পট চরিত্রটি দুর্ধর্ষ ও অত্যাচারী ডাকাতে পরিণত হয়েছে এবং বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । এইভাবে সে জঘন্য খলচরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে । ডাকুরায়, মোহন প্রভৃতি চরিত্রগুলি তুলির বিরল রেখায় সূচিত্রিত ।

নারী চরিত্রের মধ্যে ইন্দ্রাণী এই খণ্ডে খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছে । এবং তারই মধ্যে তার মহিমময়ী অথচ নিঃসঙ্গ ও শূন্য হৃদয়ের হাহাকারটি আভাসে ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । তবে প্রাত্যহিক জীবনচরণের মধ্যে স্বাভাবিক বিচরণের সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি । কল্পলোকের উদ্ভারিতা ছেড়ে বাস্তবজগতে পদচারণা করতে পারেনি সে । অপূর্ণতা সত্ত্বেও তার মহিমা ভাস্বর হয়ে উঠেছে । চাঁপা সৈরিনী হলেও মানবী । মানবিক প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে সে ছলা কলার আশ্রয় নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চবাণের শিকার হয়েছে । কিন্তু পরম্পর কর্তৃক লালিত হলেও তার উন্মাদিনী অথচ স্নেহে মাতৃমূর্তি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে । শেষ মুহূর্তে যেভাবে সে নিজের মেয়েকে কামান্দ স্বামী পরম্পরের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাতে কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়েছে । কাজেই এই খণ্ডে চাঁপার পরিণতি ও গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ।

মোহন ও কুসমীর বাল্যপ্রণয় ও তার ব্যর্থতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । বাল্য প্রণয়ে যে অভিশাপ আছে তা আর একবার প্রমাণিত হল । তবে লেখক আর একটু

সমবেদনাশীল হলে এবং কুসমীর পরিচয়টুকু খুঁচিয়ে বার না করলে হয়তো এই অদৃষ্টবিড়ম্বিতা কিশোরীটি জীবনে একটু শান্তি লাভ করতে পারতো।

তবে চরিত্র চিত্রণের চেয়েও এ উপন্যাসের বড় সম্পদ প্রকৃতি বর্ণনা ও প্রকৃতির মানবায়িত ভূমিকা বিশ্লেষণ। প্রকৃতি ও মানব এখানে একে অপরের পরিপূরক। 'যাহা রবীন্দ্রপূর্ষ যুগে গার্হস্থ উপন্যাসে ছিল না সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্র পূর্বযুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র। আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে রবীন্দ্রোত্তরগণ গ্রহণ করিয়াছেন। . . . এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশী আধুনিক'। [বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৭, পৃঃ ১৬৫]। প্রকৃতি শুধু মানবের পটভূমি রূপে দূরে সরে থাকে নি। প্রকৃতি যেন মানবের চেয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র উপন্যাসটিকে সক্রিয় ও বেগবান করে তুলেছে; মানুষের জীবন যাপনে, জীবিকাজর্জনে ও ভাগ্য নির্ধারণে প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র চলনবিল। সাধারণতঃ ঔপন্যাসিক নর-নারীর জীবনচিত্র অঙ্কনে বেশী মনোযোগী হন। এবং সেখানে পটভূমি বা পারিপার্শ্বিক রূপে প্রকৃতির অবতারণা করা হয়। কিন্তু এই উপন্যাসে চলনবিলের প্রকৃতির রহস্যখন লীলাবৈচিত্র্যই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। মানবজীবন তাকে আশ্রয় করেই যেন আবর্তিত ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মানবজীবন-রূপ উপগ্রহ যেন চলনবিল-রূপ গ্রহের চারদিকে অনিবার্য বেগে পরিক্রমারত।

বহু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা, ব্যথা-বেদনা, বহু ইতিহাস, বহু কীর্তি ও ঐতিহ্য ঘিরে আছে চলনবিলের চারিদিক। রহস্যের মায়াজালে সে জড়িত। আবার এই রহস্যময় প্রকৃতি লেখকের অনুভূতির রসে জীবন্ত ও রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করেছে। মানুষ যেমন নিয়তির বিরুদ্ধে জয়ী হতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণে বাধ্য হয়, এখানেও তেমনি মানুষ প্রকৃতির মুখের গ্রাসকে চাষযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হয়েছে।

আসলে চলনবিল গতানুগতিকার গণ্ডি ভেঙ্গে কাব্যরস গর্ভ এক নূতন ধরনের উপন্যাসের দিশারী। শুধু গল্প উপভোগের জন্য এই ধরনের উপন্যাস লিখিত হয় না, এ হল সাহিত্য রস উপভোগের সুচারু আধার। অবশ্য প্লট বয়নের নৈপুণ্যও আকর্ষণীয়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত সংগ্রামের চারিদিকে যে কাহিনী ধারাটি প্রবাহিত তা ঐ সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রকৃতি যেখানে হিংস্র, রুদ্র, বন্য, মানুষ সেখানে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ হতে পারে না বা সভ্য জগতের প্রচলিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে পারে না। তাই চলনবিলের

মানুষেরা অধিকাংশই অশান্ত, প্রমত্ত, হিংস্র ও ভ্রূর ।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই অচ্ছেদ্যবন্ধন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে থাকলেও উপন্যাসে দেখা যায় না । শরৎচন্দ্রও এ নিয়ে মাথা ঘামান নি । বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন । একমাত্র বিভূতি ভূষণ প্রকৃতিকে মানবজীবনে একটা বড় ভূমিকা দিয়েছেন, কিন্তু তার প্রকৃতি সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়তা । প্রমথনাথের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা । এই প্রকৃতি যেমন মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তেমনি তাকে ভয়ঙ্কর ও মরণমুখী করে তোলে । তাই তার সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা চলে বা কখনও মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে সে প্রেরণা সঞ্চার করে । এইভাবে ' চলনবিল ' বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ।

ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রয়াস অতি পরিচিত । কিন্তু ভূগোল যে এভাবে কল্পনা রসে রাঙিয়ে তোলা যায়, ভৌগোলিক তথ্যকে যে এভাবে কবিত্ব শক্তির পরাকাস্থা দিয়ে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করা যায় তা চলনবিলের আগে বাংলা অন্য কোন উপন্যাসে দেখা যায় নি । চলনবিল একাধারে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপন্যাস - বাংলা উপন্যাস জগতে এ একক স্বাতন্ত্র্যে হিমালয়ের মতো উদ্ভূত মহিমায় দণ্ডায়মান । মানব মনের রহস্য থেকেও এখানে প্রকৃতির রহস্য নিগূঢ়তর ও ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে । এমন সুস্বন্দিত, এমন কুশলী লেখনী এবং মহার্ঘ কল্পনা শক্তি, প্রকৃতির এমন বিশাল, উদার, বিস্তীর্ণ, খেলালী, বিচিত্র, পরিবর্তনশীল, দুর্জয়, রহস্যময় রূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব । কবির কল্পনাশক্তির সঙ্গে মরমী ধ্যানীর অন্তর্লীন মন্বয়তা এখানে এক দেহে লীন হয়ে গেছে ।

ধূলো উড়ির কুঠি :— জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের উদয়ান্তের ৪টি পর্বের মধ্যে এটি তৃতীয় পর্ব । প্রথম পর্বে জমিদার উদয়নারায়ণের ও তার পৌত্র দর্পনারায়ণের কাহিনী, দ্বিতীয় পর্বে জমিদারীচ্যুত দর্পনারায়ণের কৃচ্ছসাধনার কাহিনী, তৃতীয় পর্বে ধূলো উড়ির কুঠিতে দর্পনারায়ণ পুত্র দীপ্তি নারায়ণের প্রেম, পরিণয় ও জমিদারী প্রাপ্তির কাহিনী এবং চতুর্থ পর্বে দীপ্তিনারায়ণ-পুত্র কীর্তিনারায়ণের বিগত গৌরব জমিদারী আঁকড়ে থাকা ও শরিকী সংঘর্ষের কাহিনী ।

' ধূলো উড়ির কুঠি 'তে দর্পনারায়ণ তার শিশু পুত্র দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে বসবাস করত । দর্পনারায়ণ নিজে তাদের কুলশত্রু রক্তদহের জমিদারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেও তাদের চক্রান্তে জমিদারী হারিয়ে ধূলো উড়ির কুঠিতে থাকত । তার পক্ষে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব না হলেও সে তার পুত্র দীপ্তিনারায়ণের উপর রক্তদহের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও বংশপরম্পরায় ঘৃণা পোষণের দায়িত্ব দিয়ে যায় । পিতার মৃত্যুর পর পুত্র দীপ্তিনারায়ণ কঠিল সমস্যায় পড়ে । ঘটনাচক্রে রক্তদহের জমিদার-পত্নী

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য এবং তৎকন্যা চন্দনীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিশেষে পরিণয় সম্ভাবনা প্রায় বানচাল হওয়ার উপক্রম হলে জানা গেল যে চন্দনীর সঙ্গে রক্তদহের জমিদার পরিবারের কোন রক্ত-সম্পর্ক নেই। কারণ সে দস্তক কন্যা। তখন দীপ্তিনারায়ণের সঙ্গে চন্দনীর বিয়ে হয়, দীপ্তি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জোড়াদীঘিতে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং দুই পরিবারের দীর্ঘদিনের শত্রুতার অবসান ঘটে। উপন্যাসটি লেখকের শেষ জীবনের রচনা। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের জটিল বংশলতিকার মধ্যে লেখক নামগুলির পারস্পর্য সর্বদা রাখতে পারেন নি। কখনও তিনি দীপ্তিনারায়ণকে দর্পনারায়ণের পুত্র, কখনও বা পৌত্র রূপে বর্ণনা করেছেন। আবার দীপ্তি নারায়ণকে জোড়াদীঘির ছ আনির অংশীদার দেখিয়েও পরবর্তীকালে কীর্তিনারায়ণকে দীপ্তিনারায়ণের পুত্র ও দশ আনির অংশীদার করে তুলেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থে 'বৈষ্ণব পদাবলী' - গানের প্রভাব অত্যধিক। অধিকন্তু পরবর্তী ৪র্থ পর্ব 'অশ্বখের অভিশাপ' উপন্যাসের যথোপযুক্ত পটভূমিকাও এই গ্রন্থে দেখা যায় না, প্রজাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য, পলোর দলের দৌরাত্ম্য এবং হাস্যকর আচরণ অনেক ক্ষেত্রে কাহিনীরস লঘু করে ফেলেছে। তবুও গ্রন্থটি সুখপাঠ্য।

'অশ্বখের অভিশাপ':— চৌধুরী পরিবারের জীবনতিহাসের ৪র্থ খণ্ড। বিগত কালের পথ বেয়ে আধুনিক কাল প্রবেশ করছে। বিগত জমিদারীর ঐশ্বর্য, জৌলুস ও প্রতাপ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান। তাই দর্পী জমিদার 'দর্পনারায়ণের' কাল শেষ হয়ে নবীন প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটেছে 'নবীন নারায়ণের'। সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে ফুটে ওঠা 'বনমালা' শহরের নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শে পরিণত হয়েছে 'মুক্তামালায়'।

এম. এ. পাশ নবীননারায়ণ শহরে মানুষ। গ্রামের মূল ভাব-স্রোতের উজ্জানে তার মানসিকতা প্রবাহিত। কিন্তু গ্রামের প্রতি, পিতৃ-পিতামহের জন্মভিটার প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই গ্রাম্য কুসংস্কার, অকারণ ধর্ম-প্রাধান্য সে মানতে নারাজ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে গ্রামের বহু বংশরের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার পীঠস্থান অশ্বখবৃক্ষটিকে বিনাশে উদ্ভূত হয়েছে সে। এবং তারই পরিণতিতে শরিকী সংঘর্ষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তক্ষয় এবং মামলা-মোকদ্দমায় জর্জরিত হয়ে অর্থক্ষয় ও লোকক্ষয়ে হীনবল হয়ে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই মানবিক হানাহানির উপর যবনিকা পতনে সাহায্য করেছে।

চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই খণ্ডে নবীননারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ পারস্পরিক স্বতন্ত্র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা নিয়ে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। নবীন শিক্ষিত, সভ্য ও রুচিশীল। তাই তার আচার আচরণে স্থলতার পরিচয় অনুপস্থিত। অন্যদিকে অশিক্ষিত, গ্রাম্য, স্বার্থলোলুপ অত্যাচারী ও মামলা প্রিয় কীর্তিনারায়ণ কিছুটা

স্থলরুচির মানুষ। লেখক তাকে একটু মোটা তুলিতেই ঐকেছেন। শেষ পর্যন্ত তার হাতসর্বস্ব, নিঃসঙ্গ, করুণ মূর্তিটি সমবেদনা উদ্বেক করে। নবীন নারায়ণের শিক্ষা-দীক্ষা, বংশগৌরব, পূর্ব পুরুষের গ্রাম ও বাস্তুশ্রীতি, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরিকের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে যাওয়া এবং সদর শহরে গিয়ে সেই মামলার তদ্বির-তদারকি করা প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের যোগ আছে বলেই মনে হয়। নবীন নারায়ণ তাই এত সজীব ও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মুক্তামালা শহুরে-ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান হলেও নারীর সহজাত কমণীয়তা, সৌন্দর্য, মাধুর্য, স্বামীপ্রীতি, সহানুভূতিবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি গুণে ভূষিত। মোটকথা সে রক্তমাংসের নারীই, প্রাত্যহিক সংসারের বাস্তব মানুষ। অশ্বিকাদেবী ও রুক্ষিণী ও নিজ নিজ পরিবেশ ও মানসিকতার গতিতে বিশেষ প্রশংসার। এছাড়া লাঠিয়াল, মুহুরী, দারোগা, নায়েব প্রভৃতি চরিত্রগুলিও তুলির দু'একটি আঁচড়ে সুচিত্রিত। শশাঙ্ক ও বাদলির প্রেমের যে শাখা-কাহিনীটি আছে তা খুব চিত্তাকর্ষক বা মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য না হলেও চরিত্রদুটি সুলিখিত। তবে শশাঙ্ক চরিত্রের স্বার্থপরতা, বাকপটুতা, চাতুর্য ও হীনতা এবং তার করুণ পরিণতি একটু অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব মনে হয়।

'অশ্বখের অভিশাপ' উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান, কাহিনী-বয়ন বা চরিত্র-চিত্রণ প্রশংসাযোগ্য হলেও এই উপন্যাসে কাব্যিক অনুভূতি প্রকাশে ও জীবনদর্শনের অর্থঘন প্রবাদ প্রবচন মূলক মন্তব্য পরিবেশনে, প্রকৃতির অপকল্প সৌন্দর্য বর্ণনা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেখকের লিপিকুশলতা ও মানসপ্রকর্ষের পরিচয় মেলে। বিলীয়মান জমিদারীর ক্ষীয়মাণ প্রভাব, এককালের প্রবল প্রতাপাধ্বিত জমিদার বংশের দীনহীন দুরবস্থা, বিগত-গৌরব, আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদের জীর্ণ ভগ্নস্তম্ভের যে করুণ ইতিহাস রচিত হয়েছে তা লেখকের কবিত্বশক্তি ও বাস্তবরস চেতনার পরিচয়বাহী। ঐতিহাসিক উপন্যাস : সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে শিল্পীসুলভ কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি— ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এদের সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর নামটিও ঐতিহাসিক উপন্যাসিক হিসাবে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

উপন্যাসিকের সত্যনিষ্ঠা, শিল্পবোধ ও ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠার গঙ্গায়মুনা সঙ্গমে জন্ম নেয় ঐতিহাসিক উপন্যাস; অস্পষ্টতার কুয়াশাচ্ছন্ন সুদূর অতীতকালের বাস্তবতা পরিস্ফুটনের জন্য উপন্যাসিক বহুক্ষেত্রে নাটকীয় কৌশলের আশ্রয় নেন। তবে এই ধরনের উপন্যাসে লেখক তাঁর ইচ্ছা মতো কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে বিকৃত অথবা উন্নত করতে পারেন না। বরং ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের একটা

সুষ্ঠুসমর্থ সাধনে ব্রতী হন তিনি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক এমন চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন ইতিহাসে যাদের পাওয়া যায় না, কিন্তু থাকতে পারতেন। এদের বলা হয় ঐতিহাসিক সম্ভাবনা-প্রসূত চরিত্র। এই সমস্ত ক্ষেত্রে লেখকের স্বকীয়তা প্রদর্শনের স্বাধীনতা থাকে। ঐতিহাসিক উপন্যাসকার ইতিহাসের বৃহত্তর সাধারণ সত্য দেখাইতে বাধ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দিলে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না।^{১৪৪} বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন — 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।'

ঐতিহাসিক উপন্যাস কিছুটা এপিকধর্মী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমি থেকে এই ধরনের উপন্যাসে এক উদাত্ত-গভীর, বিরাট ও বিশাল পটভূমিকায় পাঠকচিত্ত বিচরণের সুযোগ ও তজ্জনিত আনন্দ পায়। ফলে অতীত জীবন্ত হয়ে পাঠক চিন্তে 'ঐতিহাসিক রস' সৃষ্টি করে। কিন্তু ঔপন্যাসিক ইতিহাসকার নন। তাই ইতিহাসের ঘনঘটা ও রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্তরালে তিনি প্রেম-হৃদয়ের ও হৃদয়-বিপ্লবের সন্ধান করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে এক বিশেষ রস সঞ্চার করে। ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ তাহার সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই।'^{১৪৫} প্রমথনাথ তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে 'ঐতিহাসিক রস' ও 'জীবনরসের' সার্থক সমীকরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি বিবর্তনধর্মী। পূর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজা-বাদশাদের শৌর্য-বীর্য, উত্থান-পতন চিত্রিত হোত। তখন রাজপুত, মোগল, পাঠান ও মারাঠাদের ইতিহাসকেই ঔপন্যাসিক প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু বর্তমানের ঐতিহাসিক উপন্যাসে শুধু সুদূর ইতিবৃত্ত নয় সাম্প্রতিক ইতিহাসের চরিত্র ও কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। এই কারণেই বর্তমানে সিপাহীবিদ্রোহ বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে অবলম্বন করে অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হচ্ছে।

পূর্বে ইতিহাসের রাজপথে পরিক্রমারত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশেষ স্থান দেওয়া হোত। কিন্তু তৎকালীন সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের প্রয়াস দেখা যেত না। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের শক্তির উৎস রূপে ও ইতিহাসের পটপরিবর্তনের

১৪৪। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা পৃঃ ১০৪।

১৪৫। ঐতিহাসিক উপন্যাস, [সাহিত্য] — রবীন্দ্রনাথ।

মূল শক্তিরূপে সাধারণের জীবনচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস লক্ষ্যগোচর হয়। প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস এর উদাহরণ।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ-লক্ষণের ভিত্তিতে প্রমথনাথ বিশীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিচার্য।

সিদ্ধনদের গ্রহরী [১৯৫৫] :— ভূমিকায় লেখা আছে ' ইতিহাসরসাস্থিত এই উপন্যাসখানি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৬১ সালের দোল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল '। গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত ৪১টি ইতিহাস গ্রন্থের তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে লেখক ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তথ্যানিষ্ঠ ছিলেন। তবে তথ্যের কাঠামোর উপর তিনি শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনার প্রলেপ দিয়ে একে যথার্থ উপন্যাস পদবাচ্য করে তুলেছেন। মহাকবি কালিদাসের কালের উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করে রচিত এটি ভাবীকালের ইতিহাস। এই কল্পিত ও অনাগত ইতিবৃত্ত রচনায় লেখকের মুন্সিয়ানা সীমাহীন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু শ্বেতহন কর্তৃক উজ্জয়িনী বিজয়। বিখ্যাত গুপ্ত বংশের অন্তিম পর্যায়ের রাজা বৃহগুপ্ত পূর্বপুরুষ রাজা সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বা কুমারগুপ্তের শৌর্যবীর্যের উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অনেক কম ছিল। ফলে একদা গুপ্ত রাজাদের দ্বারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত শ্বেতহন সম্প্রদায় কৌশলে শাস্তিচুক্তি ও সন্ধিপত্রের হিদ্রপথে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের সুযোগ নিয়েছে। হতবীর্য, নিষ্ক্রিয়, হীনবল, অদূরদর্শী বৃহগুপ্ত তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ক্রমশঃ সমগ্র উজ্জয়িনী তথা গুপ্ত সাম্রাজ্যের তথা ভারতবর্ষের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। রাজার সেনাপতি মহাদত্তনায়ক পুষ্যভূতি যথার্থ দেশ প্রেমিক, বীর ও দূরদর্শী ব্যক্তি হলেও রাজা তার কথায় কর্ণপাত করেন নি। তাঁর আশ্রয় চেষ্টা নিষ্ফলতার মরুবালাকায় বিলীন হয়েছে এবং সে নিজে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীর মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আততায়ীর হাতে প্রাণত্যাগে বাধ্য হয়েছে।

উপন্যাসের মধ্যে দেখান হয়েছে কিভাবে উজ্জয়িনীর নাগরিকরা রাজা ও রাজপুরুষদের বিলাসিতা ও বোকামীর ফলে ধীরে ধীরে স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বকীয় ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে হনদের মিথ্যাচার ও অর্থদানের স্রোতে ভেসে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছে; কিভাবে একটি দেশ ও জাতির নিজস্ব পরিচয় ও স্বাধীন সত্তা বিদেশীদের হাতে অবলুপ্ত ও ধ্বংস হয়ে গেছে। উজ্জয়িনীর যে মুষ্টিমেয় কয়জন এই বিদেশী চক্রান্ত ও স্বদেশী রাজন্যবর্গের নিষ্ক্রিয়তা বিষয়ে সচেতন ছিল তারা যথাক্রমে, রাজসেনাপতি পুষ্যভূতি, রাজকবি কালিদাস, আর্য্যশীলাবতী, সাহিত্যিক নিচুল ও বিদুষক বসন্তক। কিন্তু তাদের সংখ্যা ও প্রভাব ছিল খুবই সীমিত। তাই তাদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা কোন কাজে লাগে নি। তবে তাদের আলাপ-আলোচনা ও দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে উজ্জয়িনীর সর্বনাশের চিত্রটি

স্পষ্টতর ও অধিকতর বিষাদবিধুর হয়ে উঠেছে।

সিদ্ধনন্দ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তরসীমা। একদা শ্বেতঘনরা গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে গুপ্তরাজা তাদের সিদ্ধ নদের পরপারে বিতাড়িত করেন। সেনাপতি পুষ্যভূতি রাজা বুধগুপ্তের কাছে অনাদৃত হয়ে শ্বেতঘন সকলের অগোচরে সেই সিদ্ধ নদের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপের পর্বতশীর্ষে অহোরাত্র শত্রু পাহারার কাজে আত্মনিয়োগ করে। তার শ্যেন চক্ষুতে শত্রু সৈন্যের উপস্থিতি ধরা পড়ে এবং সে উপযুক্ত সময়েই ভারতের সমস্ত স্বাধীন রাজন্যবর্গকে সাবধান করতে সচেষ্ট হয় কিন্তু সকলেই তাকে অবিশ্বাস করে। ফলে ভারতবর্ষ অচিরকালের মধ্যে শ্বেতঘন কর্তৃক বিজিত হয়।

প্রমথনাথ শুধু ঔপন্যাসিক নন, তিনি দূরদর্শী কবি ও শিল্পী। এই উপন্যাসে তিনি অতীতের পথ ধরে ভাবীকালের ইঙ্গিতপূর্ণ ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। পরবর্তীকালে বন্ধুত্বের ও নানাবিধ গালভরা চুক্তির অভিনয় করে কম্যুনিষ্ট চীন যে ভারতবর্ষ গ্রাসে উদ্যত হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপট ও পূর্বগামিনী ছায়া লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসে। তিনি এও দেখিয়েছেন যে যখন কোন জাতি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্ধের মত পরানুকরণে সচেষ্ট হয় তখন সেই জাতির দুর্দিন ও ধ্বংস শুরু হয়। কাজেই বিজাতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক মতবাদ অন্ধের মত অনুসরণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। একদা ভারতে কম্যুনিষ্টদের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতাকে লক্ষ্য করেই প্রমথনাথ সুকৌশলে এই বেদনাদায়ক পরিণতির কথা এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এই উপন্যাসে। কবি ও উপন্যাসিক দেশ ও জাতির জাগ্রত বিবেক, সতর্ক প্রহরী। 'সিদ্ধ নদের প্রহরী' উপন্যাস তারই প্রমাণ।

রাজা বুধগুপ্ত, সেনাপতি পুষ্যভূতি, রাজকবি কালিদাস, আর্যশীলাবতী প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। রমাণী, মধুবল্লরী, বকনাস, বসন্তক প্রভৃতি অনৈতিহাসিক হলেও ইতিহাসের সম্ভাবনাপ্রসূত চরিত্র। সামগ্রিক ভাবে কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে উপযুক্ত দেশ-কাল-পাত্রের পটভূমিতে বাস্তবিত 'ঐতিহাসিক রস' ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন লেখক। শুধু তাই নয় অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের একটা সংযোগসেতু রচনা করে তিনি মহত্তর শিল্পীর পরিচয় রেখেছেন।

লেখকের ভাষা ইতিহাস-রচয়িতার ভাষা নয়, কবি ও শিল্পীর ভাষা। কল্পনা ও আবেগ অনুভূতির উপাদানে সে ভাষা কাব্যিক ও ব্যঞ্জনা গর্ভ। যেমন — 'সিদ্ধনন্দ গর্ভে সেই দ্বীপ, সেই দ্বীপে সেই গিরিশঙ্কু, সেই গিরিশঙ্কু পৃষ্ঠে সেই মনুষ্যমূর্তি। সেই মূর্তি অন্তর্ধান সূর্যবিন্দের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মূর্তি স্থানু, সূর্যবিন্দু অপসূর্যমান। রক্ত, দক্ষ, অনুস্মর গিরিদিগন্তের পিছনে ধীরে ধীরে সূর্যকলক নামিয়া যাইতেছে, গিরিমালা রক্তাভ, তৃণাশুষ্ক প্রান্তর ধূসর, . . . ছায়া বিস্তৃততর, অন্ধকার গাঢ়তর, নৈশবন্দ গভীরতর হইতেছে; অবশেষে একসময়ে অন্তর্ধান সূর্যের শেষ বিন্দুটি মিলাইয়া

গেল, মনুষ্যমূর্তি নড়িল না, সরিল না, স্থান পরিবর্তন করিল না'।^{১৪৬}

ইতিহাসের অস্পষ্ট ধূসর পান্ডুলিপির প্রতি প্রমথনাথের দুর্বীর আকর্ষণ বরাবরই খুব গভীর,— তাঁর দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রে মতই অতীতচারী। তারই প্রমাণ মেলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গল্প রচনায় এবং পরবর্তীকালে লাল কেদারা, কেরী সাহেবের মুনসী প্রভৃতি উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগের মধ্যে। পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আরও বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী; ঘটনার ঘনঘটা ও চরিত্রের জটলা ও জটিলতা অনেক বেশী ব্যক্তনাবহ। সিদ্ধনদের প্রহরী কানাড়া ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কেরী সাহেবের মুনসী:— [১৩৬৫] রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ঐতিহাসিক রস ও জীবনরসের সার্থক সম্মিলনে এটি কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্মে উন্নীত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক দর্শনের (Philosophy of history) — বিচার বিশ্লেষণ প্রয়াস এবং রূপদ্রষ্টা, রূপশ্রষ্টা জীবনশিল্পীর সচেতন ও তন্মিষ্ট শিল্পসুখমাবোধ এই উপন্যাসটিকে এক অনন্যসাধারণ মহিমায় ভূষিত করেছে। এই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য বিশেষ বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। '১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের ইতিহাস এর কাঠামো। দুই শ্রেণীর নরনারীর চরিত্র আছে উপন্যাসখানায়, ঐতিহাসিক আর ইতিহাসের সম্ভাবনাসজাত। কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, টমাস, রামমোহন, রাধাকান্তদেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। রেশমী, টুশকি, ফুলকি, জন শ্মিথ, লিজা, মোতি রায় প্রভৃতি ইতিহাসের সম্ভাবনাসজাত।^{১৪৭} প্রমথনাথ মূলতঃ কবি, ফলে তিনি রোমান্টিক কবি-কল্পনার অধিকারী; তাঁর এই কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক মনের অনিবার্য ফলশ্রুতি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি। অতীতচারী এই কল্পনা-সম্পদকেই ইংরাজী সমালোচক 'Historical Imagination' — আখ্যা দিয়েছেন। এই কল্পনাকুশলতার স্পর্শে মৃত অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে, নবতর সৃষ্টির সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। 'কেরী সাহেবের মুনসী'তে প্রমথনাথের উক্ত রোমান্টিক কল্পনা কুশলতার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসটিতে উইলিয়াম কেরী ও তার মুনসী রামরাম বসুর ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর সঙ্গে সমকালীন বাঙালীর ও ইংরাজের সামাজিক জীবন ধারা ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গভীর অথচ রসজ্ঞ বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যুগসন্ধির কলিকাতা তথা বাংলা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের হৃদস্পন্দন এই উপন্যাসের বুকে কান পাতলেই শোনা যায়। ইঙ্গ

১৪৬। সিদ্ধনদের প্রহরী, প্রমথনাথ বিশী - পৃ: ৮৭

১৪৭। কেরী সাহেবের মুনসী, পৃ: ২।

বঙ্গ সমাজের এমন নিপুণ বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন কলিকাতা নগরীর এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, তার ভৌগোলিক বিবরণ, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ধারণ, তার অরাজক ও উচ্ছৃংখল জীবনায়ণ এই উপন্যাসে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি তৎকালীন বাংলাদেশের একটি বিশ্বস্ত দলিল হলেও সৃজনধর্মী, রূপদক্ষ প্রমথ- প্রতিভার মৌলিকতায় এক অসাধারণ জীবনমুখী শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচকের সঠিক মূল্যায়ন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— 'কেরী সাহেবের মুন্সী ও লালকেদ্বায় ইতিহাসের অস্থির ঘটনাবর্তের মধ্যে রাজনৈতিক সংকোভ ও সমাজ জটিলতার ভিতর দিয়া মানবজীবনের লীলাময় ছন্দটি কেমন করিয়া অদৃশ্য বিধাতার হাতে রচিত হইয়া চলে লেখক তাহার তথ্যপূর্ণ নিপুণ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য ঔপন্যাসিক গুণগুলি এই দুই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক উপন্যাসে আরও প্রধান ও কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকে একদিকে যেমন আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকে পরিণত করিয়াছে, তেমনি এই দুই গ্রন্থ একালের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ রচনা করিয়াছে।'

মাত্র বিশবছরের কলকাতার জীবনধারার যে অকৃত্রিম চিত্র এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে একদিকে বাংলাদেশের ও বাঙালীর একটা দুর্লভ প্রতিকৃতি বিদ্যুত হয়েছে, অন্যদিকে গদ্য সাহিত্যের সূচনাপর্বের সৃজন-যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কেরীসাহেব ও তার মুন্সী রামরাম বসু বিধি নির্দিষ্ট এমন দুটি সম্মিহিত মানিকজোড় চরিত্র যাদের নাম সাহিত্যানুরাগী যে কোন ব্যক্তির মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রমথ বিশী এই উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে কেরী ও তার মুন্সীকে একত্র করে সুযোগ্য চাতুর্য ও সুদূর প্রসারী ইঙ্গিতময়তার পরিচয় রেখেছেন।

ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশে ঐতিহাসিক সম্ভাবনার গর্ভজাত চরিত্রগুলি লেখকের তৎকালীন যুগসচেতনতা, জীবনবোধ ও কবিসুলভ ঔচিত্যবোধের স্মারক। ইতিহাসের অভিজাত চরিত্রকে পাশ কাটিয়ে লেখক এখানে সাধারণ মানুষদের মানবিক কাহিনীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই কাহিনীর মধ্যে, তার কথনে ও চালচিহ্নাঙ্কণে দুটি জাতির সমগ্র জীবনবোধের আশ্চর্যসুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে। রামরাম বসুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কতখানি ঐতিহাসিক সত্যে বিদ্যুত সে বিষয়ে মতান্তর থাকলেও ঔপন্যাসিক সৃজনী কল্পনার যাদুস্পর্শে তার জীবন-দর্শন ও শিল্পী মনের আর্তি প্রায় মহাকাব্যের নায়কের ভগ্নাংশ হয়ে উঠেছে। বহুরূপী, বিচিত্রবর্ণা কলকাতার দিবারাত্রির যে ঐতিহাসিক কাব্যগাথা রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে তা যে কোন রহস্যগল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর। কলকাতা শহর যেন এখানে একটি জীবন্ত ও চলমান চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

উপন্যাসটির গঠনকৌশল, অধ্যায়-বিন্যাস ও পঙ্কাজ নাটকের ন্যায় সূচনা, শীর্ষদেশ ও পরিণতি অঙ্কন এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের স্বতন্ত্র, কাব্যিক নামকরণ প্রমথ বিশীর মৌলিকতা

ও বঙ্কিমানুসারী মনোভাবের প্রতিকলন স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ পক্ষে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত এই রমণীয় উপন্যাসটি যেন এক যুগসন্ধির দেশকাল-পাত্রের আনন্দে ও বিষাদে, উল্লাসে ও হাহাকারে পরিপূর্ণ একটি গাঢ়বদ্ধ পঞ্চাঙ্গ নাটকের সমতুল। এর সাবলীল গতি, অনায়াস বাণী রচনা, রমণীয় ভাবভঙ্গিমা ও মনোজ্ঞ কল্পনা- সম্পদে সমৃদ্ধ বর্ণনা বার বার মনে করিয়ে দেয় যে কবি, নাট্যকার ও উপন্যাসিকের সার্থক সম্মিলনেরই ফলশ্রুতি এটি। সমালোচকের ভাষায় — 'নানা দিক দিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আছে। ইহার ইতিহাসের মর্মোদ্ঘাটন, বর্ণনাকুশলতা, জীবনাভিজ্ঞতাদ্যোতক গভীর অর্থপূর্ণ মন্তব্যসম্মিশ্র, প্রেমের উন্মেষবিষয়ক সৌন্দর্যানুভূতি— এই সমস্তই তাহার সাহিত্যকৃতির চমৎকার নিদর্শন। অবশ্য এই ইতিহাস নভোচারী নহে, পদাতিকবৃত্তি; এখানে ঘটনার প্রাধান্য নাই। প্রাধান্য অন্তর্জীবনের ধীর মধুর ছন্দবদলের'।^{১৪৮} বাংলাদেশের পটপরিবর্তনের পালায় কেরী মধ্যযুগের শেষ মানুষ এবং রামরাম আধুনিক যুগের প্রথম মানুষ। বিলীয়মান আদর্শ ও ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে জন্ম নিচ্ছে স্বাধীনচিন্তা ও ব্যক্তিস্বাভাব, ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে উদ্ভব ঘটেছে মানবরসে সমৃদ্ধ, বিচিত্র ভাব-রসে সম্পৃক্ত সাহিত্য সম্পদ। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন বা মদনাবাটির নীলকুঠির পরিবর্তে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই হয়ে উঠেছে নবচেতনার পীঠস্থান — বাংলা গদ্যে সাহিত্যরচনার প্রয়াস এনে দিয়েছে বাঙালী জীবনধারার মুক্তি ও খুলে দিয়েছে আত্মপ্রকাশের নবতর সম্ভাবনার দিগন্ত। এখানেই কেরী ও তার মুনসী রামরাম বাঙালী জীবনের চিরন্তন প্রেরণাদাতারূপে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। তারা যেন ঐ বিশেষ যুগের বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবনের অন্যতম প্রতিনিধি। দোষগুণে সমন্বিত রামরামের ব্যক্তিজীবন যেমন লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে সজীব ও জীবন্ত তেমনি বাঙালীর জাতীয়জীবনের প্রতিনিধিরূপে সে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর চাতুর্য, উপস্থিতবুদ্ধি, পরিহাস প্রিয়তা, কমনিস্থা, বৈদগ্ধ্য, আত্মমর্যাদাবোধ, বাস্তবজ্ঞান, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, আধুনিক মনস্কতা তাকে এই উপন্যাসের নায়কের মর্যাদা দান করেছে। আপাত নিরপেক্ষ ও সংসার নিরাসক্ত, দেহসর্বস্ব এই ভোগী মানুষটির মনেও যে প্রেমের স্পর্শ শেষমুহুর্তে বিশেষ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে তার মানসিক বৈকল্য ও জীবনট্রাজেডি ঘনীভূত হয়েছিল তার চিত্রটি সবিস্তার না হলেও লেখকের সহানুভূতিশীল শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে।

রেশমীর পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবন কাহিনী পাঠকের কৌতূহলকে সদা জাগ্রত রাখে। অদৃষ্টলাঞ্ছিত, দুর্ভাগ্যতাড়িত এই চরিত্রটি বাকপটুতা, উপস্থিতবুদ্ধি, পরিহাসবোধ ও জীবনানুরাগে দেদীপ্যমান। অন্তিম মুহুর্তে তার পক্ষে মোতি রায়ের বাগানবাড়ি

ত্যাগ করা হয়তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু বার বার অদৃষ্টের নির্মম কশাঘাতে জঞ্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে সে উপন্যাসটিকে ট্রাজিক নাটকের মর্যাদা দান করেছে। এছাড়া জীবনরসিক শিল্পী প্রমথনাথের লেখনীর দু একটি আঁচড়ে ছোট বড় সব চরিত্রই যেমন জনশ্রুতি, মেরিডিথ, দুবোয়ী, লিজা, ডরোথি, কেরী, টমাস, ফুলকি, টুশকি, ন্যাডা, চন্ডী, মোতিরায়, তিনু চক্রবর্তী প্রভৃতি যথাযথরূপে চিত্রিত হয়েছে। এই মহাকাব্যিক উপন্যাসটি যেন চরিত্র-চিত্রশালা এবং পাঠকবর্গের সৌন্দর্যরস পিপাসা চরিতার্থতার অন্যতম উৎস।

এই উপন্যাসে প্রমথনাথ বহুক্ষেত্রে বঙ্কিমানুসারী। স্বপ্নের মাধ্যমে অতীত আলোছায়া কিংবা ভাবী ঘটনার ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে করায়। বিবেকের সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথন এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিশ্লেষণ প্রবণতা বঙ্কিমী কৌশল। রেশমী, রামরাম বসু প্রভৃতির অন্তর্লৌকিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন লেখক।

গঠনকৌশল বিচার প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সমস্ত উপন্যাসটিকে পঞ্চাঙ্গ নাটকের মত পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি খণ্ডের প্রতিটি পরিচ্ছেদের স্বতন্ত্র ইঙ্গিতপূর্ণ নামকরণও বঙ্কিমী কৌশলানুসারী। কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গী, অলঙ্কারখচিত ভাষা প্রয়োগ, অর্থঘন, সরস, সংহত, সারগর্ভ, জীবনমুখী, প্রবচনমূলক বাক্যরচনা বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে করায়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু পার্থক্যও চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসেই অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসে তা অলক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা ও চিন্তাচেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু প্রমথনাথ সেই সঙ্গে সমসাময়িক দেশ-কাল-পাত্র ও সমাজচেতনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীর অনেকেই বিশিষ্ট পরিবারের সদস্য। কিন্তু কেরীসাহেবের মুন্সীতে নায়ক রাম বসু বা নায়িকা রেশমী অতি সাধারণ স্তরের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রমথনাথও তুলির বিরল রেখায় যে কোন চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সফল হয়েছেন। কখনও কখনও লেখক নিজেই সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে কালিদাস ও মল্লিনাথের যৌথ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো চরিত্রগুলির অন্তর্লৌকিক রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হয়েছেন। যেমন রামরাম বসুর জটিল চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন - "রাম বসু অতিশয় ধূর্ত, অতিশয় ঘোড়েল, অতিশয় প্রাজ্ঞ বাস্তববাদী; ক্ষিপ্ৰ, নিপুণ ছিপ নৌকার মত ডাইনে বাঁয়ে সাহেব সমাজ ও বাঙালী সমাজের ঠেউ কাটিয়ে ছুটেতে সে অভ্যস্ত; পিছে পড়ে থাকে পাণ্ডিত্যের বজরা, ঐশ্বর্যের পাঙ্গী, বানচাল হয়ে যায় নিবুদ্ধিতার পালোয়ারী সব নৌকা, সংসারতরঙ্গ তলে নৃত্য করে ছুটে চলে যায় রাম বসুর লঘুভার ছিপ। . . . সে কেবল অনুভব করে

না, অনুভূতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে, নিজের অনুভূতিকে বাইরে স্থাপিত করে নিরীক্ষণ করে ; এক সঙ্গে সে তন্ময় ও মন্ময়, ' প্রাচীন মানুষ' হরগৌরী, ' নব্যমানুষ' অর্ধনারীশ্বর । রাম বসু প্রাচ্যভূখন্ডের প্রথম 'মডার্ন ম্যান' বা 'নব্য মানুষ' । এ বিষয়ে সে রামমোহনের অগ্রজ " । ১৪৯

এ হল কবির ব্যাখ্যা । তাই তার সঙ্গে তর্ক না করেও বলা চলে যে ইতিহাসে রামরাম বসুকে যেভাবে নারী লোলুপ, স্বার্থপর চরিত্র হিসাবে পাই তার সঙ্গে কবিকল্পনায় গঠিত এই উপন্যাসে বিধৃত রামরামের বিশেষ মিল নেই । আর প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, গভীর মানবতাবাদী, তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রামমোহনকে রামরাম বসুর সঙ্গে তুলনা না করাই ভালো । তবে বাংলা গদ্য সৃষ্টির উষালগ্নে উইলিয়াম কেরীর সঙ্গে রামরাম বসুও যে কিছু অবদান রেখেছিলেন এবং সেই নূতন যুগের ভোরে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালীর বদ্ধ মনের দরজা যে মুক্ত হতে শুরু করেছিল তার প্রতিনিধি হিসাবে ঐতিহাসিক চরিত্র রামরাম বসু এবং সজীব, সক্রিয় মানবিক দোষগুণে সমন্বিত ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে রামরাম বসু চিরকাল অমর হয়ে থাকবে । ঐতিহাসিক রস ও মানবিক রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে ফুটে ওঠা এই সাহিত্য শতদলটি শিল্পসৌন্দর্যে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে বলে মনে হয় ।

লালকেল্লা :— [ফাল্গুন, ১৩৭০] — সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস । সুপরিচিত সিপাহী বিদ্রোহ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু । একই ঐতিহাসিক সত্য রূপায়িত হয়েছে কেরী সাহেবের মুঙ্গী ও লালকেল্লায় । মধ্যযুগের আবরণ ভেদ করে নব্য বাংলার নব জাগরণ কিভাবে বাংলাদেশের পটভূমিকায় সূচিত হয়েছিল তারই তথ্যনিষ্ঠ ও শিল্পসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কেরী সাহেবের মুঙ্গীতে । লালকেল্লার পটভূমি দিল্লী হলেও বক্তব্য মোটামুটি এক । প্রসঙ্গক্রমে 'লালকেল্লা' উপন্যাসে লেখকের ভূমিকাটি বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য : ' বর্তমান উপন্যাস সম্বন্ধে কোন মহাখবর দাবী লেখকের নেই, তৎসত্ত্বেও খুব সম্ভব একটি জীবনধারণা প্রকাশিত হয়েছে কাহিনীটিতে । সে আর কিছুই নয়, মধ্যযুগের খোলস ভেঙে নব্যভারতের গরুড়ের আত্মপ্রকাশ . . . সিপাহীবিদ্রোহ এই খোলসের উপর চূড়ান্ত শেষ আঘাত । খোলস বিদীর্ণ হয়ে পড়ে গিয়ে নব্য ভারত " মহৎ ক্ষুধার আবেশ " নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে তার অগ্নিময় পক্ষ ছড়িয়ে পূবে-পশ্চিমে, চন্দ্রলোক থেকে সুধা আহরণ করে আনবার জন্য সে উদ্যত । এ কাহিনী মহাকবিদের লেখনীর যোগ্য । বলাবাহুল্য সে শক্তি থেকে লেখক বঞ্চিত । তৎসত্ত্বেও এই কাহিনীর অসম্পূর্ণ খসড়া আঁকতে চেষ্টা করেছে সে,

কেরী সাহেবের মুন্সী উপন্যাসে সেই চেষ্টারই আর একটি অসম্পূর্ণ উদাহরণ'।

উক্ত বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে শুধু যুগজীবনের চালচিত্রাঙ্কন লেখকের উদ্দেশ্য নয়, ইতিহাসের সুপরিচিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশেষ ঐতিহাসিক দর্শন বা তাৎপর্য নির্ধারণে ব্রতী হয়েছেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম যুগে বিষয় হিসাবে রাজা রাজড়াদের কাহিনীকেই প্রাধান্য দেওয়া হোত, কিন্তু লালকেল্লা বা কেরী সাহেবের মুন্সীতে ঐতিহাসিক সম্ভাবনাসম্ভাত সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ বা আশা-আকাঙ্ক্ষা চিত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে লেখকের মানসিকতার সুন্দর প্রতিচ্ছবি মেলে - 'শিল্পীর চোখ দেখছে যে, সিপাহী বিদ্রোহ [বা যুদ্ধ] উপলক্ষে হিন্দুস্থানে একটা বিরাট ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তার ফলে তারই মধ্যে নিক্ষিপ্ত অগণিত নরনারী দুঃখ, বেদনা, আর্তিতে ক্ষণে ক্ষণে হাহাকার করে উঠেছে। এই হাহাকারটাই শিল্পীর বস্তু। রাজায় রাজায় চলছিল যুদ্ধ। উলুখড়ের বনে চলছিল বিপর্যয় - এই বিপর্যয়টাই শিল্পীর বস্তু। শিল্পীর দায়িত্ব ইতিহাস বা মতবাদের কাছে নয় - মানবজীবনের নানারঙের ডোরাকাটা ঐ ছবিখানার কাছে। শিল্পীর স্থান রাজা-রাজড়ার পক্ষে নয়, শিল্পীর স্থান আন্দোলিত, বিমর্দিত, বিপর্যস্ত উলু খড়ের পক্ষে। তার একমাত্র দায়িত্ব তাদের জীবন কাহিনী অঙ্কন। তত্ত্ব নয়, মত নয়, চিত্র ও গল্প তার একমাত্র লক্ষ্য। . . . বর্তমান কাহিনীর নায়ক-নায়িকাগণ সকলেই নিতান্ত সাধারণ মানুষ। . . . কেবল দুঃখ ভোগের মহিমাতেই তারা অসাধারণ। তারা সকলেই অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল হিন্দুস্থানবাসী ঘূর্ণিপাকের মধ্যে - সেই কাহিনীই বর্তমান গ্রন্থ।'।

কাজেই উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রন্থখানির বিচার হওয়া উচিত। জীবনরসের কারবারী লেখক মানবিক চেতনা ও সুদূর প্রসারী কবি চেতনার শিকড় চালিয়ে ইতিহাসরসমিশ্রিত যে জীবনভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাই শিল্পসম্মত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এই গ্রন্থটিতে।

বৃহৎ-কলেবর গ্রন্থটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি আবার তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। এদের মধ্যে প্রথম খণ্ডে পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৭, দ্বিতীয় খণ্ডে পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৫ এবং তৃতীয় খণ্ডে পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৬, দ্বিতীয় ভাগ বিভক্ত হয়েছে তিনটি খণ্ডে— পরিচ্ছেদ বিভাগ যথাক্রমে, ১৯ ১৬ এবং ১২। তৃতীয় ভাগ দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত— পরিচ্ছেদ বিভাগ যথাক্রমে, ১২ ও ৪।

কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক আড়ম্বর, আভিজাত্য ও বর্ণবৈভব ; বীরপনা বা স্বদেশপ্রেমের অভাব লক্ষ্য করে লেখকের ক্রটি নির্দেশ করেছেন বিখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - 'ইতিহাসের বন্ধন এখানে অত্যন্ত শিথিল। . . . ঘটনার

সমতল ভূমি ছাড়াইয়া ইহা কোন ভাবমহিমার দুরারোহ শিখর দেশের তুঙ্গতায় পৌঁছে নাই। সুতরাং ইহা সাধারণ জীবনের সহাবস্থান করিয়াছে ; উহাকে নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার পরিচালনা করে নাই '।^{১৫০} সমালোচক এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের ক্রটিরূপে নির্দেশ করলেও তিনি লেখকের কৃতিত্বকে ছোট করে দেখাতে চান নি। তাই ' প্রমথনাথের দুটি গুণ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করে। প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্টিশক্তির অফুরন্ত প্রাচুর্য বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি অতি সহজেই তুলির দু একটি যথেষ্ট রেখার টানে মানুষের প্রণয়লীলাকে প্রত্যক্ষ গোচর করাইতে পারেন। তাঁহার এই সাতশত পাতার বিরাট উপন্যাস অসংখ্য সজীব নরনারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র। . . এই বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃষ্টি প্রাচুর্য প্রমাণ করে যে লেখক কোন অজ্ঞাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রাণশক্তির গোপন উৎসটির সন্ধান পাইয়াছেন ও অবলীলাক্রমে যদুচ্ছাকল্পিত নরনারীর মাধ্যমে এই প্রাণচেতনাকে রূপ দিতে পারেন। ব্যঙ্গাতিরঞ্জন ও সৃষ্টির অজস্রতা উভয় দিক দিয়াই তিনি ডিকেন্সের সমধর্মী লেখক '।^{১৫১}

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বঙ্কিমানুসারী। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রীতি বর্তমান লেখক অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছে'।^{১৫২} লালকেল্লা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই প্রতিটি পরিচ্ছেদের সূচনায় দেশবিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে যা বিষয়বস্তু ও ভাবসম্পদের সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ; পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে ; গ্রন্থের ভূমিকায় মল্লিনাথ -তুল্য টীকা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠককে কাহিনীর ভাবকেন্দ্রে পৌঁছাতে সাহায্য করা হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে বহু ক্ষেত্রে নাটকীয় চমক সৃষ্টি ও কবিত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও স্বপ্নের মাধ্যমে অতীত বা অনাগত ঘটনার ছায়াচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচনার সাহায্যে ইতিহাসের আন্তরসত্য বা তাৎপর্য নির্ধারণের প্রয়াস দেখা গেছে। ১ম খণ্ডের ১৭ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ডের ১৫ পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবির কলমে লেখা এই উপন্যাসের বহু ছত্রে কল্পনাকুশলতার পরিচয় মেলে। যেমন - ' আসন ছেড়ে উঠে এসে কান্ড আজ মিলে গিয়েছে কান্ডিতে। এই কথা মনে হতেই নাচের তাল উস্তাল হয়ে ওঠে। বাহুভঙ্গী লাক্ষ্যকুসুম নিঃক্ষেপ করতে থাকে, নর্মদা মর্মরে রচিত উরুর নিটোল ভাস্বরতা দিকে দিকে কামনার ঢেউ তুলে দেয়,

১৫০। লালকেল্লা, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — কথাসাহিত্য, জৈষ্ঠ, ১৩৭১

১৫১। তদেব

১৫২। লালকেল্লা, ১৩৭৮, ভূমিকা।

আর শ্বেদ-মসৃণ হীরক-কঠিন যুগ্ম পয়োধর ঘরের সব আলোটুকু কুড়িয়ে নিয়ে এসে কুচি কুচি করে শূন্যময় ছড়িয়ে দেয় ইন্দ্রচাপচূর'। ১৫০ এছাড়া জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত বহু অর্থঘন, সংক্ষিপ্ত ও সংহত প্রবাদপ্রবচনমূলক মূল্যবান মন্তব্য লেখকের জীবনভূয়িষ্ঠ কবিকল্পনার পরিচয় বহন করে। যেমন 'প্রত্যেক মানুষ একটি প্রদীপ, তবে শিখার সঙ্গে সলতের যোগ না হওয়া পর্যন্ত সে নির্বাপিত'; 'প্রেম পরম্পদী আর কাম আত্মনেপদী'। 'ভালোবাসায় ভয় গিনি সোনার খাদ - ওটুকু আছে বলেই মনে মনে গড়া যায় অলঙ্কার'; 'পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি নারী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার'। 'নারী ও লতা আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না,' 'পারিষদ রাজার দর্পণ'; 'সুপ্তি সিদ্ধান্তের সহচরী' প্রভৃতি। বঙ্কিমের মতো এখানেও কোন ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে অস্তিম মুহূর্তে। যেমন তুলসী ও সুখানন্দের প্রকৃত পরিচয় মিলেছে উপন্যাসের শেষে, চরমতম মুহূর্তে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে অসংখ্য নাটকীয় মুহূর্ত ও পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলি উপন্যাসকে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছে। যেমন বেরিলিতে পাম্মার ঘরের দরজায় জীবন লালের আবির্ভাব এবং বাদীগীর সঙ্গে প্রশ্রয়লাভ, পথে পরিচয় পত্র অপহৃত হওয়া ও কামানে বেঁধে মৃত্যুদন্ডের শেষ মুহূর্তে নব জীবনলাভ ও পরিচয় পত্র পুনরুদ্ধার, মির্জা গালীবের বাড়ী থেকে মেমব্রমে তুলসীকে তুলে নিয়ে যাওয়া, বাড়ী ফেরার পথে আবুবকরের অনুচর কর্তৃক তুলসীকে অপহরণের চেষ্টা, তাদের হাত থেকে পালিয়ে রুমালীর গৃহে তার আশ্রয় গ্রহণ, একটি চিঠির জোরে জীবন লাল কর্তৃক তুলসীকে আবুবকরের কামানল থেকে রক্ষা করা, আহত ঘোড়ার আরোহী হিসাবে নিজের অজান্তে লালকেল্লার দরজার কাছে জীবন লালের আগমন, মানুষ-বাঘ ক্যালিবানের আবিষ্কার, মিস ক্রিফোর্ডের আত্মহত্যা, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর অনুপ সিং এর সঙ্গে সুখানন্দ পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার, সুখানন্দ কর্তৃক তুলসীর প্রকৃত পরিচয়দান, জীবন লালের বিরুদ্ধে রুমালীর সাক্ষ্যদান, রুমালীকে বাঁচানোর জন্য জীবন লালের আত্মসমর্পণ, মৃত্যুর মুহূর্তে দ্বিতীয় বার জীবন লালের জীবনলাভ, খুরশিদের নিগ্রহ ও সরাব মিঞার গুলি নিক্ষেপ, অসহায় তুলসীর শ্রীলতাহানির পূর্বমুহূর্তে আবুবকরের উদ্দেশ্যে জীবন লালের শাসানি, নয়ন চাঁদের হাতে স্বরূপ-রামের প্রাণ বিসর্জন, হডসন সাহেবের হাতে জীবন লালের আকস্মিক মৃত্যু প্রভৃতি আকস্মিকতার মালা গাঁথা নাটকীয় মুহূর্তের আকর্ষণীয় সমাবেশ বলে চিহ্নিত করা যায়।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুক্ষেত্রে অনুসরণ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে প্রমথনাথের পার্থক্যও চোখে পড়ে। কেরী সাহেবের মুনসী গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে তা

উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘরোয়া সাংসারিক জীবনের ছবি যেখানে একেবারেই অনুপস্থিত প্রথমধনাথে সেখানে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ চিত্রের সন্ধান মেলে। বরং বঙ্কিম অপেক্ষা তিনি পাত্র-পাত্রীর হৃদয়সাগরের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে বহু অজানা রহস্য উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও প্রথমধনাথের কৃতিত্ব অসীম। এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি তুলির দু'একটি আঁচড়ে সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের পতনোন্মুখ বাদশাহী ও তার পরনির্ভরতা বা চরম অসহায়তা, শাহজাদাদের নির্বিষ সপের মতো শূন্য গর্ভ আশ্ফালন বা বিলাসিতার স্রোতে নিমজ্জনের চিত্র, বেগম জিনৎমহলের স্বার্থপর সন্তানস্নেহের খাতিরে গোপনে ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ার প্রচেষ্টা, ইংরাজ সেনাপতি আর্চডেল উইলসন বা নিকলসনের সামরিক তৎপরতা ও শৌর্যবীর্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যে লেখকের দক্ষতার পরিচয় মেলে।

অনৈতিহাসিক চরিত্রচিত্রণ ও তৎকালীন পরিবেশ বা জীবনধারা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে সরাব মিত্রার সুখবাদী জীবনদর্শন ও সহজিয়া সুরে সরলকথায় মুখে মুখে গজল রচনার ক্ষমতা বিস্ময়কর। বাদশাহের বিশ্বস্ত পারিষদ ও উর্দু কবি মীর্জা গালিব ও অতীত জীবনের মোহগ্রস্ত, ভ্রান্তপথের পথিক সুখানন্দ পরবর্তী জীবনে যেভাবে প্রায়শ্চিত্তে রত ও অনুশোচনায় কাতর তার ছবিটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নয়নচাঁদের গোয়াতুমি ; স্বরূপরামের হতাশ প্রেমের বেদনা ; গুরবচন সিংহের দাম্পত্যজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা ; রুমালীর দেহসর্বস্বতা এবং শেষ পর্যন্ত তুলসীর প্রতি ঈর্ষা ও জীবনলালের প্রেমে পড়া বা দেহোপজীবিনীর অন্তরে অপরিসীম সমবেদনার ফসুধারা আবিষ্কার ; পন্টনের সপ্রতিভ, সদানন্দ, সক্রিয় ও পরোপকারী মনোভাব ; অনুপ সিং এর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধম্পূর্ণ চরিতার্থতায় আজীবন আত্মসুখ বিসর্জন ও পরিণতিতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পর অনুশোচনা ও আত্মহত্যা ; কুলি খাঁর দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা ; পান্না, খুরশিদ জ্ঞান প্রভৃতি বাঙ্গালীর অন্তরের মহানুভবতা, উদারতা, আতিথেয়তা, উপস্থিতবুদ্ধি, সরস, বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাসপ্রবণতা ; সর্বোপরি নারী সুলভ স্নেহমমতা ; মিস ক্রিফোর্ড এর লজ্জিত জীবনের অকালাবসান ; তার দাদার প্রতিশোধম্পূর্ণ উন্মত্ত বহির্প্রকাশ ; উজির আসানুদ্দা, আকসারি, মখখনলাল প্রভৃতি অজস্র চরিত্রের বিচিত্রমুখী শোভাযাত্রা এই উপন্যাসটিকে অসাধারণ দীপ্তি, ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছে। লেখকের জীবনদর্শনের, জীবনাভিজ্ঞতার ও সহমর্মিতার স্বাক্ষর বহন করে এই চরিত্রগুলি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রণয় কাহিনী এই ঐতিহাসিক দুর্যোগের মধ্যে এক নবতর মাত্রা যোজনা করেছে। তুলসী-জীবনলাল-রুমালীর ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীটি চিন্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

রুমালীর গৃহে ঘটনাক্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে তুলসী। অন্যদিকে মিস এলবিয়নের খোঁজে জীবনলাল এসেছে রুমালীর গৃহে। সেখানেই তুলসী ও জীবনলালের প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রেমের অঙ্কুরোদগম হয়েছে। রাতে জীবনলালের 'মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আনন্দের আভা অস্পষ্ট অথচ একান্ত সত্য'। ১৫৪ অন্যদিকে 'তুলসীও জেগে কাটাচ্ছে। তার মনের মধ্যে কোথা থেকে যেন এক ঝলক আলো এসে পড়েছে, ঝলমল করে উঠেছে সব'। ১৫৫

আবার তুলসী-জীবনলালের প্রেমের বৈদ্যুতী শক্তির তাপে তপ্ত হয়ে উঠেছে শৈরিণী, দেহসর্বস্বা রুমালীর হৃদয়। সে 'দেহের তাপের কথা জানে, তাতে পুড়ে মরেনি, সুবর্ণ বলেই অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু হৃদয়ের তাপ! যাতে ভাব ভাষা পায়, ভাষা ছন্দ পায়, ছন্দ পাখা মেলে দেয় আকাশের চন্দ্র সূর্যের দিকে! একি নতুন, একি বিশ্বয়! ১৫৬

তারপর তুলসী ও জীবন লালের প্রেমে যত গভীরতা এসেছে, ঘটনাপরম্পরায় তারা যত পরম্পরের হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছে, তাদের হৃদয়ে যত বেশী প্রেমের আলো জ্বলে উঠেছে, রুমালী সেসব দেখে ও উপলব্ধি করে তত বেশী ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছে এবং তুলসীর কাছ থেকে জীবনলালকে ছিনিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে চেয়েছে। প্রথমে তার প্রাপ্তি অভ্যস্ত দেহজ কামনার মধ্যে সীমিত থাকলেও পরে তা দেহের তটরেখা ছাড়িয়ে হৃদয়ের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়েছে। ঔদ্ধত্য পরিণত হয়েছে আত্মসমর্পণে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রুমালী ও তুলসীর প্রেমচেতনা ও মানসিকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক তার সুনির্বাচিত শব্দ সহযোগে ও গভীর অনুভূতির সাহায্যে দুটি প্রেমিকার স্বাতন্ত্র্য সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'রুমালী ভাবে জীবনকে আমার চাই-ই। তুলসী ভাবে জীবন কি কখনো আমাকে নেবে? রুমালীর প্রেম পাহাড়ী বন্যা, ভাসিয়ে নিতে চায়। তুলসীর প্রেম পাহাড়তলীর সরোবর, ভরিয়ে দিতে চায়। রুমালীর প্রেমে তৃষ্ণা বাড়ে। তুলসীর প্রেমে তৃষ্ণার নিবারণ'। ১৫৭

কিন্তু মানব প্রকৃতি বড় অদ্ভুত, বড় রহস্যময়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিনী হলেও তুলসীকে আবুবকরের কামনার গ্রাস থেকে রক্ষা করতে রুমালী উদ্যোগ নেয়। আবার জীবনলাল যখন গভীর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তুলসীকে উদ্ধার করে তখন সে ঈর্ষাশরে জর্জরিত হয়। তুলসীর বাড়ীতে যেয়ে ঝগড়া করে এবং জীবনের উপর নিজের প্রভুত্ব

১৫৪। তদেব-পৃঃ ২৮৫

১৫৫। তদেব পৃঃ ২৮৬

১৫৬। তদেব পৃঃ ২৮৮

১৫৭। তদেব পৃঃ ৩৫০

কায়েম করতে অধিকতর যত্ন নেয়। রুমালীকে লেখক উবশীর সঙ্গে এবং তুলসীকে লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সেইভাবেই দুটি চরিত্র চিত্রিত হয়েছে।

তারপর ঘটনার ঘটপ্রতিঘাতে রুমালী তার ঈজিত প্রণয়ীকে একান্তভাবে লাভ করতে না পেরে এবং তুলসীর উপর প্রতিশোধ নিতে প্রকাশ্য দরবারে জীবনলালের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে এবং পরক্ষণেই জীবনলালের বিপদ হবে জেনে তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন তথ্য দিতে অস্বীকার করেছে।

জীবনলালের চরিত্রে ইংরাজ নাইটদের শৌর্যবীর্য, সংসাহস, নারীসন্ত্রম রক্ষার প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই নিজের বিপদ জেনেও এবং রুমালীর চরিত্র জেনেও সে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব স্বীকার করেছে শুধু রুমালীকে বিপদ মুক্ত করতে। এইভাবে ঘটনার টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত জীবনলাল মৃত্যু-পথ থেকে ফিরে এলেও এবং তুলসীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর অঙ্গুলি সঙ্কেতে মিলনের মুহূর্তে বিরহের নিদারুণ রাগিনী বেজে উঠেছে। দুর্ভাগ্যের জটিল ও দুর্মোচ্য গ্রহি ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে পিতৃপ্রদত্ত রূপার ভক্তি থেকে জীবনলালের প্রতি তার পিতার অনুশাসন। কুসুম থেকে বেরিয়ে পড়েছে বিষাক্ত কীট। সুখানন্দের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী না করার সেই পিত্রাদেশ নিয়ে তুলসী ও জীবন উভয়ের জীবনে চরম সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। এ দিকে দুর্ভাগ্যক্রমে সুখানন্দের মৃত্যু ঘটেছে। মুমূর্ষু সুখানন্দ শেষ মুহূর্তে সমস্যার জটিল জাল ছিন্ন করলেও, বিবাহের বাধা অপসারিত হলেও, জীবনলালের আকস্মিক মৃত্যু এই প্রেমের স্বপ্নসৌধকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আর মৃত জীবনলালকে দেখে উন্মাদিনীপ্রায় রুমালী স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিয়েছে - 'জীবিত না হোক মৃত অবস্থায় রুমালীর মিলন ঘটলো জীবনলালের সঙ্গে'।^{১৫৮} কিন্তু জীবনলালের মৃত্যু সংবাদ তখনও পৌঁছায়নি তুলসীর কাছে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত জীবন আসবে এই আশায় বুক বেঁধে অসীম প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে তুলসী। তার দুঃখ-দীর্ঘ জীবনের অমানিশা প্রভাত হবে, তার সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে, জীবনলালের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে সে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। তার প্রেমের কুঁড়ি বিবাহের কুসুমে রূপায়িত হবে এই আনন্দ শিহরণ যখন তাকে অন্তরে পুলকিত করছে তখন সেই চরমতম মুহূর্তে তার জন্য চরম দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসছে গুরুবচন। জীবনের প্রতি আসক্তি, জীবনের জন্য প্রতীক্ষা মৃত্যুর দুঃসংবাদে অচিরেই চরম ট্রাজেডিতে পরিণত হতে চলেছে। 'এবারে তুলসী আর পান্না পদশব্দ শোনার সঙ্গে দেখতে পায় একটি মনুষ্য মূর্তির খসড়া। দুজনে আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। . . . দুজনের প্রতীক্ষা আর বাঁধ মানতে চায় না। পদশব্দ ও মনুষ্যমূর্তি ক্রমেই নিকটতর

হচ্ছে '। ১৫৯ দমকা বাতাস আসছে, ক্ষীণপ্রাণ আশার বাতি অচিরেই নিভে যাবে। এইভাবে ' লালকেল্লা ' উপন্যাসটি একটি অসামান্য ট্রাজেডি হয়ে উঠেছে।

যুগজীবন যাত্রার সজীব চিত্রাঙ্কনে লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লেখক এখানে তথ্যের নির্যাসটুকু অবলম্বনে স্বীয় মরমী কবি কল্পনার ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে এক বৃহত্তর সত্যে ও মহত্তর সাহিত্যিক সৌন্দর্যে পরিণত করেছেন। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক নাম-রূপের আড়ালে লালকেল্লার যে সজীব, সক্রিয়, কলকোলাহল মুখরিত জীবন যাত্রার ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার গুরুত্ব ও কৃতিত্ব অসাধারণ। পাঠক যেন কালের উজ্জান বেয়ে স্মৃতির তরণী চেপে উনবিংশ শতকের অন্তায়মান মুঘল সম্রাটের দরবারে হাজির হয়। এবং কল্পোলিত যমুনা বিধৌত বিশাল লালকেল্লার অতীত জীবন ধারার সজীব স্রোতে অবগাহন করে ও পুণ্যতোয়া জলধারা পান করে জীবন তৃষ্ণা নিবারণ করে, নব জীবনের স্বাদ লাভ করে পুলকিত হয়। ইতিহাস নয়, ' ঐতিহাসিক রসকে ' হেঁকে নিয়ে লেখক ' উপন্যাসিক জীবনরসে ' জারিয়ে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকে অসামান্য শিল্পরূপে পরিণত করেছেন।

বিপুল সুদূর ভূমি যে:— [১৯৬৮] এই বইখানি ঐতিহাসিক বললে ভুল বলা হবে বরং প্রাগৈতিহাসিক আখ্যাই উপযুক্ত। অন্ততঃ কাহিনী বিচারে তাই মনে হয়। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক মানসিকতার ছায়াপাত ঘটেছে। সূচনায় লেখক বলেছেন ' আদিম মানুষ ছিল যাযাবর। সেই আদিম জগতের প্রান্তে কোথায় কিভাবে দেখা দিল একটু-খানি শস্য। সেই শস্যের টানে ভ্রাম্যমান মানুষ মাটির সঙ্গে আবদ্ধ হল, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করলো। যাযাবর মানুষ শত্রু বলে গণ্য করলো কৃষিজীবিকে। তখন দুইজনে আরম্ভ হল যুদ্ধ। তারপর প্রেমের সূত্রে এই দুইজনে যোগাযোগ ঘটলো। সে আজ কতদিনের কথা। '

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এক আদিম যাযাবর শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আদিম কৃষিজীবী মানুষের সংঘর্ষের ও সমন্বয়ের কাহিনী এটি। এই দুই দল পরস্পরের মহাশত্রু। একদলের আরাধ্যা মৃত্তিকা দেবী, আর এক দলের আরাধ্যা অরণ্যদেব। উভয়েরই প্রধান বাহন অশ্ব। একদলের মানুষদের নাম তাই পশু দিয়ে যেমন - বাইসন, হরিণ, ঘোঁষা, ভল্লুক, আর একদলের নাম বৃক্ষ ও লতা দিয়ে। যেমন - শাল, মহাশাল, সরল, পুন্নাগ, শাপলা, কলমী প্রভৃতি।

ঘটনাচক্রে যাযাবর সম্প্রদায়ের যুবক ' হরিণের ' সঙ্গে পরিচয় হল ফসল পণ্ডনের যুবতী ' শাপলার '। পরিচয় পরিণত হল প্রণয়ে। হরিণ শত্রু হস্তে বন্দী হলে শাপলাই

তাকে মুক্ত করে দেয়, কিন্তু সে নিজে বিপদে পড়ে। শত্রুকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে তাকে বদ্ধ করে রাখা হয় মুক্তিকা দেবীর কাছে বলি দেওয়ার জন্য। কিন্তু উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাঁধলে বিশৃঙ্খলার মধ্যে হরিণ শাপলাকে মুক্ত করে অস্থপৃষ্ঠে পলায়ন করে। শাপলার সখী ও প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল কলমী। সে আজন্ম বঞ্চিতা, ফলে ক্রুদ্ধা ও ক্ষুধা। প্রতিশোধ গ্রহণে সদা তৎপর কলমী পলায়নপর শাপলাকে হরিণের অজান্তে পিছন দিক থেকে শরবিদ্ধ করে এবং শাপলার প্রাণান্ত হয়। তারপর শাপলার শোকে উন্মাদবৎ হরিণ শাপলার স্মৃতিকে স্বীয় সন্ডায় ওতপ্রোত করে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকে। একদিন সেখানে আসে কলমী। কলমীকে শাপলার সখী জেনে হরিণ সাদরে গ্রহণ করে। কলমী আশ্রয় চেষ্টা করে শাপলার প্রতি তার বিদ্বেষ গোপন করতে এবং শাপলার প্রতি হরিণের প্রেমকে বিলীন করে দিতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সে অন্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে। এরপর আবির্ভাব ঘটে ফসল পত্তনের আর এক পুরুষ পুন্নাগের যে একদা শাপলার প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং শাপলার হত্যাকারী যে কলমী এ বিষয়ে একমাত্র সাক্ষী ছিল। এইভাবে অদৃষ্টের নির্মম অঙ্গুলি সংকেতে একটি মৃত নারীকে কেন্দ্র করে তিনটি নরনারী যেভাবে প্রেম, হিংসা ও কামনার কুটিল জালে জড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমশঃ নিজেদের জীবনকে পারস্পরিক সংশয়ের কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও জটিলতর করে তুলেছে তারই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও কুশলী, ব্যক্তনাগর্ভ বর্ণনা উপন্যাসটির গুরুত্ব ও মূল্য বাড়িয়েছে।

মোট তিনটি অধ্যায়ে কাহিনীটি সমাপ্ত। শাপলা প্রথম অধ্যায়েই মারা গেছে। তবুও সেই নায়িকা। কলমী উপনায়িকা। নায়ক হরিণ, উপনায়ক পুন্নাগ। স্বল্প কয়েকটি চরিত্রকে অবলম্বন করে কুশলী শিল্পী প্রমথনাথ তাদের মনোরাজ্যের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রের উপরই লেখকের সহানুভূতি সমান। শাপলা মৃত্যুর পরেও যেভাবে কাহিনীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তাতে লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। কারণ কোথাও অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত মনে হয় না। তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম যাযাবর মানুষের মধ্যে একটি নারীকে অল্প সময়ের মধ্যে ভালোবেসে প্রায় সারাজীবন সেই প্রেমে বেগানা হয়ে যাওয়া খানিকটা অতিনাটকীয় মনে হয়।

সবচেয়ে সজীব ও বাস্তব চরিত্র কলমী। শৈশব থেকেই সে বিভিন্নভাবে সমাজ-সংসারে বঞ্চিত হয়েছে। তার বাসনা অচরিতার্থ রয়ে গেছে। বহুজনের কাছে অবহেলিতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছে। কিন্তু সে ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করার মেয়ে নয়। দুর্গমের দুর্গ হতে ছলে বলে কৌশলে ঈর্ষিতাকে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর সে। তাই শাপলার সৌভাগ্যে সে ঈর্ষান্বিত হয়েছে - তার আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে সে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত শাপলার প্রণয়ী হরিণকে জীবনসঙ্গী করে ঘর-সংসার করেছে। কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করে ফিরেছে। কিছুদিন পরে জুটেছে

তারই পূর্বপরিচিত ও দুষ্কার্যের সাক্ষী পূন্নাগ। ফলে প্রতি মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় ও হিংসা-হিংস্রতায় জ্বলে পুড়ে মরেছে সে। জননী হয়েও তার জীবনে শান্তি আসেনি। শেষ মুহূর্তে যখন তার স্বরূপ উপলব্ধি করে হরিণ কলমীকে পিশাচী বলে চিহ্নিত করেছে তখন সে তার নিজ জীবনের বঞ্চনার ইতিকথা ব্যক্ত করেছে - 'তবে শোনো হরিণ, আমি পিশাচী নই, আমি ক্ষুধার্ত, ভাগ্যহত নারী। বহু পুরুষের অবজ্ঞার ভারে আমি পীড়িত, বহু নারীর ঝিকারের ভারে আমি উত্তেজিত, দুর্জয় অদৃষ্টের নির্ভর বিচারের ভারে আমি লাক্ষিত। বাল্যকাল থেকে কেউ আমাকে আদর-যত্ন করেনি, একবিন্দু স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম কখনো লাভ করিনি। তবে আমি কেন পিশাচী না হবো? কেন আমি প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হত্যা না করবো?' প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ মোটামুটি ঠিক থাকলেও তাদের ভাষা, আত্মবিশ্লেষণ ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্ট আধুনিক যুগমানসের ছায়াপাতে নূতন মাত্রা লাভ করেছে।

শেষ পর্যন্ত বনের হরিণ বনেই ফিরে গেছে। কলমী হরিণের শরে নিহত হয়েছে। মেয়েটি নির্জনে, বিশাল প্রান্তরে একাকিনী পরিত্যক্ত হয়েছে, বনচারী যাযাবর ও শস্যপ্রিয় গৃহস্থের মধ্যে মিলনসেতু রচিত হলেও পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার আগেই দুজনে দুদিকে ছিটকে গেছে। প্রকৃতির সন্তান সুদুর্গম প্রকৃতির বুকে আবার ফিরে গেছে যে প্রকৃতি বিশাল, বিপুল ও সুদূর, যার অন্তহীন দিগদিগন্ত অনাদিকাল ধরে ক্রমপ্রসারিত।

ব্যঙ্গ উপন্যাস :

মহামতি রাম ফাঁসুড়ে :— প্রকাশ কাল অনুল্লিখিত। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। প্র. না. বি. ছদ্মনামে লিখিত। উৎসর্গপত্রে লিখিত আছে - 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণের হস্তে সভয়ে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম। তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে।'

১৩৬৭ সালে প্রকাশিত 'গল্প পঞ্চাশৎ' নামক গল্প-সংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে'কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় লেখক এটিকে যথার্থ উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চাননি। বরং তুলনামূলক ভাবে গল্পের সঙ্গেই এর স্বাজাত্য ও সাদৃশ্য বেশী। তবে ঠিক ছোটগল্প ও একে বলা যায় না। বন্ধিমচন্দ্রের রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় প্রভৃতির মত একটি বড় গল্প আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

খাঁটি বাঙালী ও স্বদেশ প্রেমিক প্রমথনাথ বাঙালী জাতির তদানীন্তন অবক্ষয় দেখে ও ভবিষ্যতের শোচনীয় দূর্দশা কল্পনা করে অতীব ব্যথিত হয়েছিলেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই কাহিনীতে নিপুণ, তীক্ষ্ণ, সরস ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপের মাধ্যমে। বাঙালী যে কত দ্রুত অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে তারই সর্বগ্রাসী ও বিশ্বংসী চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ১৯ শতকের শুরু থেকেই এই ক্ষয় কার্য দেখা

দিয়েছে। বাঙালী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে; ঠগ, ঠাঙ্গাড়ে ফাঁসুড়ে, প্রভৃতি বৃত্তির স্তর পার হয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, চিকিৎসা, শিক্ষকতা, ওকালতি সর্বত্রই বাঙালী নিজেকে ও জাতিকে ধ্বংস করার কাজে অতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রূপে সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে চলেছে। সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই একাজে প্রধান উদ্যোগী।

মহামতি রামলোচন চক্রবর্তী সেই শিক্ষিত ও আত্মধ্বংসী বাঙালীদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। তিনি বেদান্তবাগীশ, শঙ্করভাষ্যে সুপণ্ডিত, তুলসী দাসী দৌহার রসজ্ঞ। আসলে তিনি জ্ঞানপাপী। নিজের সুবিধামতো শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে তিনি সমস্ত অন্যায় কাজের সমর্থন পেয়েছেন। তাই গুরুহত্যা, গোহত্যা, সমব্যবসায়ী হত্যা [ঝগড়ু মাঝি] তার বিবেকবোধ বিচলিত করে না। পিতা বা স্ত্রীর মৃত্যু তার মনে কোন ক্রেশ জন্মায় না। তার সবতুল্যলিত হিংসাবীজ থেকে ভবিষ্যতে যে বিষবৃক্ষ জন্মাবে তাতে সমস্ত বাঙালী সমাজ ও বাংলাদেশ বিষে জর্জরিত হবে জেনে সে বিশেষভাবে পুলকিত হয়। এককথায় বাঙালী নিজেই সচেতন ভাবে নিজের ও সমগ্র জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে এবং নিজের এই সাফল্যে বিশেষভাবে উল্লসিত হয়। বাঙালী চরিত্রের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই এই গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র মহামতি রাম ফাঁসুড়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। লেখকের ভাষায় 'এই তোমার ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। মুখ এখানে বিদ্বান, গুণ্ডা এখানে নায়ক, শঠ এখানে সাধু, চোর এখানে সজ্জন, লম্পট এখানে আদর্শ, ধান্নাবাজ এখানে বান্ধব, মাতাল এখানে সংযমী, অর্থপুস্তক লেখক এখানে পণ্ডিত, রাম ফাঁসুড়ের প্রভাবে এখানে অবিরাম ফাঁসুড়ে আর এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ল্যাং মারিতে উদ্যত'।^{১৬০} তাই তিনি বলেন 'আত্মঘাতী বুদ্ধির ইতিহাসই বাংলাদেশের ইতিহাস'।^{১৬১}

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপসংহারের অনুসরণে প্র. না. বি. এখানেও উপসংহারে বলেছেন — 'এখন এই কাহিনী পড়িয়া এদেশের ঘরে ঘরে রামফাঁসুড়ে জন্ম গ্রহণ করুক ইহাই দীন গ্রন্থকারের আশা'।^{১৬২}

এটি যে যথার্থ উপন্যাস নয় তার অনেক প্রমাণ গ্রন্থটিতে বিদ্যমান। যেমন - উপন্যাসের উপসংহারে একটি মজাদার, পরিহাসমিশ্রিত, পয়্যারে রচিত ২২ ছত্রের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া কাহিনীর সংহতি, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বা কোন ঔপন্যাসিক জীবনদর্শনও পরিস্ফুট হয়নি। তবে ১৮ শ - ১৯ শ শতকের বাংলাদেশের ফাঁসুড়ে ও ঠাঙ্গাড়ে বাহিনীর জীবনযাত্রা, চাল-চলন, গতি-প্রকৃতি এবং

১৬০।	মহামতি রাম ফাঁসুড়ে - প্র. না. বি.	পৃঃ ১০০।
১৬১।	তদেব	পৃঃ ১০৩।
১৬২।	তদেব	পৃঃ ১০৪।

সমাজে তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য দলিলরূপে এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। অতিরিক্ত ব্যঙ্গের প্রাধান্য থাকতে গ্রন্থের শেষের দিকে কাহিনীর গতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং ফলতঃ গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মোটকথা কথা সাহিত্যিক প্রমথনাথের সৃজনী প্রতিভার যথার্থ পরিচয় এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। তুলনামূলক ভাবে ব্যঙ্গশিল্পী প্রমথনাথের কঠোর ব্যঙ্গপ্রবণ ও তীক্ষ্ণধী মূর্তিটিই বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে বাঙালী জাতির দুঃখ, দুর্দশা ও অবক্ষয়ে ব্যথিতচিত্ত প্রমথনাথের সহানুভূতি ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস এই গ্রন্থটিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

রহস্যোপন্যাস : রহস্যজনক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা বা কাহিনী চিরকালই মানুষের কাছে অতীব প্রিয়। রহস্যোপন্যাসে সাধারণতঃ উপজীব্য বিষয় হিসাবে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ষড়যন্ত্র, দুর্কাহ অভিযান প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের উপন্যাস পাঠকমনে সুতীর কৌতুহল জাগ্রত করে। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং আপাতদৃষ্টিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক হীনতায় পাঠক বিস্মিত বা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার অনভ্যস্ত সন্দেহ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পাত্র পাত্রীর উপরই সংশয় জাল নিক্ষেপ করে। পরিণামে যখন রহস্যের সমাধান হয় তখন পাঠক বোকা বনে যায়। এক পরম রমণীয় বোকামীর মধ্যে সে লক্ষ্য করে যে নিতান্ত সাদামাটা, নিরীহ, সহজ, সরল একটি সূত্রের মধ্যেই রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত নিহিত ছিল।

প্রচলিত গোয়েন্দা কাহিনী বা রহস্যোপন্যাসে সাধারণতঃ সস্তা জনপ্রিয়তা ও সাময়িক উত্তেজনার খোরাক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এগুলি অচিরকালের মধ্যেই পুরাতন হয়ে পড়ে বা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। 'দস্যু মোহন' সিরিজের গল্পগুলি এই শ্রেণীর। কিন্তু কোন কোন শক্তিশালী, সৃষ্টিশীল লেখকের হাতে গোয়েন্দা কাহিনী চিরকালীন সাহিত্যের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস বা ডঃ ওয়াটসনকে পাঠক কোনদিন ভুলতে পারবে না, তেমনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বা সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় চরিত্র। এরা শিক্ষিত ও রুচিশীল পাঠকের বিশেষ প্রিয় পাত্র। একদিক থেকে সাধারণ উপন্যাস-রচয়িতার চেয়ে গোয়েন্দা উপন্যাস-রচয়িতার কর্তব্য অনেক দুরূহ। কারণ গোয়েন্দা উপন্যাসে উত্তেজক ও কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী রচনার দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শুধু বোমা, পিস্তল, চুরি, জীপ, পুলিশ, হত্যা, মারামারি নিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। সমুচ্চ কল্পনাশক্তি ও অসাধারণ শৈল্পিকগুণ না থাকলে দৃঢ়-সম্মিলিত গোয়েন্দাকাহিনী রচনা সম্ভব নয়। বুদ্ধির খেলায় বুদ্ধিমান পাঠককে হারিয়ে দিয়ে শুধু জমজমাট কাহিনী রচনা করলেই উপন্যাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যথাযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি

করাও তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তা না হলে রহস্যোপন্যাসে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া সম্ভব হয় না বা তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে না।

বর্তমান রহস্যোপন্যাসের যে রূপের সঙ্গে আধুনিক পাঠক পরিচিত তার প্রথম সূত্রপাত করেন বিখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা উপন্যাসিক এডগার এলান পো। ইংল্যান্ডে প্রথম সার্থক রহস্যোপন্যাসের ধারা প্রবর্তন করেন আর্থার কোনান ডয়েল। তাঁর অমর সৃষ্টি শার্লক হোমস ইংরাজী তথা বিশ্বসাহিত্যে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, অদ্রীশ বর্ধন, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি রহস্যোপন্যাস রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রহস্যোপন্যাস দু প্রকারের [১] ঘটনাপ্রধান এবং [২] বিশ্লেষণাত্মক। ঘটনাপ্রধান রহস্যোপন্যাসে লেখক পরপর কতকগুলি ঘটনার জাল বুনে আখ্যানকে রহস্যময় করে তোলেন। তারপর একটু একটু করে সেই সব রহস্যের জট খুলে সমাধান এনে দেন। গল্প পরিসমাপ্তির আগেই পাঠক-মনের সব প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়ে থাকেন। এই উত্তর লেখক নিজস্ব বর্ণনায় বা সত্যসঙ্কানীর মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকেন।

বিশ্লেষণাত্মক রহস্যোপন্যাসে চরিত্রগুলির কর্মধারা ও চিন্তা-চেতনার কুশলী বিশ্লেষণপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। দুঃস্বপ্নকার্যের সঙ্গে জড়িত দুঃস্থ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবনযাপনের রীতি ও পরিবেশ এককথায় তাদের অন্যায় কার্যের মূল কারণগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়। ঘটনা বাহুল্যের পরিবর্তে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সাংকেতিকতার আশ্রয় গৃহীত হয়।

আর্থার কোনান ডয়েল বুদ্ধিগাহ্য, যুক্তিনির্ভর, ঘটনাপ্রধান রহস্যোপন্যাস সৃষ্টিতে এবং আগাথা ক্রিস্টি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। প্রমথনাথ এই ধারার মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন তার একমাত্র রহস্যোপন্যাস শাহী শিরোপাতে।

শাহী শিরোপা [১৩৭৬] : তাহেরগঞ্জের রাজা বাহাদুর, দেওয়ানজী ও রাজার দত্তক পুত্র পঞ্চাননকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থে রহস্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রদত্ত একটি মোতির মালা দীর্ঘদিন ধরে তাহেরগঞ্জের রাজপরিবারের সুনাম ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে এসেছে। সেই 'শাহী শিরোপা' নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্যের গ্রন্থি রচিত হয়েছে। তারপর পঞ্চাননের দুই বন্ধু জগবন্ধু ও অনির্বানের তৎপরতা বিশেষতঃ অনির্বানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে স্বয়ং রাজা বাহাদুরই বংশগৌরব অম্লান রাখার তাগিদে এবং বংশনাশের আশঙ্কায় হারটি গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখেন। লেখক অনির্বানের মুখ দিয়ে রাজা বাহাদুরের সচেতন মন ও অচেতন মনের বিপরীতমুখী স্বন্দ-সংঘাত এবং একই মানুষের দ্বিমুখী আচার-আচরণ দক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের মতো বিশ্লেষণ-কুশলতায়

সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন - 'জানোতো যে মানুষের মনের দুটো অংশ, একটা জাগ্রত চৈতন্য, আর একটা মগ্ন চৈতন্য। একটাকে বলতে পারি চৈতন্যের উপরতলা, আর একটা নীচের তলা। . . . লোকে রায়বাহাদুরকে মনে করিয়ে দিয়েছে দণ্ডক গ্রহণ না করতে, তা হলে মোতির মালা চলে যাবে রক্তান্তরে। জাগ্রত চৈতন্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তার পরেই আরম্ভ হয়েছে মগ্ন চৈতন্যের লীলা। . . . জাগ্রত চৈতন্যে রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে সত্যি ভালোবাসে আর মগ্ন চৈতন্যে তাকে পরম শত্রু বলে মনে করে'। ১৬০

কাহিনীটিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য চরিত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ, উদ্দেশ্য ও স্বাধসিদ্ধির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে সর্বদাই মনে হয়েছে রাজার প্রায় সমবয়স্ক, আকৃতি প্রকৃতিতে প্রবল সাদৃশ্যযুক্ত নিজেরই পিসতুতো ভাই, রাজ্যের দেওয়ান সাহেবই মালাটি সরিয়েছেন। কিন্তু রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হলে দেখা গেল দেওয়ান নয়, রাজা বাহাদুরই স্বয়ং সেটি হাতসাফাই করেছেন। কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ বিশেষ মানসিকতায় এই বৃদ্ধ রাজা বংশগৌরব রক্ষার মোহে এই অন্যায়কার্যে লিপ্ত হয়েছেন লেখক তার অনুপূঙ্ক বিশ্লেষণ করে বাংলা রহস্যোপন্যাসে এক নূতন মাত্রা ও নবতর সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

পৌরাণিক উপন্যাস : পুরাণকাহিনী বা কোন বিখ্যাত প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থভূক্ত কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাসকে আপাত বিচারে পৌরাণিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যায়। এই ধরনের উপন্যাসে পৌরাণিক নাটকের মতো ভক্তিবাদ অলৌকিকতা, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন একমুখী চরিত্র, মিলনান্ত পরিণতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করাই বিষয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আধুনিক যুগপরিবেশে আধুনিক মনস্ক লেখকের পক্ষে আক্ষরিক অর্থে পৌরাণিক উপন্যাস রচনা সম্ভবপর নয়। কাজেই এক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতোই যুগচৈতন্যের প্রক্ষেপ ঘটাই স্বাভাবিক। সেই কারণে পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও কাহিনী বা চরিত্রকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে যে অর্থে ঐতিহাসিক রস ও মানবরসের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভরশীল সেই অর্থে পৌরাণিক উপন্যাসের সার্থকতার মর্মমূলে রস সঞ্চার করে পৌরাণিক রস ও শাস্ত্রত মানবিক রস। পুরাণকে বৃহত্তর অর্থে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ধরলে পৌরাণিক উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করে নিলে বিশেষ দোষাবহ হয় বলে মনে হয় না। পুরাণ কল্পনার রসসিদ্ধ ইতিহাস।

আসল কথা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যাই হোক না কেন মূলতঃ কোন কাহিনীকে যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ সাহিত্যশিল্প তথা জীবনের

প্রতিচ্ছবি বা মানবিক সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার আধার হয়ে ওঠাই যে কোন উপন্যাসের প্রধান শর্ত। ইতিহাস বা পুরাণ সেখানে গৌণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রমথনাথ বিশীর পূর্ণাবতার গ্রন্থখানি বিচার্য।

পূর্ণাবতার [১৯৭২] : গ্রন্থটির মস্তব্য অংশে কোথাও পূর্ণাবতারকে পৌরাণিক উপন্যাস বলা হয়নি। শুধু বলা আছে - 'বলাবাহুল্য উপন্যাসখানির বীজ মহাভারত থেকে গৃহীত। তৎসত্ত্বেও আশা করি বর্তমান ভারতেও এর প্রযোজ্যতা লোপ পায়নি'।^{১৬৪} বর্তমান যুগের আধুনিক মনের লেখক উপন্যাসটিতে প্রাচীন যুগের পান পাতে আধুনিক যুগের জীবন রস পরিবেশন করতে চেয়েছেন। এ যুগের সমালোচকের ভাষায় - 'এটি পৌরাণিক উপন্যাস নয়; আধুনিক উপন্যাস। পুরাণের বিশাল পটখানাকে লেখক ব্যবহার করেছেন আধুনিক মানুষের সমস্যাকে রূপ দেবার জন্য। আসলে যা সত্যকারের আধুনিক তা চিরন্তন'।^{১৬৫}

পূর্ণাবতারের মূল কাহিনী মহাভারতের মুষল পর্ব থেকে সংগৃহীত। জরাব্যাদ কড়ক শ্রীকৃষ্ণ হত্যার ঘটনা দিয়েই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুতপ্ত, পাপবোধে আক্রান্ত এই জরার মানসিক দ্বন্দ্ব, পদে পদে, পলে পলে অনুশোচনার আওনে দ্বন্দ্ব হয়ে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আন্তরিক আকৃতি, পরিণামে তার নৈতিক পুণর্জন্ম এবং তারই প্রেক্ষাপটে জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এই উপন্যাসটিকে অসাধারণ শিল্পসৌন্দর্যে ও মানব মহিমায় ভূষিত করেছে।

গ্রন্থটি পাঁচখন্ডে সম্পূর্ণ। অধ্যায় সংখ্যা যথাক্রমে ১১, ১৪, ১২, ১২, ৯। দুটি বাদে সবকটি অধ্যায় চলিত ভাষায় লিখিত। দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়ঙ্কর রূপবর্ণনা এবং দশম অধ্যায়ে সামুদ্রিক প্রাবনে দ্বারকাপুরীর বিধ্বংসী, গভীর ও সমুন্নত বর্ণনার বাহন হিসাবে সাধুভাষাকে নির্বাচিত করেছেন লেখক। একই উপন্যাসের মধ্যে বউবোর গুরুত্বের উপর নির্ভর করে যে সাধু ও চলিত ভাষা প্রয়োগের বিশেষ সার্থকতা আছে তা চলনবিল উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও লেখক সার্থকভাবে পরীক্ষা ও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

জরার বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার সূত্রে গ্রথিত এই উপন্যাসের কাহিনী। পথের প্রান্তে তার ঈগ্লিত বস্তুর সন্ধান মিললেও পথের দুধার থেকে সে কম মূল্যবান অভিজ্ঞতা সম্পদ লাভ করেনি। তার সহজ, সরল, অশিক্ষিত, অসভ্য, বন্য জীবন চলেছিল প্রচলিত গতিতে। অকস্মাৎ হরিণরূপে বসুদেব-নন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে শরাঘাতে নিহত করে তার জীবনধারায় নূতন গতিসঞ্চার হল। চিরাদ্যন্ত গতি অতিক্রম করে

১৬৪। পূর্ণাবতার - মস্তব্য অংশ

১৬৫। কালের প্রতিমা - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২০৪

কঠোর বাস্তব জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পহার হাতছানিতে ঘর ছাড়ল সে। স্বী
জরতীকে অর্ধমৃত করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দেব বিদ্রোহী, বুদ্ধি ও সাহস সর্বস্ব খটাশের
হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে সে। ক্রমে দুঃখ ও সুখের পরস্পর বিরুদ্ধ অভিঘাতে নবনব
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে শুরু হয় তার পথ চলা।

একদিকে বাসুদেবকে ভগবান বলে স্বীকার না করার চেষ্টা, অন্যদিকে তাকে
হত্যার ফলে আত্মগ্নানি ; একদিকে সুখভোগ, রাজানুকূল্য, জনপ্রিয়তার হাতছানি,
অন্যদিকে পাপ থেকে মুক্তির আর্তি তাকে দোটানার মধ্যে ফেলেছে। কখনো সে
আত্মপক্ষ সমর্থনে ভাবে - ' বাসুদেবকে হত্যার দায়িত্ব তার নয়। সত্য বটে তার
নিষ্কিন্তু তীর তার মৃত্যুর কারণ, কিন্তু তার দায়িত্ব কতখানি ? জঙ্গলের মধ্যে এসে মানুষ
অযথা শুয়ে থাকবে কেন ? বিশেষ যে মানুষ বুনো নয়, জংলী নয়, সে কেন আগাছার
মধ্যে শুয়ে থাকতে যাবে ! হরিণ ভেবেই তীর ছুঁড়েছিল, তা যদি মানুষের গায়ে লাগে
তবে সে দায়ী হতে যাবে কেন '।^{১৬৬} আবার কখনো অনুতাপানলে সে তিলে তিলে
দক্ষ হতে থাকে, মুক্তির জন্য ছটফট করে - ' সে আত্নাদ করে উঠল - বাসুদেব
বাসুদেব, রক্ষা করো। তোমার হত্যাকারীকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারো।
বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব '।^{১৬৭}

এই মুক্তির আকুতিতে দিগ দিগন্তে ছুটে বেড়িয়েছে সে। বার বার বিভিন্ন সাধু,
ঋষি, পুণ্যলোভী মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করেছে মুক্তির সন্ধান - ' জরা পথে পথে
চলছে, কখনো উপত্যকা, কখনো অধিত্যকা, কখনো প্রান্তর, কখনো কান্ডার। কখনো
উৎরাই, কখনো জনপদ, কখনো নির্জন, এমন কত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। বেইশভাবে
আপন মনে চলেছে তো চলেইছে। তবে দৃশ্যপট যেমনি হোক মুখে তার এক বুলি,
আমি পাপী আমার কি গতি হবে, পাপীর কি মুক্তি নেই '।^{১৬৮}

প্রমথনাথ বিশী আধুনিক জীবনের মরমী রূপকার। তাই জরার অপরাধী ও
অনুতপ্ত মনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং দুর্গম হৃদয়-দুর্গের রহস্য
উন্মোচন করে পাঠককে বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় অভিভূত করেছেন তিনি। ডস্টয়েভস্কির
'ক্রুইম এন্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে নায়ক রাসকলনিকভ যেমন এক বৃদ্ধাকে খুন করে
অনুতাপ, আত্মগ্নানি, ও আত্মবিশ্লেষণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা-শুদ্ধ
আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছেছে, এখানেও তেমনি নায়ক জরা ব্যাধের মনোরাজ্যের গহনে ডুব
দিয়ে লেখক তার হৃদয় নিংড়ানো যন্ত্রণার স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। বারবণিতা

১৬৬।	পূর্ণাবতার	পৃঃ	১৭৫
১৬৭।	তদেব -	পৃঃ	২৭১।
১৬৮।	তদেব -	পৃঃ	২৪৪।

সোনিয়ার মতো এই উপন্যাসেও পন্যানারী মদিরার সহানুভূতি ও ভালোবাসা জরাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। লেখকের কুশলী বিশ্লেষণশক্তির ফলে জরার গোপন হৃদয়ানুভূতি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে- 'পাপ আর দুঃখ, মুক্তি আর সদগতি প্রভৃতি দুষ্টিস্তার দোলাতে দুলতে দুলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকবার আত্মহত্যা করে সমস্ত সমস্যার সমূলে সমাধান করবার কথা ভেবেছে। কিন্তু মরণে নরকে গতি হবে এই আশঙ্কা তাকে নিবৃত্ত করেছে।

কিন্তু বৃন্দাবনে এসে যখন ঘটনাচক্রে মদিরার সন্ধান পেলো, আশার ক্ষীণ রশ্মি ফুটলো তার মনে। মদিরার মতো বারাক্ষণ্য যদি শান্তি লাভ করে থাকে তবে সেই বা না পাবে কেন। অবশ্য মদিরার তুলনায় তার পাপের বোঝা অনেক ভারী। তবে তার দুঃখও অনেক দুঃসহ, তাতে কি বোঝা পুড়ে গিয়ে খানিকটা হাল্কা হয়নি!

জরা নরেন্দ্রনগর থেকে পলায়নের পরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোছায়া অতিক্রম করেছে ভাবতে গেলে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ছাগৰি, কিম্বররাজ্য, চার্বাক আশ্রম হিমালয়ের নির্জন পথে যষ্টিধারী, কুকুরমাত্রসঙ্গী, নিঃসঙ্গ পথিক; বদরিকাশ্রমে শূন্য মন্দির দর্শন, ওহাবাসিনী বুড়িমা - এমন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কখনো কি একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে! পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কেউ জানে না, চিরানন্দময় কিম্বররাজ্যে পাপ শব্দটাই জানে না, মহাজ্ঞানী চার্বাক আনন্দের ভাণ্ডারী কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না, আর সেই নিঃসঙ্গ পথিক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বীকার করলেন মুক্তির উপায় সন্ধানই তিনি চলেছেন। জরার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে যায়, সেও তো মুক্তিসন্ধানী, কিন্তু মনঃস্থির করবার আগেই তিনি পাহাড়ের বাকের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন, এগিয়ে দেখবার সাহস তার হল না।

সকলের দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসার প্রদীপ নিয়ে ঘুরেছে, শিক্ষা জ্বালিয়ে দিতে কেউ পারে নি। কেবল বুড়িমা, সেই নিরঙ্কর অজ্ঞ বৃদ্ধাটি একবার আলোর ফুলকি ছেলেছিল, প্রদীপ জ্বলল না সত্য তবে বোঝা গেল এখনো নিরাশ হওয়ার সময় আসে নি। তার কথাতেই এলো বৃন্দাবনে। কই সেখানেও তো দেখলো মন্দির শূন্য। ঠিক তার মনে নেই কে তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে পূর্ণাবতার ছাড়া কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেনি পূর্ণাবতার কে! অবতারের সঙ্গে পূর্ণাবতারের প্রভেদ কি—এ প্রশ্নের সমাধান করতে হয়তো পারতেন সম্যাসী ঠাকুর। প্রশ্নটা জরা তুলেছিল, এমন সময়ে পথের উপরে মৃতদেহ দর্শনে বিষয়টা চাপা পড়ে গেল।^{১৩৩}

এরপর নানা বাধা বিপত্তি ভিড়িয়ে অবশেষে জরা হাজির হয় প্রভুদয়ালের

কুটিরে। সেখানে সে প্রভুদয়ালের কাছে পূর্ণাবতারের যথার্থ স্বরূপ অবগত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রভুদয়াল চরিত্রের সহজ সরল জীবনযাত্রা, সাধিক আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, অহিংস জীবনদর্শন ও সর্বজীবে কল্যাণচেতনা মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ায়। এই চরিত্র চিত্রণের সময় গান্ধীভক্ত প্রমথ-মানস অবচেতনে গান্ধী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

প্রভুদয়ালের কাছে জরা জানতে পারে যে চাঁদ যেমন কলায় কলায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মানুষের কলায় কলায় পূর্ণতার হতে হতে পূর্ণাবতার পরিপূর্ণতা লাভ করেন। এই যে সমগ্র মনুষ্যসমাজ মৃত, জাত ও অজাত নিজেদের অগোচরে সেই পূর্ণতার দিকে চলেছে। এই পূর্ণতার অভিমুখীনতাই পূর্ণতা। তিনি নিত্য পূর্ণ, তবু তাঁর অপূর্ণতার ভাণ। কারণ তিনি অপূর্ণতার ভাণ করে মনুষ্যকে উৎসাহিত করে আহ্বান করছেন পূর্ণতার পথে। নিরন্তর চলা চাই, থামলে চলবে না। শুধু দেহটা চললেই যথেষ্ট নয়, মন, বুদ্ধি, হৃদয় সমস্ত দিয়ে চলা চাই, তাতেই পাপের ক্ষয়। তাতেই পূর্ণতার উপলব্ধি।

এইভাবে জরাব্যাধ নিরন্তর চলার আবেগে, আত্মগ্লানি থেকে মুক্তির আকৃতিতে আর পূর্ণাবতারকে জানার আগ্রহে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণাশুদ্ধ নবজন্মে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার সমুদ্রগর্ভে আত্মবিসর্জন জরা-পীড়িত দেহত্যাগ করে নৈতিক পুনর্জন্মের রূপক ছাড়া আর কিছু নয়।

আর সমগ্র মানব সমাজের মধ্যেও এই পাপবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল আকৃতি ও যন্ত্রণা যুগে যুগে পরিলক্ষিত হয়। কারণ 'আমরা সকলেই জরা, প্রত্যেকেই আমরা আদর্শঘাতী'। ১৭০

রূপদক্ষ জীবনশিল্পী প্রমথনাথ কিঞ্চলক ওরফে খটাস চরিত্র জরাতী বা মদিরা চরিত্র চিত্রণেও যথেষ্ট মুনসিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের সমাজ যে ক্রমশঃ সাম্যবাদের অভিমুখী হচ্ছে বা সমাজের চরম অরাজকতা ও বঞ্চনার মুহূর্তে যে নৈসর্গিক নিয়মেই বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তার মধ্যেও যে স্রষ্টার কল্যাণস্পর্শ থাকে তারও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসে। খটাস বুদ্ধিজীবী; রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ। তাই তার মুখ দিয়ে লেখক সমাজচৈতন্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন - 'নরক, অসুর প্রভৃতি দুর্বৃত্ত চরিত্র সমাজেরই সৃষ্টি। অধিকাংশ লোক অতাবের তাড়নায় এসে জুটেছে; শৈশবে এরা দ্বেহ পায়নি, বাল্যকালে শিক্ষা পায়নি; যৌবনে জীবিকা পায় নি - এরকম অবস্থায় কি তাদের কর্তব্য বলতে পারো? বাঘ যেমন পশুদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে। তেমনি ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে চরাচরের সমস্ত

প্রাণীকে । রূপান্তরে মানুষও মানুষের খাদ্য । দুর্বলকে প্রবল মারছে, গরীবকে ধনী মারছে আর প্রজাকে মারছে রাজা । এই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ মার- এই তো তোমার সমাজ । প্রাণভয়ে তারা যদি পালিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে যোগ্য নেতার স্মরণ নেয় তখন তোমরা বলে থাকো এসব সমাজ বিরোধীকার্য । আর এ বিরোধের সূত্রপাতটা কোথায় কেউ খোঁজ করে না । . . . যতক্ষণ সংসারে উঁচু নীচু, উচ্চাচ আছে ততক্ষণ ক্ষুধার শান্তি নেই । তাই আমরা বর্তমান অবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সব ভেঙেচুঁবে সমতল করে দিয়ে ওলটপালট করে দিতে চাই ।

. . . তুমি যাকে ওলটপালট বলছ তার নাম সামাজিক বিপ্লব ' । ১৭১

কিন্তু বুদ্ধিসর্বস্ব, বাস্তবজ্ঞান নির্ভর সমাজ বিপ্লব যে শেষ কথা নয়, তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনা, নৈতিক উপলব্ধি ও উচ্চতর আদর্শ যুক্ত হলে তবেই যে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হতে পারে একথার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে । ' যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছয় তখন একজন মহাপুরুষ এসে মরচে পড়ে গিয়েছে বলে যে চাকা ঘুরতে চাইছেনা তাকে সবলে ঘুরিয়ে দুঃসময়ের অবসান ঘটিয়ে নূতনের সূচনা করে দেন ।

তোমার মতো বাসুদেব বোধ করি সেইরকম এক মহাপুরুষ . . . তাঁর মতো বিপ্লবী আর কে ? বাসুদেব বিপ্লব পুরুষ ' । ১৭২

এইভাবে আধুনিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের রাবীবন্ধন করে প্রমথনাথ পৌরাণিক উপন্যাসের পত্রপুটে চিরন্তনের অমৃত বাণী তুলে ধরেছেন - ' এরকম বৃহৎ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ যুগে যুগান্তরে এক আধবার আসেন । এ যুগে এসেছিলেন বাসুদেব । ভারতজোড়া ভাবসমুদ্র অপেক্ষা করছিল তার জন্য । তিনি উত্তাল করে তুললেন জোয়ার - চারদিকে ক্ষুদ্র সীমা পরিসীমা ডুবে একাকার হয়ে গেল । তারই চরম প্রকাশ হচ্ছে ভারতযুদ্ধ । তোমার আমার মতো সামান্য লোক বিদ্রোহী আর লোকোত্তর পুরুষ বাসুদেব বিপ্লবী । দীর্ঘকাল ধরে জমে ওঠা সমস্ত ক্রোধ অপসারিত করে তিনি ভবিষ্যতের ভূমিকা রচনা করে গেলেন বর্তমানের অকলঙ্ক পটের ওপরে ' । ১৭৩ উক্ত বক্তব্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি-আন্দোলনের অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিভাস মেলে ।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিধর, সর্বাদ্য় সুন্দর, অনন্যসাধারণ মানুষ রূপে

১৭১ । তদেব - পৃঃ ১১২ ।

১৭২ । তদেব - পৃঃ ১১৬ ।

১৭৩ । তদেব - পৃঃ ১১৮ ।

চিত্রিত করেছেন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'। আর বঙ্কিমশিষ্য প্রমথনাথ কৃষ্ণচরিত্রের সেই পূর্ণতাকে অবলম্বন করে আধুনিক মানবজীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সঙ্গে অধিত করে এক নূতন জীবনভাষ্য রচনা করেছেন 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসে। এখানে জীবনরসিক ও দূরদ্রষ্টা কথা সাহিত্যিকের অনন্যতা। এ গ্রন্থে কবি প্রমথনাথের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক, সমাজসচেতক ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোক ভাস্বর প্রমথনাথের যথাযথ সমন্বয় ঘটেছে বলেই - এর প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাস নিতান্তই বিরল।

রাজনৈতিক উপন্যাস :

বঙ্গভঙ্গ (১৩৮৩) :— উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উভয় অভিধাতেই ভূষিত করা যায়। স্বয়ং লেখক গ্রন্থের সূচনায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন - 'বঙ্গভঙ্গ বইখানা উপন্যাস - ইহা ইতিহাস বা রাজনীতি নহে, বড় জোর রুচিভেদে ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে'।^{১৭৪} ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হলেও লেখক গ্রন্থটিকে মুখ্যত উপন্যাসের মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ নামকরণের মধ্যেই এই উপন্যাসের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসের পটভূমি ও স্থান-কাল-পাত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন - 'সুবিদিত স্বদেশী আন্দোলন ইহার পটভূমি। স্বদেশী আন্দোলনের মতো তাৎপর্যপূর্ণ সর্বভারতীয় আন্দোলন এদেশে আর হয় নাই। . . স্বদেশী আন্দোলন মূল কারণ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় বয়কট। বয়কট দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করিল - স্বদেশাত্মকে আবিষ্কার এবং বোমা পিস্তলবাহী অগ্নিযুগ। এই আন্দোলনের মধ্যেই বীজাকারে পরবর্তী সমস্ত আন্দোলন ছিল মায় গান্ধী বিপ্লব। সেই পটভূমির উপর অঙ্কিত বঙ্গভঙ্গ উপন্যাস। কাজেই ইহার মধ্যে তৎকালীন ইতিহাস ও রাজনীতির ছায়াপাত হইয়াছে - তবু তাহা ছায়ামাত্র। উপন্যাসের কায়া অখণ্ড বঙ্গের কোন জেলার একটি সদর শহর। তাই বইখানাকে উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার উপরে সুবিচার করা হইবে'।^{১৭৫}

স্বদেশী আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূল কারণ কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের সঙ্গে এবং ইতিহাস পিপাসু পাঠকের সঙ্গে প্রমথনাথের মতের মিল না হতেও পারে কিংবা বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতখানি সে বিষয়েও মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গতে যে জীবনের ছবি, সুখ দুঃখমণ্ডিত, আশা-নিরাশা ঘেরা মানব-হৃদয়ের যে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে তার সজীবতা ও বিশ্বস্ততা

১৭৪। বঙ্গভঙ্গ - প্রমথনাথ বিশী (ব্যাখ্যা)

১৭৫। তদেব।

বিতর্কাতীত। লেখক এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই ভূমিকায় বলেছেন - 'দিনাজশাহী শহরের গোটা দুই তিন পরিবার ইহার অস্থি মজ্জা, সেই পরিবারের লোকজন ইহার পাত্রপাত্রী। ইহাতে দুই শ্রেণীর নর নারী আছে। একশ্রেণীতে স্বনাম খ্যাত কয়েক জন ব্যক্তি যথা সুরেন বাড়ুজ্জে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। আর এক শ্রেণীতে পূর্বোক্ত পরিবার-সমূহের নরনারী'। ১৭৬

১৯০৫ থেকে ১৯১৫ এই দশবছরের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এই উপন্যাসের মূল প্রোতধারা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমস্ত বাংলাদেশে যে উত্তাল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যে নবজাগরণের জোয়ার এনেছিল তারই ইতিহাস সম্মত বর্ণনা পাই গ্রন্থটিতে - '১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সাল। কলকাতা শহরে, সমগ্র বাংলা দেশের শহরে, বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে, পল্লীতে পল্লীতে, হাটে-বাজারে, প্রান্তরে-কান্তারে, পথে-ঘাটে সর্বত্র স্তম্ভিত নীরবতা। দোকানপাট বন্ধ, যানবাহন স্থগিত, স্কুলে কলেজে ছাত্র নাই। টোলে চতুষ্পাঠিতে পড়ুয়া নাই, পথে ফিরিঅলা নাই, গৃহস্থবাড়ীতে উনুনে আগুন নাই - অরক্ষন; শিশু ও রোগী ছাড়া সকলের উপবাস বিধেয়। কেবল নদীর ঘাটে ঘাটে কাতারে স্নানার্থী নরনারী, ধনী-দরিদ্র অভিন্ন হাজার হাজার। . . .

কলকাতার দৃশ্য বাংলাদেশের সর্বত্র। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, নদীর ঘাটে, ব্রতের স্নান আর রাখীবন্ধন। . . . সকাল বেলায় স্নান, গান আর চাঁদা সংগ্রহ, বিকালে সভার আয়োজন। উত্তর কলকাতায় পশুপতি বোসের বাড়ির হাতার মধ্যে সভা, প্রধান বক্তা রবি ঠাকুর। মধ্য কলকাতায় আপার সার্কুলার রোডের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠার সভা, প্রধান বক্তা আনন্দমোহন বসু। আর পশ্চিম কলকাতার সভা টাউন হলে। প্রধান বক্তা সুরেন বাড়ুজ্জে, বিপিন পাল আর রাসবিহারী ঘোষ'। ১৭৭

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর থেকে বঙ্গবাসী রাখীবন্ধন উদ্ঘাটন করার সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করল। ইতিহাসে এটি বয়কট আন্দোলন নামে পরিচিত। এইভাবে সমস্ত বঙ্গদেশে আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। সকলে যে স্পষ্টভাবে স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ অবগত হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এর সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে কেউ দূরে থাকতে পারেনি। সর্বত্র একই প্রশ্ন - স্বদেশী কি? লেখকের ভাষায় - 'নবীনের বিচারের সময় উকীল মোক্তারেরা চিন্তা করছিল এই অর্থশিক্ষিত

মহাজন যে স্বদেশীর জন্য সমস্ত দান করে দিয়ে নিঃস্ব হল সেই স্বদেশী ব্যাপারটা কি !

কপালে অডিকোলন ভেজানো রুমাল ঘষতে ঘষতে মেমসাহেব চিন্তা করছিল স্বদেশী ব্যাপারটা কি ! এমন কি ক্ষুদ্রে কার্জন ক্রোজেটের মনেও এক একবার চিন্তার ক্ষুদ্র উর্মি উঠছিল স্বদেশীটা কি বস্তু ! এমনকি সাহেবের খানসামা খানা পাকাতে পাকাতে চিন্তা করছিল স্বদেশীর যে হুম্মায় বরাদ্দ মাফিক ডিম পাড়তে মুরগিতে ডুলে যায় কি সেই চীজ স্বদেশী !

এ সমস্তই সেই নিরঙ্কর, ধোপা বউয়ের প্রশ্নের রূপান্তর মা ঠাকরুণ, কি সেই স্বদেশী যার জন্য এত দুঃখকষ্ট, এত সুখ, আনন্দভোগ ? ১৭৮

স্বদেশী কি এই প্রশ্নের উত্তর লেখক নিজেই দিয়েছেন - ' স্বদেশী আর কিছুই নয়, স্বদেশ আত্মার মূর্তি সন্দর্শন । স্বদেশ আত্মার বাণী শুনলো দু'দশজন মাত্র ধ্যানীর শ্রবণ । এহেন গূঢ় রহস্য যে অধিকাংশ লোক বুঝবে না তা আর বিচিত্র কি ' ১৭৯

স্বদেশী আন্দোলন দমন করার অজুহাতে যখন গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন মানুষের উপরে দৈহিক নির্যাতন, জেল-জরিমানা প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থা হোল তখন একদল যুবক অহিংস আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে সহিংস ও রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করলো । তারা ভাবে বয়কট করে কোন কাজ হবে না, ইংরাজ রাজ্য ওতে টলবে না, চাই রক্তপাত । রক্ত দিতে হবে, রক্ত নিতে হবে' । ১৮০ এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র ছোট বড় বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠলো । মন্ত্রগুপ্তি এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । মন্ত্রগুপ্তি লঙ্ঘনের শাস্তি প্রাণদণ্ড । অনেক পরীক্ষা করে তবে মন্ত্রগুপ্তির শপথ পাঠ করানো হোত - বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও পাঠদান করা হোত ; দীক্ষার সময় গীতা ও আনন্দমঠ বই দুটি প্রত্যহ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হোত । কেউ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করলে তাকে মিথ্যা গুপ্তচরের দুর্নাম দিয়ে মেয়ে ফেলা হোত । এই উপন্যাসে রমণী তেমনি চরিত্র । শচীন নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক । তার ভাই সুশীল সহিংস আন্দোলনের অংশীদার হয়ে কোন এক পুলিশ অফিসারকে দলের নির্দেশে হত্যা করে এবং পরে ধরা পড়ে জেলে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ হয়ে নিজ চরিত্রের তথা মনের ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ।

বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে ইংরেজ পরিশেষে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করতে উদ্যোগী হয় । কৌশলী ইংরেজ তখন বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করল ।

১৭৮ । তদেব - পৃঃ ১২৪ ।

১৭৯ । তদেব - পৃঃ ১২৫ ।

১৮০ । তদেব - পৃঃ ১৩৮ ।

বাংলা জোড়া লাগল এই সাফল্যে বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহত হল। কিন্তু তাতে বাঙালীর লোকসান ছাড়া লাভ হল না। কারণ কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হোল দিল্লীতে আর হিন্দুকে মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরস্পর বিরোধী দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়ার গোপন ষড়যন্ত্র চলতে থাকলো।

দিনাজশাহী শহরের যজ্ঞেশ রায় এবং অবিনাশ মাষ্টারের দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখক এই উপন্যাসে তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের ভাঙা গড়ার এক মনোজ্ঞ এবং ইতিহাসসম্মত চিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন। যজ্ঞেশ রায় খ্যাতি ও প্রতিপত্তির লোভে ইংরাজ ঘেঁষা হলেও অচিরে তার মন স্বদেশিকতাবোধে উদ্ভুদ্ধ হয়। তিনি আজীবন অহিংসপন্থী, স্বদেশপ্রেমিক ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন।

সহিংস আন্দোলন তৎকালীন বহু যুবককে আকৃষ্ট করলেও অনেকেই যে এই আন্দোলনের নেতৃত্বের কঠোরতায় ও নির্বিচার হত্যার কার্যধারায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসের সুশীল চরিত্রের আত্মসমালোচনা ও অনুশোচনার মধ্যে - 'তার মন বিশ্বাস, বিরক্ত হয়ে অবশেষে বিদ্রোহ করে উঠলো। এ কাদের নাগপাশে সে বদ্ধ করেছে নিজেকে। মনে হল তার দীক্ষা গ্রহণটাই ভুল হয়েছে।' ১৮১ বয়কট আন্দোলনকেও লেখক বিশেষ সুনজরে দেখেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথের মতকেই তিনি সমর্থন জানিয়েছেন—'এখন মনে হচ্ছে বয়কট ব্যাপারটা সেই রকম একটা শক্তির অপব্যয় মাত্র। রবিবাবুর একটা প্রবন্ধের বিষয় মনে আসছে, ইংরাজের উপর রাগ করে দেশী কাপড় ব্যবহার করা দেশকে অপমান করার সামিল, দেশকে ভালবাসি বলে যেদিন দেশী জিনিস ব্যবহার করবো সার্থক হবে আমাদের স্বদেশী।' ১৮২

দিনাজশাহী শহরের উকিলদের নিয়ে গড়ে ওঠা অল বেঙ্গল লোন অফিসের যে চিত্রটি এখানে অঙ্কিত হয়েছে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক, তবে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত কি না সংশয় জাগে। এদের মধ্যে হরিপদ রায় ও তারাচরণ চক্রবর্তী চরিত্রদুটি একান্তই বাস্তবসম্মত। কারণ প্রমথনাথ ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৩০-৩১ খৃঃ শরিকী মামলায় জড়িয়ে পড়ে রাজশাহী শহরের উক্ত নামের দুজন উকিলের সাহায্য নিয়েছিলেন। এছাড়া সুরেন মৈত্র নামক একজন সমাজ সেবক ও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তখন সত্যই রাজশাহী শহরে ছিলেন। তারই আদলে এই উপন্যাসের যজ্ঞেশ রায় চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

একটি দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে কিভাবে দিনাজশাহীর দুটি পরিবারের

আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, স্নেহ-প্রেম হতাশার মরুভূমিকায় অবসিত হয়েছে তারই করুণ আলোয় অংকিত হয়েছে সমগ্র উপন্যাসটিতে। 'রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে ওতপ্রোত হয়ে নবতর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। রূপস্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা জীবন শিল্পী সরু-মোটা তুলিতে তারই রঙীন ছবি এঁকেছেন দক্ষ হাতে। স্বদেশী আন্দোলনকে বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই গুরুত্ব যথায়থ কি না এই বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় - ' স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া। এই আন্দোলন সর্বভারতকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল, এ আন্দোলন সত্যিই সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সর্বভারতীয় আন্দোলন কিনা তা নিয়ে লেখকের সঙ্গে অনেকেরই তর্ক থাকতে পারে। লেখক কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে মোটেই সীমিত করে দেখেন নি। ১৯০৫ -এ বঙ্গভঙ্গ সূচনা বা ১৯১১ তে বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে দেখেন নি। তিনি বঙ্গভঙ্গকে দেখেছেন একটি সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রথম ধাপ হিসেবে, একটি দীর্ঘ কার্যকারণ পরম্পরার সূচনা হিসেবে। এভাবে দেখা কিছু মাত্র অসঙ্গত নয়। এবং মানতেই হবে, এভাবে দেখলে লেখকের সঙ্গে তর্কের খুব বেশি অবকাশ থাকে না'। ১৮৩

'লেখক এই আন্দোলনের স্থলনের দিকটা যে একেবারেই দেখেন নি অ নয়। তবে বিষয়টিকে তিনি শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন নি। না দেখাই স্বাভাবিক; কারণ তাঁর ইতিহাসবোধ এবং ইতিহাস ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের'। ১৮৪

শচীন ও রুক্মিণীর দাম্পত্য জীবন, রমণী ও মলিনার স্ফুটনোন্মুখ প্রেমজীবন, রায় বাহাদুর যজ্ঞেশ রায় ও অবিলাস চক্রবর্তীর পারিবারিক জীবন উক্ত স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে বিপর্যস্ত, কেন্দ্রচ্যুত ও অশান্ত হয়ে উঠেছে তারই সজীব ও মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক রসের সঙ্গে জীবনরসের সর্বাঙ্গিক সার্থক সম্মিলনে এ উপন্যাস যথার্থ শিল্প সম্মত রূপলাভ করেছে।

পনেরোই আগস্ট : (১৩৮৫) — উপন্যাসটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করলেও ঔপন্যাসিক একে ঐতিহাসিক উপন্যাস অভিধা দান করেছেন - 'পনেরোই আগস্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের সূচনাকাল বঙ্গভঙ্গের অবসানে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে আর সমাপ্তি ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট। এই গ্রন্থ রচনা শেষ ১৯৭৭ সাল - ঘটনার শুরু ও ঘটনা শেষের মাঝে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান - কোন ঘটনা ত্রিশ বছরের

পুরানো হলেই পণ্ডিতেরা তাকে ইতিহাস পর্যায়ে স্থান দেন। কাজেই পনেরোই আগস্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস'।^{১৮৫} তিরিশ বছরের পুরানো ঘটনা হলেই যে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা গড়ে ওঠে এমন কোন নিয়ম আছে কিনা জানি না তবে একথা বলা যায় যে সময়ের চুলচেরা বিচার করে বা পাজি পুঁথি মেনে ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না। আসল কথা হল, সচেতন ভাবে একটি নির্দিষ্ট অতীতকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা, জীবন্ত করে তাকে পরিবেশন করা। এই বিশ্বাসযোগ্যতার জাদুতেই অতীতের রস ঐতিহাসিক রস হয়ে ওঠে। তখন ঐতিহাসিক উপন্যাস সার্থক হয় ইতিহাসের তথ্যের গুণে নয়, সার্থক হয় সৃজনী শক্তির গুণে।

এই দিক থেকে প্রমথনাথের প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলেই মনে করি। নর নারীরা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিহাস বিকৃত হয়েছে কি অবিকৃত আছে, সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের ভার তথ্যজ্ঞ ঐতিহাসিকের উপর।^{১৮৬} বঙ্গভঙ্গ ও পনেরোই আগস্ট উপন্যাস দুটির ঘটনাকাল ও আখ্যান বিন্যাস স্বতন্ত্র হলেও দ্বিতীয়টির কাহিনী প্রথমটির কাহিনীর সম্প্রসারণ, পাত্র পাত্রীদের অনেকেই উভয় উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। 'বঙ্গভঙ্গ'তে সহিংস আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য সুশীলের করুণ মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলেও এবং এর স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকলেও পরিশিষ্টে যমজ ভাই লব কুশের জন্মকথা ও সুশীলের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করে পাঠক চিন্তে যে কৌতূহলের উদ্রেক করা হয়েছিল তারই অনুবর্তন ও পরিণতি স্বরূপ রচিত হয়েছে 'পনেরোই আগস্ট' উপন্যাসটি।

গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে যে আয়তন, কাহিনীর বিস্তৃতি ও গভীরতা সর্বক্ষেত্রেই বঙ্গভঙ্গের চেয়ে পনেরোই আগস্ট অধিকতর পরিণত; ইতিহাসের গতি প্রকৃতি ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পনেরোই আগস্ট এ বেশী। তা সত্ত্বেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের সুখদুঃখ, আশা নিরাশা কোথাও অবহেলিত হয়নি। বরং এই উপন্যাসে লেখক ইতিহাসের ও রাজনীতির পটে জীবনের ছবি অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমালোচকের ভাষায় - 'পনেরোই আগস্টে লেখক উপন্যাসের রসকে ঘনীভূত করে তোলবার সুযোগ পেয়েছেন অনেক বেশি, মলিনা ও অরবিন্দের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণই এই উপন্যাসের মানব রসের প্রধান আশ্রয়। গভীর আকর্ষণ আর কঠিন বিকর্ষণ নিয়ে মলিনাই এই দুই উপন্যাসের নিবিড়তম সংযোজক'।^{১৮৭}

১৮৫। পনেরোই আগস্ট, ভূমিকা, পৃঃ ১।

১৮৬। কথা সাহিত্য, ১৩৮৬, পৃঃ ৭৪১ চৈত্র সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

১৮৭। তদেব - পৃঃ ৭৪৫।

সমালোচক কথিত উক্ত মানবরস সৃজনে মলিনা ও অরবিন্দের সঙ্গে শুভ্রা ও রুশ্মিণীর ভূমিকাও কম নয়। তবে পনেরোই আগস্টে অরবিন্দ ও শুভ্রার ভূমিকা উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত কিন্তু উভয় উপন্যাসে মলিনা ও রুশ্মিণী সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতি ও ইতিহাস যে পনেরোই আগস্টে মানব জীবন চিত্রাঙ্কনের উপযুক্ত পটভূমি হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে ভূমিকায় লেখক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন - ' দিনাজশাহী শহরের কয়েকটি নগণ্য মধ্যবিত্ত পরিবার এই কাহিনীর প্রধান পাত্রপাত্রী আর ঘটনার আর্বত যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সুদূর মফস্বল আর কলকাতা শহরের আরও কতকগুলি মধ্যবিত্ত সমাজের নরনারী। তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে যত রকম রাজনৈতিক পছা দেখা দিয়েছে দেশে তা সমস্ত প্রতিফলিত উপন্যাসখানিতে। শচীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দলের লোক, সুশীল সশস্ত্র বিপ্লবী দলের, ভূপতি সসৈন্য বিপ্লবী দলের, রাধা প্রাণের জ্বালায় যোগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে, যোগ দিয়েছে এবং মরেছে ; অরবিন্দের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে একটি মেয়েকে না পেয়ে - আর একজনকে পেয়েও হারিয়ে, মলিনা আর শুভ্রা তলিয়ে গেল নিজেদের অশ্রুর আর্বতে, আর রুশ্মিণী যমজ পুত্রের একটিকে দান করল গান্ধীর হাতে, আর একটিকে কম্যুনিষ্ট পাটিতে। সংসারে দুঃখ এত রকমেরও আছে ! আর সর্বোপরি মাথা তুলে দণ্ডায়মান অবিনাশ চক্রবর্তী যার কাছে দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম অভিন্ন। আর ইংরেজ সরকারের প্রথম সারির দরবারী যজ্ঞেশ রায় শেষ পর্যন্ত হলেন প্রথম সারির কংগ্রেসী, দিনাজশাহী শহর আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলেন পাকিস্তানে, আর স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে হল তাঁর জীবনসংশয়, স্বাধীনতার ঘোষণা মুম্বুর কানে ঢুকল কিনা তিনিই জানেন। মহৎ দুঃখের তাপে এই সব নগণ্য নরনারী সমুজ্জ্বল। এদেরই সুখ-দুঃখের, স্বার্থত্যাগের, প্রাণত্যাগের, সর্বস্ব ত্যাগের কাহিনী এই উপন্যাস পনেরোই আগস্ট ' ১৯৮ ।

উপন্যাসিকের চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা অতীব প্রশংসনীয়। তুলির স্বল্পটানে, দু'একটি রেখার সাহায্যে তিনি চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে অসাধারণ পটু। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি মূলতঃ কবি বলেই কল্পনাশক্তির প্রাবল্যে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের সম্ভাবনা সম্ভ্রাত্ত দ্বিবিধ চরিত্রের হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যের অন্তর্শায়ী সত্য আবিষ্কারে বা ঐতিহাসিক দর্শন (Philosophy of History) — আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব সীমাহীন।

স্বদেশী আন্দোলনের এক বিশেষ স্তরে মহাত্মাগান্ধী যে দেশ ও জাতির অন্যতম দিশারী ছিলেন তার সেই হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠ ও মহিমময় মূর্তি এই উপন্যাসে নিষ্ঠাভরে বিদ্রিষ্ট হয়েছে। এছাড়া স্বল্পকথায় রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু নজরুল ইসলাম, সুরেন ব্যানার্জী প্রভৃতির চিত্রও উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর সক্রিয়, সশ্রদ্ধ ভূমিকা যেমন ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এই উপন্যাসের আদ্যন্ত গান্ধীর অনপনেয় প্রভাব স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়েছে। কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র সর্বত্রই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে গান্ধীর অবিসাংবাদিত প্রভাব লক্ষ্য গোচর হয়। মহাত্মা গান্ধীর চরকা-স্বরাজ, বিলাতি বর্জন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা, হরিজন আন্দোলন, কুইট ইন্ডিয়া, করেঙ্গে ইয়ে মেরেঙ্গে, ঋণিত ভারতবর্ষের বিরোধিতা প্রভৃতি আসমুদ্র হিমাচলকে উখাল পাখাল করে তুলেছিল। তারই উত্তাল তরঙ্গে প্রাবিত হয়েছিল দিনাজশাহী শহরের জনজীবন। বিশেষতঃ এই উপন্যাসে চিত্রিত যজ্ঞেশ রায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, অরবিন্দ, শুভ্রা, মলিনা প্রভৃতির পারিবারিক ও ব্যক্তিক জীবনে তা প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ফলে অরবিন্দ, মলিনা ও শুভ্রার প্রেমপিপাসা ও শান্ত-সুখী নীড় বাঁধার স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দেশব্যাপী অরাজকতা ও বিপ্লব তরঙ্গের মধ্যে গান্ধীজীর পক্ষে অরবিন্দের মতো কোন স্বল্প পরিচিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপন সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে পত্রালাপ করা বাস্তবসম্মত ছিল কিনা সেই প্রশ্ন তুলেও বলা চলে জাতীয় জীবনের মতো মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ, শান্তি, ভালোবাসার প্রতি মহানুভব বাপুজীর লক্ষ্য রাখা ঐতিহাসিক সম্ভাবনাসম্মত ঘটনারূপে গ্রহণে বাধা নাই।

গান্ধীর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি সত্যাবেষী ও সাধক-রাজনীতিক—তাই সমগ্র দেশব্যাপী তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদু প্রভাব বিস্তার করে। লেখকের ভাষায় - 'গান্ধী মহাত্মা এ জন্য নয় যে তিনি নেংটি পরেন, নাম মাত্র আহ্বার করেন, রঘুপতি রাঘব গান করেন, না, মোটেই তা নয়। তিনি মহাত্মা এই জন্য লোকের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় লোকাতীতে। তিনি এমন একটি কর্মপদ্ধতি লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন যার অনুষ্ঠান করতে গেলে সমস্ত দেশকে একমন একপ্রাণ একসূত্রে গ্রথিত হতেই হবে।' ১৮৯

জাতীয় আন্দোলন কিভাবে পারিবারিক জীবনযাত্রাকে বহিমুখী করে তুলেছিলো তার বর্ণনা আছে এই উপন্যাসেই - 'আমাদের কাহিনীটি নিতান্ত ঘরোয়া। দিনাজশাহী শহরের গুটি দুই তিন পরিবারের নরনারী তার পাত্রপাত্রী। তাদের

যাতায়াতের পরিধি সংকীর্ণ, দিনাজশাহী থেকে কলকাতা অবধি। আরও একটি স্থান আছে জেলখানা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া কাহিনী আর ঘরের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ রইলো না। দেশের ইতিহাসে হঠাৎ এক একটা সঙ্কট মুহূর্ত আসে যখন বাঁধ ভেঙে গিয়ে বন্যার জল প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে, আরাম, বিরাম, বিলাস, ব্যসনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা সমস্ত ওলট পালট করে দেয়। আমাদের ঘটনাকাল তেমনি একটি সাঙ্কটিক মুহূর্ত। এই ঘরোয়া কাহিনীর পিছনে আবর্তিত হচ্ছে ভারত ভাগ্যচক্র'। ১৯০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাত্যহিক জনজীবনকে কতখানি নিম্নগামী করেছিল, ১৯৪৩ সালের কলকাতা শহরে ও পল্লীতে পল্লীতে যে ভয়াবহ মরুস্তর দেখা দিয়েছিল তার বিশ্বস্ত ছবি অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও তার ঔপন্যাসিক মূল্য বিশেষ লক্ষ্য গোচর হয় না। এছাড়া হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিশেষতঃ হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অন্ধ আক্রোশ ও অত্যাচার সমকালীন ইতিহাসের সত্য ঘটনা হলেও এই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের উপর তার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয় না। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে, ঘটনার ঘনঘটায় এই ধরনের উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্রের স্ফূরণ ও হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতা চাপা পড়ে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'যেমন স্টীমরোলারের চাপে রাস্তার উচু নীচু সব ওড়াইয়া সমতল হইয়া যায় তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরালে আত্মগোপন করে। . . . প্রতিবেশচিত্র ব্যক্তিগত, চরিত্রচিত্রকে গৌণ করিয়া প্রধান হইয়া উঠে। সুতরাং উপন্যাসের যে প্রধান লক্ষ্য চরিত্রাঙ্কন, চরিত্র রহস্যের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি এই জাতীয় উপন্যাসে তা প্রায়ই সার্থক হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ত্রুটি, তাহা রাজনৈতিক উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত, এমনকি তীব্রতর হইয়া উঠে'। ১৯১ প্রমথনাথ উক্ত ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক বর্ণনা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও হৃদয়রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত চরিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী ও সার্থক হয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ ও পনেরোই আগস্ট উপন্যাস দুটির গঠনশৈলী বিশেষ পরিণত। কাহিনীর মধ্যে একটি ঘন পিন্ধু সংহতি লক্ষ্যগোচর হয়। একটি পূর্বপরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট ছক অবলম্বন করে লেখক জীবনের একটি পূর্ণায়ত চক্রাবর্তন রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক জীবনবৃত্ত পরস্পরের সঙ্গে যথাযথ

সামঞ্জস্য রক্ষা করে সক্রিয় পরিণতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করেছে। দলের নির্দেশে সুশীল কর্তৃক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা বা অরবিন্দ কর্তৃক দলের কর্মী রমণী চৌধুরীকে হত্যা করা মোটেই অসম্ভব বা অবাস্তব ঘটনা নয়। অথচ উক্ত দুটি ঘটনার সূত্রে যেভাবে সমস্ত উপন্যাসের কাহিনী বয়ন করা হয়েছে তা খুব উঁচু দরের প্রতিভার পরিচায়ক। উক্ত খুনের ঘটনা দুটি নির্মম নিয়তির মতো দুর্মোচ্য পাশে আবদ্ধ করে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলির জীবনে ব্যর্থতার কারুণ্য সঞ্চার করেছে।

মলিনা প্রথমে রমণীকে ও পরে অরবিন্দকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্ভর পরিহাসে সে একজনকেও জীবনসঙ্গী হিসাবে লাভ করতে পারেনি। পুলিশের গোয়েন্দা এই মিথ্যা দুর্নাম দিয়ে রমণীকে খুন করা হোল। মলিনা সে কথা বিশ্বাস না করলেও তার হৃদয়ে একটা বড় ক্ষত সৃষ্টি হল। সেই ক্ষত শুকাবার পথে পরিচয় হল বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে। পরিচয় ক্রমশঃ প্রণয়ে ও শেষে পরিণয়ের পথে এগিয়ে চললো, কিন্তু অনুতপ্ত অরবিন্দ যে মুহূর্তে রমণী হত্যা বিষয়ক সমস্ত ঘটনা মলিনার কাছে ব্যক্ত করলো সেই মুহূর্ত থেকেই মলিনা-অরবিন্দের জীবনে বিচ্ছেদের ফাটল রেখা দেখা দিল। মিলনের সম্ভাবনা হয়ে উঠলো সুদূর পরাহত। তারপর ঘটনাচক্রে ব্যথাহত অরবিন্দের বিফল হৃদয়ে নার্স শুভ্রা সেবা ও প্রেমের প্রলেপ টেনে দিল। উভয়ে যখন ঘর বাঁধবার সংকল্প করছে সেই সময় আবিষ্কৃত হল যে রমণী চৌধুরী শুভ্রার অগ্রজ। ফলে ভ্রাতৃহত্যারকের পক্ষে বোনকে জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হোল না। দেখা দিল বিধা ও হৃদয়। মিলনের আশা অন্ধুরেই বিনষ্ট হল।

একটি সং ও শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে মলিনার বিয়ে ঠিক হলেও শেষ মুহূর্তে যখন ছেলেটি জানতে পারে যে মলিনার দাদা সুশীল তার পিতৃহত্যাকারী তখন তারা কৌশলে পিছিয়ে গেল। ফলে মলিনার আশালতা মঞ্জুরিত হতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগা এই মেয়েটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের শুভ মুহূর্তে পাকিস্তানী পাঠান সৈন্যের পাশবিক প্রবৃত্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। শুভ্রা মেয়েটিও হতভাগিনী। তার দাদা স্বদেশের লোকের হাতে নিহত হয়। তার ছোট ভাই লবণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের হাতে মৃত্যু বরণ করে; পিতা স্বদেশী করতে গিয়ে আগেই মারা যায় - মাও সেই শোকে প্রাণত্যাগ করে। সে নিজে নার্সের চাকুরি নিয়ে কোন প্রকারে দিন কাটাচ্ছিল। তারপর অধ্যাপক অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয়ে ও প্রণয়ে তার জীবনে নূতন আশার আলো ছলে ওঠে। কিন্তু সেখানেও লম্পট ও চরিত্রহীন রবিনের জিঘাংসার শিকার হয়ে সে অরবিন্দকে চিরতরে হারাতে বাধ্য হয় এবং শেষ মুহূর্তে জানতে পারে যে অরবিন্দই তার ভ্রাতৃহত্যা। এইভাবে তার সমস্ত জীবন দুঃখ, মনোব্যথা ও স্বজন হারানোর শোক সম্ভূত হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

অন্যদিকে তারাচরণ উকিলের কন্যা রাধার সঙ্গে সুশীলের বিয়ে ঠিক হবার ফলে রাধা সুশীলকে স্বামীরূপে পাবার আশা করছিল। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারে জেলে সুশীলের অপমৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধার আশার অপমৃত্যু ঘটে। সেই দুঃখে ও পুলিশের প্রতি ক্রোধে এবং সুশীলের বিপ্লববাদের সমর্থনে সকলের অজান্তে গৃহত্যাগ করে সে চট্টগ্রাম আন্দোলনে যোগ দেয় ও সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে। এইভাবে একটা জীবন অকালে ঝরে যায় ; যদিও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও হতাশা দেশ ও জাতিগত উচ্চাদর্শে রূপান্তর লাভ করে তার মৃত্যুকে মহনীয় করে তোলে।

কাহিনীর অগ্রগতি এবং পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখতে লেখক বহু ক্ষেত্রে নাটকীয় চমক ও আকর্ষিতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, যেমন - অরবিন্দ যখন মহাত্মা গান্ধীকে তার জীবনের অনুতাপের উৎস বন্ধু - হত্যার কথা (রমণী চৌধুরী) বলতে উদ্যত সেই সময় সত্যেন মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকদের প্রবেশ করিয়ে লেখক অরবিন্দের কথাকে অব্যক্ত রেখেছেন। আবার যে মুহূর্তে অরবিন্দ মলিনাকে প্রেম নিবেদন করে তার বিবাহের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত নর-হত্যার কথা বলতে উদ্যত সেই সময় পিকনিক পার্টির হুইসল বেজে সমস্ত চাপা দিয়েছে। যজ্ঞেশ বাবু যখন মলিনার সঙ্গে অরবিন্দের বিয়ের প্রস্তাব জানাতে উদ্যত সেই মুহূর্তে সংবাদপত্রে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের খবর দেখে মনের কথা মনেই চাপা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে লঘু হাস্য পরিহাস পরিবেশনের প্রবণতা উপন্যাসের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে। যেমন পনেরোই আগস্টের ৪৫৭ পৃঃ কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরির ব্যাপারে দাদা—নীতি-র কথা নিতান্ত অনাবশ্যক। কিংবা উভয় উপন্যাসেই অলবেঙ্গল লোন অফিসের বিভিন্ন চরিত্রের মুখরোচক, চটুল, পরিহাসরসসিক্ত আলোচনা কাহিনীর পক্ষে মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।

তবে যজ্ঞেশ রায়ের চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন মাস্টার মশাইয়ের [অবিনাশ চক্রবর্তী] আদর্শনিষ্ঠা ও গান্ধীভক্তি ; হরিপদ উকিলের দেশদ্রোহী মূর্তি ও চরম স্বার্থপরতা ; তারাচরণ উকিলের ও অন্যান্যদের অর্থলিপ্সা ; ন-চ, খ-চ'র উদ্ভট ও হাল্কা আচার-আচরণ; ভূপতি, কৈলাস, শচীন, অতুল এবং সর্বোপরি লব-কুশের চরিত্র চিত্রাঙ্কনে লেখক যথেষ্ট মুনসীয়ানা ও গভীর জীবন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। সামগ্রিক ভাবে বঙ্গভঙ্গ ও পনেরোই আগস্ট উপন্যাস দুটি আর একটু সংক্ষিপ্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জিত হলে আরও সুগঠিত হত। তবে রূপদক্ষ, রূপস্রষ্টা শিল্পী প্রমথনাথের পরিচয় যে গ্রন্থটিতে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিণত প্রমথ-মানসের সার্থকতা সৃষ্টি হিসাবে উপন্যাস দুটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট গল্প রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী

বাংলা কথা শিল্পে ছোটগল্প নবীন আগন্তুক। কিন্তু স্বল্প সময়েই বঙ্গজননীর এই কনিষ্ঠতম সন্তানটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। ছোট গল্পেই আজ বাংলা কথা সাহিত্যের মূল সস্তার পরিচয় বিধৃত। বিষয় বৈচিত্র্য ও রীতি প্রকরণের নব নব উদ্ভাবনে বাংলা ছোটগল্পের জগৎ আজ সৃষ্টিমুখর।

প্ৰাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই বাংলা ছোট গল্পের হৃদ্পদ্ম বিকশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোট গল্পের জনক ও পালক; তাঁর হাতেই এর পুষ্টি ও সমৃদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় বিভিন্ন কথাশিল্পী বাংলা ছোট গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। একাধিক স্বনামধন্য ছোট গল্পশিল্পীর মধ্যে প্রমথনাথ বিশী অন্যতম। পরিমার্জিত ব্যঙ্গ-কৌতুক ও বাগ-বৈদম্ব্যের অধিকারী তিনি।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে নানাবিধ পরিবর্তনের তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্যগোচর হয়। জটিল যুগযন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহুবিধ অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে। সমাজ-মানসে চলেছে দ্রুত ভাঙা-গড়ার কাজ। পুরাতন মূল্যবোধগুলি ক্রমশঃ দূরে সরে গেছে। ফলে মানুষের সমস্যা-জটিল রুধিরাক্ত জীবনযন্ত্রণা, তার আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা সাম্প্রতিক ছোট গল্পরচকদের হাতে মর্মাস্তিক ভাষায় ও তীক্ষ্ণতম আঙ্গিকে নবরূপায়ণ লাভ করেছে, নব নব সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ছোট গল্পের বিষয়বস্তুতে যেমন ক্রমশঃ বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তেমনি দেখা দিয়েছে আঙ্গিকের নবায়ন। প্রমথনাথ বিশীর ছোট গল্পের মধ্যেও এক গতানুগতিকতা বিরোধী, বৈচিত্র্য-পিয়াসী প্রতিভার সন্ধান মেলে।

বিচিত্রকর্মা এই সব্যসাচী সাহিত্যিকের হাতে বাংলা ছোটগল্প অপরূপ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর শান্তিনিকেতনে বাসকালে সেখানকার বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকায় উদীয়মান সাহিত্যিক প্রমথনাথের বহু কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে রচিত গল্পে পরিণত মনের সন্ধান করা বৃথা হলেও, ভাবী প্রতিভার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

প্রমথবিশীর প্রথম ছোটগল্প বিষয়ে সঠিক কথা বলা কঠিন। ভাদ্র সংখ্যা, ১৩২৩, 'প্রভাত' পত্রিকায় 'কূলহারা' নামে একটি গল্পের পরিচয় মেলে। আবেগতারল্য এখানে গল্পরসকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। ১৩২৪, পৌষ সংখ্যায় 'বাগান

'পত্রিকায়' বাঁশীর সুর' নামক একটি ছোটগল্পের পরিচয় মেলে। এটি কাঁচা হাতের লেখা। বিষয়বস্তু ও রচনাইশলীতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। সামান্য গল্পের ক্ষীণ সূতোয় একটি রুগ্নবালকের বদ্ধজীবনের মুক্তির আকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা লেখকের মানবিক চেতনার পরিচয় দেয়। বাগান পত্রিকায় ২১।১।১৯ [ইং] তারিখে লেখা 'প্রণতা' নামে একটি গল্প রচিত হয়েছে। এর শুরু নিম্নরূপ - 'বিধাতাপুরুষ সৃষ্টির পর হইতে যতগুলি বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছেন নির্মলচন্দ্র ও সারদা সুন্দরীর মত দুটি অদ্ভুত প্রাণীকে একত্র করা বোধ হয় তাহার মধ্যে অদ্বিতীয়। কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে একজনকে বাক্য অপরকে অর্থ বলিতে হয়। কারণ দুইজনের কাহাকেও বাদ দিলে কেহই সম্পূর্ণ হন না'। এখানে প্রমথনাথের কবি সত্তা ও প্রাবন্ধিক সত্তা যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করেছে - যা তার বহু গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য।

১৩২৫, ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রভাত' পত্রিকায় 'ভাইফোঁটা' নামে একটি করুণরসের ছোটগল্প আছে। কাহিনী বয়নে শরৎচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। নারীর মহত্ব ও পুরুষের পাষণ্ড মূর্তি এবং পরিণেষে পাষাণের মধ্যেও করুণার উৎস আবিষ্কার এই গল্পের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বন্ধিমী প্রভাবে পাঠকের উদ্দেশ্যে আছে লেখকের প্রত্যক্ষ উক্তি, 'যারা গল্প শুনেতে এসেছেন তাদের নিরাশ করলাম—কমা করবেন। এ রোমান্স লিখছি না। কারণ রোমান্স লিখবার মতো মনের অবস্থা নয়। সত্যের একটা ছালা আছে যার তেজে ছোট খোট অনেক জিনিস পুড়ে মরে।' উত্তম পুরুষে গল্পটি বর্ণিত।

১৩২৮, আষাঢ়-শ্রাবণ, 'প্রভাত' পত্রিকায় ২৩ পৃঃ 'জয়' নামক একটি ঐতিহাসিক ছোটগল্প আছে। ইংল্যান্ডের রাজা হেনরী ও ফ্রান্সিয়ার রাজার যুদ্ধ, হেনরীর বন্দীত্ব ও উদ্ধারের কাহিনী। মোটামুটি সহজ-সাবলীল ভঙ্গীতে রচিত এবং সুখপাঠ্য।

১৩২৫, ফাল্গুন, 'শান্তি' পত্রিকায় 'মাদুলী' নামক একটি করুণ রসাত্মক ছোট গল্প আছে। এটি গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জনের কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে একটি মানবিক রসের গল্প। পুত্র না জেনে পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। পিতারই নির্দেশে তার মৃত্যুর পরে স্বীয় মাদুলির অভ্যন্তরে রক্ষিত উপাদানের সাহায্যে নিজের পরিচয় লাভ করেছে। নায়ক জলদ কুমার। সুখপাঠ্য হলেও গল্পের কোন বাঁধুনি নেই। লালকেল্লা উপন্যাসের নায়কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিচিতিসূচক মাদুলির ব্যবহার লক্ষ্য গোচর হয়।

১৩২৭-ফাল্গুন ও চৈত্র - 'শান্তি' পত্রিকায় 'বালির বাঁধ' নামক একটি ছোট গল্প আছে। এক বাচস্পতি শাস্ত্রের উপদেশের বালির বাঁধে জোর করে স্বাভাবিক জীবনাকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে একটি শিশুর [রতন] স্নেহের তোড়ে সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে যায়। শিশুটি মারা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধের'

কথা মনে পড়ায়।

১৩২৭-কার্তিক-অগ্রহায়ণ - 'শান্তি' - পৃঃ ১ 'ফুলদানী' নামক একটি ছোটগল্প আছে। নায়ক প্রদোষ ও নায়িকা রাণীর ভীষণ প্রণয় ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং তাদের করুণ পরিণতির লিপিচিত্র রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পের কথা মনে পড়ায়।

১৩২৮, ভাদ্র, 'শান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত অলৌকিক রসের গল্প 'বিভীষিকা' পরে 'অশরীরী' নামে 'অশরীরী' ছোট গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩১ [পৃঃ ২০] — 'আরোগ্য স্নান' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি বিমুখ ও আরামপ্রিয় রামতনু কি ভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পরিশেষে প্রকৃতির উদার প্রাক্কণের শীতল স্পর্শে রোগমুক্ত হল তারই কাহিনী এটি। তেমন কিছু মুসীমানা দেখা যায় না এ গল্পে। পরে এই গল্পটি 'গল্পের মতো' পুস্তকে এবং ছোট গল্প সংগ্রহ (১ম খণ্ডে) স্থান লাভ করে। গল্পটির কাব্যিক অনুভূতি, কল্পনা ও পেলব ভাষা অনন্য সাধারণ। প্রকৃতিই যে মানুষের মুক্তিদাত্রী ও জীবনধাত্রী তা সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এখানে কাহিনী অপেক্ষা কাব্যিক বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পকারের হাত ধরে কবি চলেছেন এগিয়ে।

প্রমথনাথ তখন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। এইটি তাঁর প্রথম কোন বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট গল্প। তাঁর প্রতিভার মূল সুরটি এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমথনাথ বিশী একদিকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রিয়, পরিহাস-কুশলী ও বাঁকা কথার শর সজ্জানে অব্যর্থ-শিল্পী, অন্যদিকে তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক, কল্পনা-প্রিয় কবি। উক্ত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি তাঁর লেখায় শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয় বা প্রাধান্য লাভ করে। উক্ত গল্পটিতে ও পরিহাস প্রিয়, যুক্তিজ্ঞাল বিস্তারে পটু, যথার্থ বর্ণনা সিদ্ধ এবং সর্বোপরি প্রকৃতি-প্রেমিক ও কবি প্রমথনাথের সজ্জান সহজ লভ্য।

গল্পের শুরু নিম্নরূপ - 'সে আমাদের সঙ্গে একই ইন্সকুলে একই ক্লাসে পড়িত - তার নাম ছিল রামতনু। কিন্তু ছেলেরা নামটির পূর্বে ছোট একটি উপসর্গ জুড়িয়া দেওয়াতে তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আরাম তনু।' পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় এই নামকরণের ইতিহাস বা কারণ বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কৃত্রিম উপায়ে সে নিজের দেহ ও মনটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই সর্বদাই সে ঔষধে আবৃত থাকে। 'ওইবার সময় তিন চারিটি ঔষধের শিশি তাহাদের উৎকট গন্ধ লইয়া তাহার নিদ্রা পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।' এই কারণেই সহজে সে অসুস্থ হয়। তার অবস্থা তখন খুবই করুণ - 'খাটের উপর অগাধ লেপের তলায় রামতনুর এক পাশে তাহার মুখখানা দেখা যায় ক্লানেল ও কাপড় জড়ান।'

মাঝে মাঝে প্রকৃতির অপকল্প রূপ মাধুরী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার

শিরায় শিরায় জাগে চঞ্চলতা-' এক মুহূর্তে তাহার মনে হইল যেন সে মুক্তি সাগরের তীরে আসিয়াছে। একী আনন্দ! ঘরের ভিতরটিতে শোক-দুঃখ ব্যথা রোগের যন্ত্রণা; আর বাহিরে ওই চাঁদের আলোয় স্বর্গের কি স্বপ্ন মাখান আছে।' কিন্তু সংস্কার ও অভ্যাস যায় না। তাই সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ইতস্তত করে - সে ভাবতে লাগল জানালা খুলে দেবে কিনা। কৃত্রিমতা না স্বাভাবিকতা কোনটাকে বেছে নেবে সে। অবশেষে প্রকৃতি প্রেমিক ও কল্পনা প্রিয় কবি সত্তারই জয় হয় -' সে এক লাফ দিয়া যেন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল - - - তার জ্বরের জ্বালা, অসুখের সন্তাপ যেন অমৃত স্নানে জুড়াইয়া গেল। - - - - - রামতনু ভোর পর্যন্ত পাগলের মতো মাঠে মাঠে, ধানক্ষেতে, কাশবনে, নদীর তীরে, শিউলি তলায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মুক্তির স্বাদ সে পাইয়াছে।'

প্রমথ-প্রতিভার মৌল সত্তাটিই এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সত্তাটি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পছা অতিক্রম করে বিচিত্র বিষয় ও বিচিত্রতর রচনা কৌশলের পথ নির্দেশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আপন প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উজ্জীন রেখেছে। একনিষ্ঠ জীবনশিল্পী ও প্রকৃতি প্রেমিক কবি প্রমথনাথ রঙ্গ ব্যঙ্গ প্রিয় প্র. না. বি. কে গ্রাস করে আত্মপ্রাধান্য বজায় রেখেছে। এই সব কারণে এই প্রথম ছোট গল্পটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।

এই বছরেই আষাঢ় মাসে 'কল্লোল' পত্রিকায় 'সাগরিকা' নামক একটি রহস্য মেদুর কল্পনা-প্রধান রোমান্টিক প্রেমের গল্প প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য গল্পটিতে প্রমথনাথ সার্থক কবি শিল্পীর মতো 'অন্তহীন নিসর্গ-সৌন্দর্য-সমুদ্রের বালুচরে লুটিয়ে পড়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ার পঞ্চপ্রদীপে অতি সন্তর্পনে-সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর প্রেমানুভবের আরতি করেছেন।''১৯২ খরশান বুদ্ধি ও গভীর অনুভূতির সার্থক সম্মেলন ঘটেছে এখানে। গুঢ় উপলক্ষের সহায়ক হয়েছে সংহত শব্দ নির্বাচন যা গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

১৩৩১, ১৪ই অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বিষ্ণু শর্মা' ছদ্মনামে তিনি নূতন কথা মালার গল্প রচনা করেন। পরবর্তী কয়েকটি

সংখ্যাতেও চলে এই গল্প রচনা। কিন্তু এগুলি রঙ্গব্যঙ্গ ও রূপকের সংমিশ্রণ। তাঁর গল্প-গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ :—

১। *শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব—প্রথম গল্প-সংকলন* [১৩৪৮ সাল]—বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজ অবলম্বনে রচিত ২০ টি গল্পের সমষ্টি। ^{১৯০} গল্প রচনা-কৌশল প্রশংসনীয়; লেখার মধ্যে যুগপৎ জ্বালা ও বেদনা বিদ্যমান। গল্পগুলি যে নিছক হাসির খোরাক যোগানোর জন্য রচিত নয় তা বোঝা যায় ভূমিকায় লেখকের পরিহাসের ছদ্মবেশে সাবধানী বাণীতে—'ইহা পড়িয়া যদি বাঙালী পাঠক হাসে, তবে বুঝিব বাঙালী পাঠককে আমি যাহা ভাবিয়া আসিতেছি, তাহাই অর্থাৎ মূর্খ।'

'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' গল্পটি রচনা বা গল্প সংকলনটির উক্ত নামকরণের পিছনে তৎকালীন কিছু ইতিহাস আছে। খগেন্দ্র নাথ মিত্রের বাড়ীতে রবিবাসরের এক সাহিত্যসভায় সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তরুণ গবেষক প্রমথনাথ আমন্ত্রিত অতিথি, খগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যখন প্রমথনাথের পরিচয় দিলেন তখন শরৎচন্দ্র বললেন যে তিনি কখনো প্রমথনাথের নামই শোনেন নি। উদীয়মান সাহিত্যিক প্রমথনাথ এতে ক্ষুব্ধ হন। তিনি শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব গল্প ও গল্পগ্রন্থ রচনা করে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য এতে বিশেষভাবে ব্যথিত হন। প্রমথনাথ নিজেও কম ব্যথা পাননি। অবশ্য উক্ত নামকরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশকেরও কিছুটা হাত ছিল বলে শোনা যায়। কারণ এতে গ্রন্থটি দ্রুত বিক্রয় হবে বলে তাঁর ধারণা ছিল। 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব' একই কারণে অনুরূপভাবে নামাঙ্কিত হয়। শেষ গল্পে [রোহিনীর কি হইল] শরৎচন্দ্র কৃত বঙ্কিমের রোহিনী চরিত্র-সমালোচনাকে কটাক্ষ করে বঙ্কিমভক্ত প্রমথনাথ রোহিনী ও সাবিত্রীর তুলনামূলক চিত্রাঙ্কণ করেছেন। গল্পগুলি উপভোগ্য ও বিচিত্রস্বাদী। তবে উপহাস, বিরক্তি ও বিক্ষোভ দেখানোর প্রলোভন কোন কোন গল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। ফলে সেক্ষেত্রে গল্পরস বিশেষ দানা বাঁধতে পারেনি। পাঠকসমাজকে যিনি অমার্জিত রুচিবলে অবজ্ঞা করেন তার পক্ষে মূল পরিহাস অশোভন ঠেকে।

'ভৌতিক কমেডি' গল্পে ইতিহাস রস ও উদ্ভট রসের অপকল্প সংমিশ্রণ ঘটানো

১৯৩। *শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব*, ন-ন-লৌ-ব-লিঃ, বাইশ বৎসর, যন্ত্রের বিদ্রোহ, ঋণজাতক, ভৌতিক কমেডি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লানিং, চিত্রশিল্পের রিপোর্ট, আর্টফর আর্টসসেক, টিউশন, কাঁচি, অটোগ্রাফ, সিদ্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, নর-শাদুলসংবাদ, নির্বান, জি. বি. এস ও প্র. না. বি. বাঘদত্তা, নগেন হাঁড়ির ঢোল, ভেজিটেবল বোম, রোহিনীর কি হইল?

হয়েছে। " রাত্রি বারটা . . . বদলাইতেছে "- বর্ণনার মধ্যে ছোট গল্পের শরীরে কাব্যের আত্মা আবিষ্কার করা যায়। সঙ্গে আছে অসাধারণ নাট্যরস। ' আর্ট ফর আর্টস সেক ' গল্পে দেখা যায় যে শিল্প মনের ক্ষুধা মেটাতে পারলেও দৈহিক ক্ষুধা থাকে অতৃপ্ত। কারণ বাস্তব বড় কঠোর। ' সিদ্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী ' গল্পে বাঙালীর অন্তঃসার শূন্যতা সম্পর্কে বিকল্প কটাক্ষ করা হয়েছে। এক নামকরা মোটর কোম্পানীর এজেন্টকে কেন্দ্র করে রচিত একটি সুন্দর কৌতুক গল্প ' বাইশ বৎসর '। নাগর সভ্যতা ও গ্রামীণ সভ্যতার চিরন্তন ঘন্ট দেখানো হয়েছে ' যন্ত্রের বিদ্রোহ ' গল্পে। ' ঋণজাতক ' গল্পে বুদ্ধদেব ও গৌতমীর কথোপকথনের দ্বারা সংসারী মানুষের কাছে ঋণ গ্রহণের অপরিহার্যতা এবং তন্ত্রের সঙ্গে বাস্তবের সার্থক মিলন প্রয়াস লক্ষণীয়। ' নর-শাদুল সংবাদ ' বঙ্কিমের বিড়াল প্রবন্ধের অনুরূপ। পণ্ডকে মানুষের চেয়ে মহত্তর করা হয়েছে। নির্বাণ গল্পে সিনেমা একটরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

২। *শ্রীকান্তের ষষ্ঠপর্ব* (১৩৫১, মাঘ) — দ্বিতীয় গল্প সংকলন, মোট ১৫টি গল্প আছে।^{১৯৪} রঙ্গব্যঙ্গ প্রিয় প্র. না. বি-র পরিচয় অধিকাংশ গল্পে প্রকট। লেখকের জীবনবোধ গভীর বলেই প্রীতি ও মমতায় তার দুচোখে হাসি ও অশ্রু যুগপৎ উচ্ছলিত হয়। লেখক জানেন বস্তুতা ও সদুপদেশের চেয়ে গল্প শুজব ও পরিহাস অধিকতর হিতকর ও মনোজ্ঞ। চক্ষুস্থান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে বিদুষকের ভূমিকাটি সর্বার্থসাধক। কল্পনার প্রসাদে এমন এক দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন তিনি যাতে স্বর্গ মর্ত্যের সমস্ত অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত ও অবাস্তব অথচ সত্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। নন্দনকানন রোডের এক পুষ্প বাটিকায় বঙ্কিম-শরৎ সাক্ষাৎকার শুধু কৌতুককর নয়, সেই সঙ্গে চিন্তা-চেতনা-উদ্দীপক। শিক্ষক সমাজের মহাতত্ত্ব অধ্যবসায়ী ছাত্র উত্ক, সিদ্ধবাদ নাবিকের বেঘোরে পড়ে ' চাকরিস্তানে ' উপস্থিতি, ' স্বর্গীয় খাতাঞ্চী ' চিত্রগুপ্তের বঙ্গদেশ বৃত্তান্ত, বদ্ধ পাগল ও মুক্ত পাগলদের আচরণ, দুর্ভাগ্য খিসিস রচনার সহজ-সরল পদ্ধতি, অতি আধুনিক কবিতার মস্তে ভূত তাড়ানো-এসব বিশ্বাস করাও শক্ত, আবার অবিশ্বাস করাও কঠিন। দু' একটাতে স্পষ্ট ভাষণ মাত্রারিক্ত হওয়ায় লেখনীর হাঙ্কা চাল নষ্ট হয়েছে। সুন্দর শ্লেষ জমে নি। তবে সব মিলিয়ে গল্পগুলি বিশেষ হৃদ্য।

৩। *গল্পের মতো* - (১৩৫২ খৃঃ) ৮টি গল্পের সংকলন।^{১৯৫} লেখক নিজে গল্পের মতো

১৯৪। *শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব*, উত্ক, গগন, সরল খিসিস, রচনাপ্রণালী, অর্থপুস্তক, চাকরিস্তান, প্রফেসর রামমূর্তি, আধ্যাত্মিক ধোপা, চিত্রগুপ্তের এডভেঞ্চার, মারণযজ্ঞ, সদা সত্য কথা কহিবে, ভূতের গল্প, কাঙালী ভোজন, মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ, পরিস্থিতি।

১৯৫। গঙ্গার ইলিশ, পূজা সংখ্যা, কীটানুতন্ত্র, আরোগ্যস্থান, দ্বিতীয় পক্ষ, উন্টা গাড়ি, মাধবী মাসি, ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ।

বলে বিনয় প্রকাশ করলেও ছোটগল্প হিসাবে এর অনেকগুলি যে বিশেষ সার্থক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গঙ্গার ইলিশ, পূজা সংখ্যা, কীটানুভূত—গল্পত্রয় তিস্তা পরিহাস ও শ্বেষে চিত্তাকর্ষী, মধুর-সুন্দর। আবার রসাবেদনে প্রতিটি ভিন্নতর। দ্বিতীয় পক্ষ, উন্টোগাড়ি, মাধবী মাসি—বাস্তব জীবনের গভীরতর সুখদুঃখের কাহিনী এবং প্রায় প্রতিটি গল্পই অস্ত্রশীলা সহানুভূতিতে পূর্ণ। কাহিনীর মধ্যে ঘটনার তরঙ্গভঙ্গ বা জটিলতা বিশেষ কিছু দেখা যায় না। ছোট গল্পের ছোট পরিসরে যেন কোন সংজ্ঞাহীন, নামহীন ব্যথা, সঙ্ঘাতমেঘে সঙ্করণ জলছবির মতো ধীরে ধীরে উদ্ভিত হয়। আবার ক্ষণপরে বিলীয়মান হয়। 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পে রোমান্সিত রহস্য-পরিবেশ প্রস্ফুট। 'ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ'কে ঠিক গল্প বলা যায় না। তাহলেও বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার একটি হরগৌরী মিলন লক্ষ্য করা যায়।

'গঙ্গার ইলিশ' ও 'পূজাসংখ্যা' দুটি সরস গল্প। 'দ্বিতীয় পক্ষ', 'উন্টোগাড়ি' ও 'আরোগ্যদান'- মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। 'কীটানুভূতের' মতো রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল বললেও অত্যাঙ্গি হয় না।

৪। *গালি ও গল্প*: (১৩৫২) — ১৩টি গল্পের সংকলন। এই সংকলনেও বিচিত্র রসের সমাবেশ লক্ষণীয়। প্রায় প্রত্যেকটিতে প্র. না. বি-র নিজস্ব মৌলিক শ্বেষ ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ অশনি সংকেত সহ দ্রুতগতিতে সঞ্চারমান। 'অতি সাধারণ ঘটনা'য় করুণ রসের প্রস্রবণ প্রবাহিত। এটি দাম্পত্য শ্রেমবন্ধনের এক অশ্রুসজ্জল কাহিনী। বাংলা ছোট গল্পে এটি চিরস্থায়ী সম্পদরূপে থাকা হওয়ার যোগ্য। 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' গল্পে হাসির আড়ালে কশাঘাত উদ্ভূত হয়ে আছে। নিছক রস পরিবেশনেই এই গ্রন্থের সার্থকতা সীমাবদ্ধ নয়, অনেকেই এর মধ্যে আত্মপ্রতিফলন দেখে চমকিত হবেন। ফলে হাস্যরস উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা ও অস্বস্তি দেখা যায়। এগুলি যেন 'বিষকুস্ত পয়োমুখম', গল্পের মোড়কে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি গালিনিষ্কেপ।

প্র. না. বি-র তীর্থক ভাষণের দীপ্তিও সংক্ষিপ্ত, সংহত, উজ্জ্বল, সার্থক সুভাষিতাবলী আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। 'ভাঁড়ুদত্ত' গল্পটিতে লেখক ঐতিহাসিক নাম ও পরিবেশকে আধুনিক যুগের পটভূমিকায় নবরূপ দান করেছেন। আধুনিক বণিক-প্রধান সমাজ-মানসে আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হল ভাঁড়ুদত্তের 'একমাত্রা মকরধ্বজী হাসি'।

৫। *ডাকিনী* - (১৩৫২) — ৭টি গল্পের সমষ্টি। ১৯৬

১৯৬। ডাকিনী, পেঞ্চারবাবু, গদাধর পণ্ডিত, একগজ মার্কিন ও এক চামচ চিনি, সিদ্ধু, নীলমণির স্বর্গলাভ, ভূতপূর্ব।

প্রমথনাথ বিশী শুধু ব্যঙ্গরসের নিপুণ শিল্পী নন, সেই সঙ্গে তাঁর গভীর-গভীর জীবনচেতনাবাস্তব গল্প শুদ্ধও আছে। এগুলি সংখ্যায় স্বল্প হলেও স্বাদবৈচিত্র্যে ও রসগাঢ়তায় অনুপম। এই সংকলনের প্রায় প্রতিটি গল্পই জীবন রসরসিক প্রমথনাথের পরিচয় বহন করে। 'পেঙ্কার বাবু' ও 'গদাধরপণ্ডিত' গল্পদুটি রুঢ় বাস্তবের প্রতিচ্ছিত্র ও করুণরসের আকর। 'নীলমণির স্বর্গলাভ' একটি ভালুকের বন্দী জীবনের ব্যথা ও মুক্তির কাহিনী। এটিকে 'নীলমণির স্বর্গ' নামক উপন্যাসের খসড়া বলা যায়।

৬। *ব্রহ্মার হাসি*-(১৩৫৫)- ১৪টি গল্পের সমন্বয়ে গঠিত।^{১৯৭} এই গ্রন্থেও মিশ্ররসের গল্পস্বাদ লভ্য। একদিকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ, অন্যদিকে প্রেমের নিষ্ঠা ও গভীরতা, মানুষের পাশবিক আচরণ, রাজনৈতিক অনাচার ও ভ্রষ্টাচার তার আক্রমণের বিষয়। 'ব্রহ্মার হাসি' গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সিনেমার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, রাজনীতি দ্বারা স্বাধসিদ্ধির চেষ্টা বাঙালীর মজ্জাগত। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণে লেখক এ গুলিকে বিদ্ধ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মহত্ত্ব ও তাঁর অপমান ইঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা ও মানুষের পাশবিকতা বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক গল্প শার্দুলের শিক্ষা। আধুনিক কবিতা ও কবিকে ব্যঙ্গ করে লেখা 'পূজার রচনা', সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ বিষয়ে লেখা 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ'। 'স্টেশনে' গল্পে বেদনাবিধুর, স্মৃতিভারাক্রান্ত এক প্রেমিকের স্মৃতিচারণা বিধৃত হয়েছে। 'শকুন্তলা' প্রেমের গল্প হলেও এর আঙ্গিক কুশলতা অনন্যসাধারণ। কালিদাসের কালের সঙ্গে আধুনিক কালের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে। গভীর মানবিক চেতনাপুষ্ট করুণরসের প্রস্রবণ চিত্রিত হয়েছে 'সূতপা' নামক একটি সার্থক ছোট গল্পে। এখানে প্রমথনাথ মানবিক অনুভূতির এক অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক রূপকার। নিঃসঙ্গ সঙ্ঘাতারার মত এ গল্পের প্রেমনিষ্ঠা নায়িকা সূতপা সুখ-সূর্যের মুখ দেখার আগেই জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, / কে কখন ধরা পড়ে কে জানে।' - এই বাণী সার্থক হয়ে উঠেছে নিরঞ্জন ও প্রতিমার প্রেমের গল্প 'রত্নাকর' এ। রুঢ় বাস্তব সংসারে মাতৃভক্তি কিভাবে সম্ভানের ব্যর্থ চোখের জলে পরিণতি লাভ করে, কিভাবে তাকে নিরুপায় দর্শকের ভূমিকায় ওমরে মরতে হয়, স্ত্রী, পুত্র প্রতিপালন করতে গিয়ে মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন কিরূপ দুরূহ হয়ে পড়ে তারই অতিবাস্তব ও কারুণ্যসিক্ত গল্প 'মাতৃভক্তি'।

৭। *অশরীরী*:- প্রকাশকাল অমুদ্রিত, গল্পসংখ্যা ৮।^{১৯৮} 'দ্বিতীয়পক্ষ' গল্পটি পূর্বেই 'গল্পের মতো' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সব কটি গল্পই অলৌকিক রসান্বিত। 'অশরীরী'

১৯৭। *ব্রহ্মার হাসি*, গণ্ডার, শার্দুলের শিক্ষা, পূজার রচনা, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, শৃগালের মনুষ্যত্ব বর্জন, শকুন্তলা, সূতপা, রত্নাকর, মাতৃভক্তি, রাজকবি, অম্বকষ্ট, স্টেশনে হাতুড়ি।

১৯৮। *অশরীরী*, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, কপালকুণ্ডলার দেশে, কালো পাখী, নিশীথিনী, পুরন্দরের পুঁথি, শুভদৃষ্টি, দ্বিতীয় পক্ষ।

গল্পটি 'বিভীষিকা' নামে ১৩২৮, ভাদ্র, 'শান্তি' পত্রিকায় শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০ বৎসর বয়সের কাঁচা হাতের লেখা হলেও এবং গল্পটিতে মনস্তত্ত্বের সমর্থন না থাকলেও ভৌতিক পরিবেশ সৃজনে দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য গল্পটিকে অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। 'স্বপ্নলব্ধ কাহিনী'তে ফুলশয্যার রাতে নিহত অপাপবিদ্ধা পুষ্পকোরকের ন্যায় ইন্দিরার জীবনের ট্রাজেডি অলৌকিক রসের প্রবাহে বেদনাবিধুর করে তোলা হয়েছে।

'নিশীথিনী' গল্পে আরণ্য প্রকৃতির নৈশ চাঞ্চল্য ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি এক রোমাঞ্চ ও রহস্যময়তাকে ঘনীভূত করে তুলেছে। মোহময়ী জাদুকরীর বেশে নিশীথিনী প্রকৃতিকে মায়াপুরীতে পরিণত করেছে এবং এক অবাস্তব রহস্যলোকের অপরিচিত প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করেছে।

৮। *ধনেপাতা* - [১৩৫৯] মোট ছটি ছোট গল্পের সমষ্টি।^{১৯৯} নিবেদনে গল্পকার বলেছেন — "এই পুস্তকের গল্পগুলির মূল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে নিবদ্ধ। কোনটিই লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়। . . . এগুলি ইতিহাসের পাত্রে পরিবেশিত কল্পনার পানীয়।" সব কটি লেখাই ইতিহাসাশ্রয়ী। 'অসমাপ্ত কাব্য' ও 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন' গল্পদুটির নায়ক মহাকবি কালিদাস। অপূর্ব কৌশলে ইতিহাস ও কল্পনার রৌদ্রছায়ায় গল্পটির চিরন্তন রসসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'গুরু মারা চেলা' গল্পটিতে ইতিহাসের সমর্থন থাকলেও কল্পনার অতিরেক বাস্তবের সীমানাকে ছাঁড়িয়ে গিয়ে গল্পটির রস-পরিণতিকে হাল্কা করে দিয়েছে। 'মহেনজোদড়োর পতন' গল্পটি সমগ্র ভারতবর্ষের পতনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি। 'ধনেপাতা' গল্পের বাঙালী-নিন্দা যে ইতিহাস সমর্থিত সে বিষয়ে লেখক যথার্থ প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। গৌড়ীয় ছাত্রদের যে নিন্দনীয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার অন্তরালে লেখকের প্রচ্ছন্ন বেদনার ফসুধারা থাকলেও উক্ত ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল রূপটির ইঙ্গিত দিলেই মনে হয় চিত্রটি পরিপূর্ণতা লাভ করতো। এতদসত্ত্বেও গল্পটি নিঃসন্দেহে উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

৯। *চাপাটি ও পদ্ম* - [১৩৬২] - ১২টি ইতিহাসাশ্রিত গল্পের সমষ্টি।^{২০০} পূর্ব কথা অম্বায়ে লেখকের বক্তব্য- 'এই গ্রন্থের গল্পগুলি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিত। প্রথম গল্পটি কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে গোরার যে জন্ম বৃত্তান্ত আছে - তাহাই উপজীব্য। পরিবেশ কাল্পনিক নয়। বাকী এগারটি গল্প এই অর্থে ঐতিহাসিক যে

১৯৯। মহেনজোদড়োরপতন, মহালক্ষ্মী, অসমাপ্তকাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, ধনেপাতা, গুরুমারা চেলা।

২০০। সেইশিশুটি, জেমিগীনের আত্মকথা, কোকিল, ছিন্নদলিল, গুলাব সিং এর পিস্তল, ছায়া বাহিনী, মড, রুথ, নানাসাহেব, প্রায়শ্চিত্ত, রক্তের জের, অভিষাপ।

সিপাহী বিদ্রোহের কোন না কোন গ্রন্থে গল্পদ্বারা পাইয়াছি। 'গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন - 'সিপাহীগণ কর্তৃক সংকেত রূপে চাপাটি ও পদ্মফুল ব্যবহৃত হইত - তাই বই খানার নাম চাপাটি ও পদ্ম।'

উৎসর্গ অংশে মানব চরিত্রের রহস্য উন্মোচন-ব্রতী লেখকের গল্পগুলি লেখার মহতী উদ্দেশ্য অনুভব করা যায়।

' ভারতীয় কি ইংরাজ নগণ্য হয়েছে আজ
আমি দেখি মানুষের লীলা ॥
যে মানুষ দেশে কালে বিশ্ববিধাতার ভালে
রচিয়াছে নূতন নয়ন
তারি হাসি অশ্রুনিয় মনের মাধুরী দিয়ে
বুনি আমি বাঙময় বসন।'

সিপাহী বিদ্রোহ খচিত, ইতিহাস রসপুষ্ট উক্ত গল্পগুলি বৈচিত্র্য মন্ডিত হয়ে উঠেছে লেখকের বিচিত্র-স্বাদী প্রতিভার স্পর্শে। কোনটিতে সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে মিশেছে অলৌকিক রস [গুলাব সিং এর পিস্তল], কোনটিতে বাঙালীর জীবননিষ্ঠ, অতিবাস্তব চিত্র [ছিন্ন দলিল], কোনটিতে আছে রোমান্স ও রহস্যের স্পর্শ [ছায়া বাহিনী], কোনটিতে আছে ইংরাজ তরুণ-তরুণীর অন্তর্লোকে চিরন্তনী মানব-মানবীর হৃদয় লোক আবিষ্কার-প্রয়াস [জেমি গ্রীনের আত্মকথা, রুথ, মড]। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নানা সাহেবকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে - নানা সাহেব, প্রায়শ্চিত্ত, অভিশাপ, রক্তের জের প্রভৃতি গল্পগুলি।

১০। নীলবর্ণ শৃগাল - ১৩৬৩। - ২০টি গল্পের সমন্বয়পুষ্ট গ্রন্থ। ২০১ চিলা রায়ে গড়, পাশের বাড়ী প্রভৃতি রহস্য-রোমান্সপূর্ণ গল্পে কাহিনীর জাল এমনভাবে বোনা হয়েছে যাতে পাঠকের মনে ধীরে ধীরে তীব্র কৌতুহল জাগ্রত হয় এবং গোয়েন্দা কাহিনীর মত কাহিনীর পরিণতি জানতে আগ্রহী হয়। এ ছাড়া অবচেতন, ভৌতিকচক্ষু, খেলনা, ফাঁসি গাছ, বিনা টিকিটের যাত্রী, আয়নাতে প্রভৃতি গল্পগুলিতে অলৌকিক রসের অবতারণা করা হয়েছে। সাহিত্যে তেজিমন্দি, সংস্কৃতি, জামার মাপে মানুষ প্রভৃতি সাহিত্য বিষয়ক ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প; সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন - ইতিহাসাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প; 'সেই সম্যাসীটির কি হইল' বুদ্ধদেবের জীবন অবলম্বনে ইতিহাস-সূত্রে এক কাল্পনিক গল্প। থার্মোমিটার, গৃহিনী গৃহমুচ্যতে, গোস্ত ইঞ্জেকশন, রামায়ণের নূতন ভাষ্য, রাশিফল, অলঙ্কার, অদৃষ্টমুখী প্রভৃতি গল্পগুলি একান্তই কৌতুক, রসসিক্ত।

লেখকের বিচিত্রমুখী রচনা কৌশলের সন্ধান মেলে এই গ্রন্থে। প্রথম গল্প

২০১। অবচেতন, সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন, সেই সম্যাসীটির কি হইল, ভৌতিক চক্ষু, খেলনা, ফাঁসি গাছ, বিনা টিকিটের যাত্রী, আয়নাতে, চিলা রায়ে গড়, পাশের বাড়ী, সাহিত্যে তেজিমন্দি সংস্কৃতি, জামার মাপে মানুষ, থার্মোমিটার, গৃহিনী গৃহমুচ্যতে, গোস্ত ইঞ্জেকশন, রামায়ণের নূতন ভাষ্য, রাশিফল, অলঙ্কার, অদৃষ্টমুখী।

‘অবচেতন’ এ শুরুতে ‘অলৌকিক,’ ‘অত্যাশ্চর্য’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে এবং যে ‘শ’ বাবু গল্পটির কথক তার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে বেশ কৌতূহলজনক ও রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ‘সাহিত্যে তেজিমন্দি’তে রচনা কৌশল অতি সাধারণ ও সরল, প্রত্যক্ষ ও স্বজ্ঞ। লেখকের অনুপম বাকভঙ্গীর পরিচয় মেলে গোস্ত ইঞ্জেকশন গল্পে। যেমন- ‘স্ট্রীলোকের হৃদয় যে পরিমাণে কোমল ফুসফুস সেই পরিমাণে সতেজ ; আবার ‘অদৃষ্টমুখী’ গল্পের আরম্ভটি রূপকথাপ্রতিম - ‘কোন দেশে অদৃষ্টমুখী নামে এক অন্ধ বাস করিত।’

১১। অলৌকিক - [১৩৬৪] মোট ১৭টি গল্প আছে।^{২০২} এর মধ্যে তাত্ত্বিক গল্পটি ছাড়া আর সব গুলিই পূর্বে প্রকাশিত কোন না কোন গল্প-গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। তাত্ত্বিক গল্পটি অতিলৌকিক ও অপ্রাকৃতরসের একটা সার্থক ছোট গল্প। তবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব এর মর্যাদা হ্রাস করেছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ও পুস্তক প্রকাশকদের প্রতি নম্র ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করায় গল্পটিতে রসাতাস সৃষ্টি করেছে।

১২। এলাজি - [১৩৬৫] - ১৯টি গল্প-সংকলন।^{২০৩} এগুলির মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নামক ঐতিহাসিক গল্পটি ইতিপূর্বে ‘চাপাটি ও পদ্ম’ পুস্তকে প্রকাশিত হয়। অনেকগুলি গল্প যেমন এলাজি, এলশেশিয়ান ডগ, কৃষ্ণনারায়ণ সংবাদ, পকেটমারের প্রতিকার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, কলপ, একশ চুয়াল্লিশ ধারা প্রভৃতি বিশুদ্ধ কৌতুকরসাস্রিত। এদের মধ্যে শেষ দুটির আয়তন অতি হ্রস্ব। কোথাও কোথাও ক্ষুরধার ব্যঙ্গ একই সাথে হাসি ও চিন্তার খোরাক যোগায়। যেমন - টিকি, পঞ্চশীলা, সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ, ওরা প্রভৃতি। শ্রী ভগবানকে চাই গল্পে বামপন্থী রাজনীতিকদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। নূতন তীর্থ একটি মানব প্রেমের কাহিনী। হাতি গল্পটিও জীবন রস সমৃদ্ধ ট্রাজি - কমেডি। অধিকাংশ গল্পে হাসির অনাবিল স্রোত স্বতোৎসারিত।

১৩। অনেক আগে অনেক দূরে - প্রকাশকাল অমুদ্রিত।^{২০৪} ১২টি গল্প সংগ্রহ। এর

২০২। শুভ দৃষ্টি, স্বপ্ন লব্ধ কাহিনী, আয়নাতে, ফাঁসি গাছ, সিন্দুক, কপালকুন্ডলার দেশে, ঢিলা রায়ের গড়, নিশীথিনী, কালো পাখী, তাত্ত্বিক, অশরীরী, কিনা টিকিটের যাত্রী, ভৌতিক চক্ষু, পুরন্দরের পুঁথি, পাশের বাড়ী, খেলনা দ্বিতীয় পক্ষ।

২০৩। এলাজি, এলশেশিয়ান ডগ, ছোটগল্প-উপন্যাস রহস্য, টিকি, পঞ্চশীলা, ওরা, ওলটপালট পুরাণ, কৃষ্ণ নারায়ণ সংবাদ, পকেটমারের প্রতিকার, হাতি, একশ চুয়াল্লিশ ধারা, কলপ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, শ্রী ভগবানকে চাই, মরুভূমির প্রতিহিংসা নূতন তীর্থ, সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ, পলাশীর শতবার্ষিকী, প্রায়শ্চিত্ত।

২০৪। রাজা কি রাখাল, পরী, কোতলে আম, দর্শনী, আগম-ই গদ্যা বেগম, তিনহাসি, বেগম শমসুন্নাহ তোবাখানা, মহেনজোদড়োর পতন, মহালক্ষ্মী, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাভর্তন, ধনেপাতা। দ্বিতীয় সং - যুক্ত হয় নাদির শাহের পরাজয়, মৌলাবক্স বাহাদুর-শাহ-র বুলবুলি।

মধ্যে শেষ পাঁচটি পূর্বে ধনেপাতা গ্রন্থে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও তিনটি নূতন গল্পে সংযোজিত হয়। রাজা কি রাখাল, পরী, কোতলে আম, দশরী, আগম্-ই গম্মা বেগম, নাদির শার পরাজয়, মৌলা বক্স, বাহাদুর শা-র বুলবুলি প্রভৃতি ঐতিহাসিক গল্পগুলি মোঘল সম্রাটদের ও বাদশাহী আমলের ধ্বংসাবশেষকে ভিত্তি করে রচিত। 'তিন হাসি' সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন কল্পনামিশ্র কাহিনী; বেগম শমসুর তোষাখানা - প্রেম, হিংসা, লোভ ও প্রতিহিংসার সাদা-কালো রেখার একটি অপূর্ব জীবনচিত্র।

১৪। প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প - (১৩৬২) - ১৯টি গল্প। এদের মধ্যে তিমিজিল, রাঘব বোয়াল, চোখে আঙুল দাদা, ব্র্যাকমেল, জেনুইন লুনাটিক, ভগবান কি বাঙালী- প্রভৃতি গল্পগুলি নূতন, - বাকিগুলি পূর্ব-প্রকাশিত।

সাহিত্যে রসিকতা কখনও হৃদয়, কখনও বুদ্ধিগত ব্যাপার। প্রমথনাথের রসিকতার কোঁকটা শেষের দিকে। ফলে চোখে আঙুল দাদা, জেনুইন লুনাটিক ও ভগবান কি বাঙালী ইত্যাদি গল্প ছোট গল্পের প্রচলিত আঙ্গিক অস্বীকার করে কিছুটা রচনা ধর্মী হয়ে উঠেছে। তবে এগুলি যে উদ্ভাবনী বুদ্ধির সরস ফসল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জেনুইন লুনাটিক রচনায় কাহিনী আছে, আবার একটি রসিকের নীতি সিদ্ধান্তও আছে। গল্পগুলি যেন প্রসঙ্গানুরূপ মৌখিক রসালাপের অবিকৃত লিখিত রূপ। প্রমথনাথের এই স্বনির্বাচিত গল্পগুলির রসাবেদন ক্ষণস্থায়ী হলেও সেগুলি যে বিশেষ মূল্যবহন করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক একটি গল্প যেন রসের হাউই - মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে চিত্তকে চমকিত করে, কিন্তু কোন স্থায়ী রেখা মুদ্রিত করে না। গল্পকারের কাছে যে কোন ঘটনা বা ভাবনা অমূল্য বিষয়বস্তু। এবং সেই বিষয়ের মধ্যে বস্তুর অভাবকেও তিনি রসিকতার সাহায্যে আশ্চর্যভাবে পূর্ণ করতে সক্ষম। বিশ্বয়ের রঙে তার সমস্ত গল্পই রঙীন। এভাবে বাস্তবকে স্পর্শ করে কল্পনার বৃদ্ধি রচনায় ও হাস্যকর মুহূর্তের মর্মোদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন তিনি।

১৫। প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প - প্রকাশ কাল মুদ্রিত নেই। তবে উৎসর্গ পত্রে যেহেতু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা আছে সেহেতু অনুমান করা যায় যে ১৯৫০ খৃঃ পরে বা কাছাকাছি সময়ে এটি প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করণে ১৮টি গল্প ছিল। ২০৫

২০৫। চেতাবনী, ভিক্ষুক, কুকুর সংবাদ, মোটর গাড়ি, ঘোগ, অথকৃষ্ণার্জুন সংবাদ, ভগবান কি বাঙালী, চোখে আঙুল দাদা, লবঙ্গীয় উন্মাদাগার, সাবানের টুকরো, দুঃশাসনের শাস্ত্রী, মানুষের গল্প, শিখ, গাধার আত্মকথা, রত্নাকর, অধ্যাপক রমাপতি বাঘ, শিবুর শিক্ষানবিশী, অদৃষ্টসুখী, গুহামুখ।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'দুঃশাসনের' 'শাস্ত্রী' ও 'মানুষের গল্প' বাদ যায় এবং আরও ১৩টি গল্প সংযুক্ত হয়। ২০৬ 'যোগ' - উচ্চপদস্থ ধনী কর্মচারী বনাম দরিদ্র সাধারণ কর্মচারীর চিরন্তন সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য বিষয়ে অতিসুন্দর ও বাস্তবমুখী চিত্র। বর্তমান সমাজে চোরা কারবার ও দুর্নীতি যে ধর্মাচরণের বিকল্প স্থান গ্রহণ করেছে তারই স্বভাব-সুন্দর প্রতিচিত্র 'অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ'; 'সাবানের টুকরো' সামান্য উপকরণের সূত্রে একটি সার্থক গল্প বয়ন প্রয়াস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য গুজব যে কতখানি দায়ী তারই পরিচয় মেলে শিখ গল্পটিতে। এর নাটকীয় পরিসমাপ্তি চিত্তাকর্ষক।

১৬। প্র. না. বি র নিকৃষ্টতর গল্প - [১৩৬১] - প্রকাশকাল অমুদ্রিত। ২০টি গল্প সংগ্রহ। ২০৭ এদের মধ্যে জেনুইন লুনাটিক, রাখব বোয়াল, ব্রাকমেল, প্রভৃতি গল্পগুলি পূর্বেই প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ যে মনুষ্যত্ব নাশ করে ও পশুত্ব বৃদ্ধি করে তারই ইঙ্গিত আছে এক কাল্পনিক, আজগুবি, ভবিষ্যৎ-চিত্র বিধৃত 'পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস' গল্পে। কাকাতুরার উচ্চারণ ও অর্থসাদৃশ্যে 'চাচাতুরা' গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে। কৌতুক রসের আধার এই গল্পটি। 'বস্ত্রের বিদ্রোহ' একটি রূপক গল্প। রাজনৈতিক শোভাযাত্রাও বিপ্লবের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। খড়ম-এ গল্পের চেয়ে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যই সমধিক। শাদুল একটি অবিমিশ্র কৌতুক রসের গল্প। ব্রাকমেল - বুর্জোয়া ধনী ও স্বার্থাশ্রমী রাজনৈতিক নেতাদের অন্তঃসার শূন্যতা বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক রূপক। তিমিঙ্গি ল একটি অসাধারণ কৌতুক রসাত্মক গল্প। বর্তমান সাহিত্য জগতের অসারতাকে কটাক্ষ করে রচিত হয়েছে। 'বান্দীকির পুনর্জন্ম' সামান্য ঘটনা-শক্তির গর্ত থেকে অসামান্য কৌশলে অমূল্য গল্প-মুক্তা আবিষ্কার লেখকের প্রতিভার পরিচয় বাহী।

জীবনের স্বার্থেই মৃত্যুর প্রয়োজন - এই তত্ত্ব কথায়িত গল্প 'যমরাজের ছুটি'। 'ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা' নীরস প্রবন্ধ ধর্মী রচনা - গল্পের সরসতা বা কাহিনী সূত্র অনুপস্থিত। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পকে ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করা হয়েছে 'দক্ষিণ রায়ের

২০৬। ডাকিনী, পেস্কারবাবু, গদাধর পণ্ডিত, একগজ মার্কিন ও এক চামচ চিনি, সিদ্দুক, অতি সাধারণ ঘটনা, বিপত্নীক, চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ, একটি ঠোঁটের ইতিকথা, শকুন্তলা, মাতৃভক্তি, অন্নকষ্ট।

২০৭। পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, চাচাতুরা, জেনুইন লুনাটিক, বস্ত্রের বিদ্রোহ, খড়ম, শাদুল, ছবি, ব্রাকমেল, বান্দীকির পুনর্জন্ম, পুতুল, যমরাজের ছুটি, ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা, দক্ষিণরায়ের দক্ষিণ্য, ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যায়াম, শাপমুক্তি, রাখব বোয়াল, ইয়াসিন শর্মা এণ্ড কোং, সিদ্ধান্ত, পুকুরচুরি নরপশু সংবাদ।

দাক্ষিণ্য' গল্পে। পূজা সংখ্যা - পত্রিকা ও সাহিত্য-সম্পাদককে কটাক্ষ শরে জজরিত করা হয়েছে 'শাপমুক্তি'তে। বঙ্গ বিভাগ ও হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'ইয়াসিন শর্মা এন্ড কোং' - অতি রঞ্জন প্রয়াস গল্প রসকে ব্যাহত করেছে। সিদ্ধান্ত, পুকুর চুরি প্রভৃতি গল্পগুলি খুবই হালকা রসের; গভীরতা নাই - মনে কোন রেখাপাত ও করে না। 'নর-পশু-সংবাদ' -এ বাঙালীর প্রতি বিদ্রোহ আছে - যা অতিরঞ্জনের প্রলেপে অবাস্তব।

১৭। প্র. না. বি-র অমনোনীত গল্প - [১৩৬৪] - ১৬ টি গল্পে সমৃদ্ধ। ২০৮ এর মধ্যে তাত্ত্বিক, গভীর, ব্রহ্মার হাসি গল্পগুলি পূর্বে প্রকাশিত। জগবন্ধুর মোহ মুক্তি, নহষের অতৃপ্তি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, পক্ষিরাজ গাধা প্রভৃতি নামকরণের মধ্যেই কৌতুকসিদ্ধ প্র. না. বি-র প্রতিভা ধারার ইঙ্গিত মেলে। 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী' অলৌকিক রসের হলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। এর পত্রাশ্রয়ী গল্প রীতি নূতনত্বের পরিচায়ক। 'সতীন' গল্পে স্বামীর পত্র ও স্ত্রীর ডায়েরী উভয়ের সমবায়ে বিষয় বস্তু ও আঙ্গিক কুশলতা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ঘটনার আকস্মিকতা চমকপ্রদ।

'শাপে বর' গল্পটিতে দেবরাজ ইন্ডের তিরস্কারে স্বর্গচ্যুত জগবন্ধুর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ পূজা সংখ্যা পত্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনা ও দুর্ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার চতুরালি প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই গল্প সংকলনটি একাধারে লঘুকৌতুক ও গুরু তিরস্কারে পরিপূর্ণ।

'রজ্জুতে সর্প' গল্পে কাহিনী বয়নের কলাকৌশল, কৌতুহল সৃজনের কুশলতা প্রশংসনীয় শিল্প হয়ে উঠেছে। 'শাওড়ী' একটি বাস্তব রসাস্রিত গল্প। 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ' - পৌরাণিক কাহিনীর আধুনিক রূপায়ণ। বাজীকরণ ও 'পক্ষিরাজ গাধা' নীতিমূলক (Fables) - গল্প।

১৮। নীরস গল্প সংকলন - [১৯৫৭] - মোট ২৩ টি গল্পসম্ভারে পূর্ণ। ২০৯ এদের মধ্যে

২০৮। জগবন্ধুর মোহমুক্তি, নহষের অতৃপ্তি, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, পক্ষিরাজ গাধা, বাজীকরণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ, শাওড়ী, ভগবান কি বিজ্ঞাপন দাতা, রজ্জুতে সর্প, তাত্ত্বিক স্বপ্নাদ্য কাহিনী, সতীন, সিদ্ধুক, গভীর, ব্রহ্মার হাসি, শাপে বর।

২০৯। ন.ন. লৌ. ব. লিঃ, যুদ্ধের বিদ্রোহ, ঋণজাতক, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, সিদ্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, নরশাদুল কাহিনী, নির্যাস, বাঘদত্তা, নগেন হাড়ীর ঢোল, অশরীরী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, কপালকুণ্ডলার দেশে, গঙ্গার ইলিশ, কীটানুভব, দ্বিতীয়পক্ষ, উন্টাগাড়ী, মাধবী মাসী, বস্ত্রের বিদ্রোহ, গোম্পদ, ডাকিনী, কচ্ছি, বাঁশ ও কচ্ছি, কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড।

'গোপ্পদ', 'বাঁশ ও কঞ্চি' ও 'কুকুর-বিড়ালের কান্ড' ছাড়া অন্যগুলি পূর্বে প্রকাশিত। 'গোপ্পদ' অলৌকিক রসের অতি সাধারণ মানের গল্প। জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়াতে নায়েবের পৌষমাস ও জমিদারের সর্বনাশ বিষয়ে গল্প রচিত হয়েছে 'বাঁশ ও কঞ্চি'তে। লেখকের পশু প্রীতির নিদর্শন বিশেষতঃ বিপদের মুহূর্তে শত্রু ভাবাপন্ন পশুরা যে মৈত্রী বন্ধনে বদ্ধ হতে পারে যা মানুষের মধ্যেও দুর্লভ তারই ইঙ্গিতবাহী গল্প - 'কুকুর বিড়ালের কান্ড'।

১৯। গল্প পঞ্চাশৎ - [১৩৬৭] - পঞ্চাশটি গল্পের সংকলন। নহষের অতৃপ্তি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ, শাশুড়ী, স্বপ্নাদ্য কাহিনী, সতীন, রজ্জুতে সর্প, বাজীকরণ, তুচ্ছ প্রভৃতি গল্প এই সংকলনে নতুন প্রকাশিত হয়েছে। বাকীগুলি পূর্বেই প্রকাশিত হয়।
২০। সমুচিত শিক্ষা - প্রকাশ কাল অমুদ্রিত। ১৫ টি গল্পের সমষ্টি। ২১০ সবকটি গল্পই কোন না কোন গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত। আসলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রমথনাথ আমাদের দেশের শিক্ষা-জগতের বহুবিধ অসঙ্গতি ও ভ্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেয়েছেন এই গল্পগুলিতে। তিনি নিজে শিক্ষক বলেই শিক্ষার ক্রমাবনতি তাঁকে ব্যথিত ও চিন্তিত করে তুলেছে। যদি কঠোর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে সমস্ত শিক্ষাকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সচেতন ও সজাগ করা যায় একরূপ মহতী উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েই তিনি এই গল্প গুলি রচনা করেন। এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক গল্পগুলিকে উক্ত উদ্দেশ্যেই একটি গ্রন্থের পাত্রে একত্র পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় একজন প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রী নীলকণ্ঠ শর্ম্মার ছদ্মনামে যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তিনি লিখেছেন, তা গ্রন্থটির মর্মার্থ পরিচায়নে যথেষ্ট - 'আমাদের শিক্ষা জীবনের নানা দিকে গোল। সরকার, রাজনীতিক, অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি কেহই দোষ মুক্ত নন। লেখক ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জন দ্বারা শিক্ষা জগতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার গল্পগুলিকে হৃদয় হীনতার দৃষ্টান্ত মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়, কেননা ব্যঙ্গ করুণার বিকার, করুণার অভাব নয়।'

২১। যাহলে হতে পারতো - [১৩৬৯] - ১৬ টি গল্প সমষ্টি। ২১১ দর্জি ও প্রেম, ছাপ

২১০। গদাধর পণ্ডিত, শিবুর শিক্ষানবিশি, গাধার আত্মকথা, চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ, চাকরিপ্তান, সদাসত্য কথা কহিবে, অধ্যাপক রমাপতি বাঘ, প্রফেসর রামমূর্তি, আধ্যাত্মিক ধোপা, উত্ক, গণক, অর্থপুস্তক, সরল খীসিস রচনা প্রণালী, পশু শিক্ষালয়, ধনেপাতা।

২১১। উঠতি শুণ্ডা, পশু শিক্ষালয়, প্রত্যাবর্তন, দর্জি ও প্রেম, ছাপ সন্দেশ, রাধারাণী, একটি নখাটি ঘি, যার যেখা স্থান, প্রাণান্তকর গল্প, দৃষ্টিভেদে, কমলার ফুলশয্যা, কুন্দনন্দিনীর বিবপান, রক্তাতঙ্ক, রক্তবর্ণ শৃগাল, খুন্সিবিহার, নিচ্চখনের পরীক্ষা।

সন্দেশ, একটিন খাঁটি ঘি প্রভৃতি গল্পে সামান্য উপকরণের সূত্রে অসামান্য রসধারা আবিষ্কারের প্রতিভা প্রমাণিত। উঠতি শুভা, প্রাণান্তকর গল্প প্রভৃতিতে সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিষ্কিপ্ত হয়েছে। রাধারাণী, কমলার ফুলশয্যা, কুন্দনন্দিণীর বিষপান প্রভৃতি গল্প একালের কলমে সেকালের কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপসংহারকে মূলের কাহিনী ধারা ও চরিত্র বজায় রেখে আরও কিছু দূর টেনে নিয়ে প্রমথনাথ তাঁর কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মূলতঃ এই গল্পগুলির মধ্যেই গ্রন্থটির 'যা হলে হতে পারতো' নামকরণের সার্থকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রক্তাতঙ্ক, রক্তবর্ণ শৃগাল প্রভৃতি গল্পে কমুনিষ্টদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে আছে তুলসী নান্দী একটি সহজ সরল নিষ্পাপ, নির্লোভ বনফুলের অযতনে শুকিয়ে যাওয়ার করুণ আলোচনা। খুল্লন বিহার ও নিচ্চধনের পরীক্ষা গল্পে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সরল জীবনযাত্রা ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর সমস্ত গল্পগুলিকে কয়েকটি মূলভাগে বিভক্ত করা যায় — (১) রঙ্গব্যঙ্গ মূলক (২) বিবুদ্ধ কৌতুকরসায়ক (৩) গভীর জীবনচেতনাবোধক (৪) ঐতিহাসিক (৫) অতিপ্রাকৃত রসায়ক (৬) বিবিধ [সাহিত্য বিষয়ক, পুরাণ কেন্দ্রিক রূপধর্মী, প্রকৃতি প্রেমমূলক প্রভৃতি ।] রঙ্গব্যঙ্গমূলক বিভাগটিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা চলে — (ক) শিক্ষাবিষয়ক (খ) সাহিত্য ও সম্পাদনা বিষয়ক (গ) রাজনীতি বিষয়ক (ঘ) সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচার বিষয়ক (ঙ) ধর্ম ও দেবদেবী বিষয়ক। প্রতিটি বিষয় বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

(১) (ক) শিক্ষা বিষয়ক গল্প — প্রমথনাথ বিশীর জ্ঞাত শিক্ষক। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন, রিপণ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকত্বসূত্রে তিনি বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষার অসারতাও নানা ক্রটি-বিচ্যুতি তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে শুধু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করে এই ক্রটির জগদ্দল পাথরকে অপসারিত করা সম্ভব হবে না। এই কারণে তীব্র শ্লেষাত্মক ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি বাঙালীর চোখে আড়ুল দিয়ে এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষা জাতির হৃৎপিণ্ড, শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষার্থীরা জাতির অমূল্য সম্পদ। অথচ এগুলি সবই কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম নৈরাজ্য ও অবক্ষয়। তাই অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তীব্র শ্লেষের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে তিনি একাধিক গল্প রচনা করেছেন। সমুচিত শিক্ষা নামক গ্রন্থের সবকটি গল্পই শিক্ষা সংক্রান্ত। নীলকণ্ঠ শর্মা নামে একজন প্রধান শিক্ষকের ছদ্মনামে রচিত এই

গ্রন্থের ভূমিকাটি বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য।

'গাধার আত্মকথা' গল্পে শিক্ষক কিভাবে গাধায় পরিণত হয় তারই ব্যঙ্গ কৌতুকময় চিত্র আছে। অভিজ্ঞতা সত্য না হলে লেখকের এরূপ দুঃসাহস হোত না। গাধা তার আত্মকাহিনী বিবৃত করলেও আসলে সে রূপক। সেই রূপকের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে লেখকের ব্যঙ্গবাণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিদ্ধ করে অনায়াসে।

কিন্তু শিক্ষক জীবন যে কতখানি অভিশপ্ত ও বেদনা দায়ক তার মর্মান্তিক পরিচয় আছে এই গল্পে - 'এখন আমি নির্বিবাদে মাষ্টারি করিতেছি... গর্দভ জীবন ভালো ছিল'। ২১২

'শিবুর শিক্ষানবিশি' গল্পে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতা, গর্ভনিং বডি সকলের অন্তঃসারশূন্যতা অতিশয় নৈপুণ্য সহকারে অনাবৃত করা হয়েছে। 'সকলেই জানে যে, লেখা পড়া কিছু হইতেছে না, এমন করিয়া কিছু হওয়া সম্ভব নয়। তবু কেহ মুখ খুলিয়া বলিতে সাহস করে না, কারণ, কেহ শিক্ষক, কেহ পরীক্ষক, কেহ পরীক্ষার গার্ড, কেহ পুস্তকের দপ্তরী, আর কেহবা পুস্তকের লেখক। বর্তমান প্রথা অন্তর্হিত হইলে সকলেরই আয়ের ভোরণ হইতে মোটা রকমের খান কয়েক ইট খসিয়া যাইবে। অতএব—অতএব বিদ্যার প্রসার চলিতে থাকুক'। ২১৩ বাঙালী অপকৌশলে যে ডিগ্রী লাভ করে তার ভিত্তি এত শিথিল ও শূন্য গর্ভ যে ভারতের অন্য প্রদেশের কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সে স্থান পায় না। 'টিউশন' গল্পে একাধারে বাঙালী শিক্ষক সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্গতি ও তাদের হীন উজ্জ্বলতার প্রবণতাটি স্বল্পায়তনে সূচিত্রিত। 'সরল থিসিস রচনা প্রণালী' গল্পে আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। থিসিস রচনা প্রণালীর মূল সূত্রগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন - 'প্রথম থিসিসকে যতদূর সম্ভব নীরস করিবে। দ্বিতীয় থিসিসকে যত পারো দীর্ঘ করিবে।

... তৃতীয় মনে রাখিবে শাস্ত্রের চেয়ে ভাষা সর্বদা বড় হয়। অতএব একছত্র লিখিয়া অন্তত ত্রিশছত্র তাহার ফুটনোট দিবে। চতুর্থ এমন এমন বিষয় নির্বাচন করিবে, যাহাতে সাধারণের কোন আগ্রহ নাই। এবং কিছুতেই যেন থিসিসটি সুখপাঠ্য ও সরল না হয়'। ২১৪ 'গণক' গল্পে পরীক্ষার পর খাতার নম্বর গণনার জন্য পরীক্ষকদের মধ্যে যে রেয়ারেবি দেখা যায় তাতে কর্তব্যনিষ্ঠাপেক্ষা অর্থনৈতিক লোলুপতা ও স্বার্থপরতাই প্রকট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষকের ঔদাসীন্যে নম্বর গণনা যে প্রহসনে পরিণত হয় তারও ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান - 'আরে খাতা গুণতে কি ব্রেন লাগে'। 'চাকরি স্থান' গল্পে শিক্ষকদের জীবনের দুর্দশার নগ্নচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তারা বৎসরান্তে কোন প্রকারে কাগজে কলমে মাইনে পান, তাদের চাকরি নির্ভর করে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের

২১২। গাধার আত্মকথা - সমুচিত শিক্ষা - ১ম সং - পৃঃ ৩৬।

২১৩। শিবুর শিক্ষানবিশি - সমুচিত শিক্ষা - ১ম সং - পৃঃ ২৩।

২১৪। সরল থিসিস রচনা প্রণালী - তদেব - পৃঃ ১৩২-৩৩।

উপর, মুদি তাদের বাকীতে জিনিস দেয় না। এমন কি তাদের আত্মহত্যা দেখেও সাধারণ মানুষ মজা পায়। আসলে এদের উপর জাতি গঠনের, চরিত্র শোধনের দায়িত্ব দেওয়া আছে - তাই এরা আধ্যাত্মিক ধোপা।" আমরা উদরামের জন্য কেউ দর্জির দোকান করি, কেউ বড়লোকের বাড়ি ম্যানেজারি করি, কেউ ওকালতি করি, কেউ গরুর রাখাল ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের গরুর ঘাস নিজেই কাটি, আর যারা প্রাইভেট টিউশনের নামে ছাত্রের পিতার হাটবাজার করে তারা তো আমাদের মধ্যে নিতান্ত সাত্ত্বিক। দেশ শুদ্ধ লোকের ময়লা কাপড় কাচার ভার আমাদের উপর - আমরা আধ্যাত্মিক ধোপা।" ২১৫ কিংবা " পেটে ক্ষুধা নিয়ে কি জাতি গঠন করা যায়? যারা নিজের উদরামের সংস্থান করতে অক্ষম দেশের লোক তাদের উপর জাতি গঠনের ভার দিয়েছে, কি ভগ্নামি। ২১৬ এখানে শিক্ষকদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এত দৈন্য এখন নাই। বরং মাইনে বাড়লেও কর্তব্য নিষ্ঠার শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।

সেই সঙ্গে তাদের আত্মজ্ঞপ্তিরতা বিষয়ে ব্যঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয়েছে - চাকরিতে জীবনধারণ অসম্ভব জেনেও স্বাধীন ভাবে চাকরিতে চায় না কেউ " আমি হবো চাষা? আমি কালচারের পথ ছেড়ে এগ্রিকালচার ধরবো? কৃষ্টি ছেড়ে ধরবো কৃষণ? যিক!" ২১৭ শিক্ষকরাও হয়ে উঠেছে ফাঁকিবাজ। " ভূতপূর্ব রসূনের ব্যবসায়ী সম্প্রতি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক এক ক্লাসে যাইতে আর এক ক্লাসে, আর এক ক্লাসে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের ক্লাসে গিয়া উপস্থিত হন - তখন কেবল রেজিস্ট্রিমাত্র করিবার সময় থাকে "। ২১৮

উতর্ক গল্পে ছাত্রের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা প্রবণতা ও বাস্তববোধের অভাব কিভাবে অধ্যাপক মহাশয়ের আতঙ্কের কারণ হয় তারই করুণ চিত্র আছে।

'অর্থ পুস্তক' গল্পে আছে সহজ বিষয়কে জটিল করে একদল শিক্ষক কিভাবে ছাত্রদের সর্বনাশ করে তার প্রতি সুতীব্র কটাক্ষ। সাহিত্যিক, শিক্ষক ও চিকিৎসক অপেক্ষা সিনেমাষ্টারের সামাজিক মর্যাদা যে অনেক বেশী এই বাস্তব ঘটনাটি উপস্থাপিত হয়েছে 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' নামক গল্পে।

ভূতপূর্ব অধ্যাপক রামলাল চক্রবর্তী কিভাবে প্রফেসর রামমূর্তি হয়ে বাঘকে বশ করে সার্কাস খেলা দেখিয়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করেন তার প্রতি ব্যঙ্গ কৌতুকের ছটা নিক্ষিপ্ত হয়েছে 'প্রফেসর রামমূর্তি' গল্পে। যেমন কটাক্ষ পাই- 'বাংলাদেশের বাঘের চেয়ে সাহসী ছাত্রগণ তাহার বশীভূত, বাঘ তাহার কাছে কোন ছারা' ২১৯ অংশটুকুতে এবং কৌতুকের প্রকাশ লক্ষ্য করি নিম্নোক্ত অংশটুকুতে - 'কেবল

১২১৫। সমুচিত শিক্ষা - ১ম সং পৃঃ ১০৭

২১৬। তদেব, পৃঃ ১০৭।

২১৭। তদেব, পৃঃ ১০৯।

২১৮। তদেব, পৃঃ ৮৯।

২১৯। সমুচিত শিক্ষা - ১ম সং - পৃঃ ৯২।

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক এই আলোচনায় যোগ দেন না, তিনি তখন নিজের নাকের দোনলা বন্দুকে পরের নসোর বারুদ নীরবে বসিয়া পুরিতে থাকেন' । ২২০

বর্তমান কালের মতো প্রাচীন কালেও যে বাঙালী ছাত্রগণ শিক্ষককে মর্যাদা দিত না, না পড়ে পাশ করতে চাইত এবং বিলাসী ও পরমতাসহিষ্ণু ছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে 'ধনে পাতা' গল্পে ।

রঙ্গবাক্স শেষ পর্যন্ত যে কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে তারই করুণ আলেখ্য অঙ্কিত 'গদাধর পণ্ডিত' গল্পে । লেখকের এক চোখে ব্যঙ্গের খরশান দীপ্তি ও তীব্র বিদ্রূপ কটাক্ষ, অন্য চোখে সমবেদনা ও করুণার অশ্রু । হাসি ও যন্ত্রণাবোধ যেন একবৃন্তে দুটি ফুলের মতো অচ্ছেদ্য হয়ে আছে এই গল্পে ।

গদাধর পণ্ডিত গল্পটি জীবন রসিক শিক্ষক-লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি । চাকরি সূত্রে পল্লী সেবার এক মহানব্রত নিয়ে নরেশ চন্দ্র হাজির হয়েছে জোড়াদীঘি গ্রামে । সেখানকার পাঠশালার দরিদ্র পণ্ডিত গদাধরের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে । শশার মাচায় ছেলেদের যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়ার নমুনা দেখে নরেশ কৌতুক ও কৌতূহল অনুভব করে । কিন্তু এই কৌতুকবোধ ক্রমশঃ বেদনায় নীল হয়ে আসে যখন সে শোনে যে পণ্ডিতের মাইনা মাত্র চার টাকা, তাও ছয়মাস অন্তর ।

একদিন পাঠশালার পাশে গোশালা থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পায় যে ঝড়ে স্কুল গৃহ ভূপতিত হলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নবগৃহ নির্মাণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । ফলে গ্রামের সাহায্য পুষ্ট হয়ে নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং তাদেরই দাবী অনুযায়ী একাংশ হয়েছে সাধারণ গোশালা ।

ছাত্র সমাজকে সকলেই আমাদের দেশে গোরুর সমতুল্য মনে করে । তাই তাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা বা মাথাব্যথা নেই । তারা গরুর সঙ্গেই ওঠাবসা করে । কিন্তু নরেশের ধারণা জন্মায় যে এই সমস্ত ক্রটির মূলেই ঐ পণ্ডিত । কাজেই তার চাকুরী নাশের জন্য সে উপরিমহলে বিরূপ তথ্য জানিয়ে পত্রাঘাত করে ।

কিন্তু পরে সে অনুভব করে যে এই পণ্ডিত যার অর্থনৈতিক অবস্থা অতীব দীন এবং যার ভরণ পোষণের কোন ব্যবস্থা সরকার বা দেশবাসী করতে পারে না তার কাছে শিক্ষাকার্যে কতটুকু আন্তরিকতা বা সেবা আশা করা যায় । একদিন অকস্মাৎ ছুটির দিনে গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে নরেশ আবিষ্কার করে যে গদাধর পণ্ডিত এত দরিদ্র যে একখানি ধূতি তার সম্বল । ফলে কাপড় পরিষ্কার করতে গিয়ে তাকে গৃহিলীর একমাত্র কাপড়ের অর্ধাংশ পরিধান করে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় । এই দুর্দশা দেখে 'নরেশ হাসিবে কি কঁাদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান

করিল।'

বস্তুত পক্ষে শিক্ষক সমাজের বঞ্চনা ও অবহেলার এমন করুণ চিত্র দুলভ।

ইতিমধ্যে গদাধর চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। এ সংবাদ জেনে নরেশ যখন অনুতপ্ত ও মর্মান্বিত তখন গদাধর এসে জানালো - 'হজুর আমার চাকুরিটা গিয়াছে। এবারে বোধ হয় আমার দুরবস্থা ঘূচবে।' "সমুচিত শিক্ষার প্রথম গল্প গদাধর পণ্ডিত। এই গল্পটিতে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ ও সে বিষয়ে সমাজের হিমালয় সুলভ অটল উদাসীনতা নিয়ে প্রমথনাথ সম্ভবতঃ উপভোগ্য ব্যঙ্গ রচনা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু করেন নি।

দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষকের প্রতিবেদনা ও মমত্ববোধ তাঁকে এই শিক্ষকজীবনের অনিবার্য পরিণতির মর্মকেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেছে। একটি শিক্ষক কিভাবে অবহেলিত পশুর ধাপে নেমে আসে এবং সেই ভাগ্যকে নীরবে মেনে নেয় তা অনুভব করতে গিয়ে লেখক ব্যঙ্গের কলম খামিয়ে দিয়েছেন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ চিত্র এবং প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প।^{২২১}

প্রমথনাথ বিশী হৃদয়বান লেখক। তাই তিনি কঠোর ব্যঙ্গের চাবুক দিয়ে জাতির পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করার পরমুহূর্তেই কৌতুক ও করুণা রসের প্রলেপে তার জ্বালা নিবারণ করেন। সমালোচকের ভাষায় - 'প্র. না. বি.-র গল্প পড়ে এর পরেও যে হাসি পায় তার কারণ, যতটুকু যন্ত্রণা তিনি দিয়েছেন সয়েছেন তার চেয়ে বেশী। শিল্পী নিজে এই সমাজেরই তো সামাজিক একজন, তাই মনে হয় নিজের ডান হাতের আঘাত বাঁ হাত পেতেই যেন নিয়েছেন।'^{২২২} কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়। বিস্ময়-বিমূঢ়, সমাজ সেবার মোহ-পাশ-মুক্ত নরেশ সেই রাত্রেই চাকুরিতে ইস্তফা দিল, 'তারপর আর কখনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই এ কাজ করে। বেতন মোটা।'

'প্র. না. বি.-র তুনীরের শেষ বাণ নিষ্কিণ্ত হয়েছে এতক্ষণে, ফলে গল্প ও শেষ হতে পেরেছে। শেষ ছত্রে বিদ্রূপ কটাক্ষ আবার সাংকেতিকার মৃদু ব্যঙ্গনাবহ^{২২৩}।

(খ) *সাহিত্য ও সম্পাদনা বিষয়ক* :— সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু সার্থক ছোট গল্পে লেখকের রঙ্গ-ব্যঙ্গের স্পর্শ আছে। ভাঁড়ু দত্ত গল্পে মধ্যযুগের দুর্দশা যে বর্তমান যুগেও সচল তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'সমস্ত বাঙলা দেশ আজ দামুন্যায় পরিণত

২২১। আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় - (১৯৬৯) পরিমল গোস্বামী, পৃঃ ১২৫।

২২২। বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার পৃঃ ৬৩৭, ভূদেব চৌধুরী।

২২৩। তদেব।

হয়েছে। কালকেতুর তাড়নায় এই প্রকাশ্য অরণ্যের জীবজন্তুরা বিব্রত। তখন বাঙলা দেশে একটি মাত্র দামুন্যা ছিল - আজ প্রত্যেক গ্রামই এক একটা দামুন্যা।'

বর্তমান কালে নূতন সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার ভাঁড়ু দস্তের সেই 'মকরধ্বজী - হাসি' যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—'সর্বাধিক দাবির সার্বজনীন উত্তর আছে সেই হাসিতে।'

'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ' পর্ব গল্পে শরৎচন্দ্রের ভাবালুতা ও জীবন বোধের সীমাবদ্ধতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

'ভূতের গল্প'তে দুর্বোধ্য, ছন্দহীন, লালিত্যহীন আধুনিক কবিতাকে ভূত তাড়ানোর মন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে কঠোর ব্যঙ্গ বিদ্রোপের বিষয় করে তোলা হয়েছে। 'চিত্র গুপ্তের এডভেঞ্চার' গল্পে দেখান হয়েছে যে বঙ্গীয় সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্য প্রীতি বশতঃ বিভিন্ন বিদেশী নাম অনুসরণ করে আত্মপ্রাণ লাভ করে এবং পছন্দ না হলে যে কোন লেখকের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় গালি বা তাঁর বংশগত কালিমা লেপনে লিপ্ত হয়, উগ্র পানীয় গ্রহণ করে মারামারি করে এবং পকেট কাটতেও তারা দক্ষ।

'পরিস্থিতি' গল্পে সম্পাদকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। লেখক নিজের সম্পাদক জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগিয়েছেন।

'আমি একাধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সপ্তাহে ছয়দিন আমি সাংবাদিক, সপ্তম দিনের সেই আমিই সাহিত্যিক। . . . মাথার উপরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে, বাঁ হাতে রয়টারের সংবাদের কাগজের খন্ড, ডান হাতে কলম, কোলের কাছে সাদা কাগজ, সম্মুখে চলন্তিকা অভিধান আর আমি অবলীলাক্রমে অভিধান ও ব্যাকরণের ট্রেঞ্চ ও সিগফ্রিড লাইন অতিক্রম করিয়া সাংবাদিকতার সর্বধ্বংসী ট্যাঙ্ক চালাইয়া দিয়াছি। শুনিয়াছি ট্যাঙ্ক ভেদী কামান বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের অগোচরহীনতাকে ভেদ করিতে পারে এমন কামান কোথায় আছে? মনুষ্যত্ব বোধ থাকলে খাঁটি সাংবাদিক হওয়া যায় না—'তোমার মধ্যে এখনো মনুষ্যত্ব আছে, পূর্ণভাবে সাংবাদিকত্ব জাগে নাই। . . . তোমার চাকরি গেল।'

শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্বে, শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট রাজলক্ষ্মী, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্রকে ব্যঙ্গ করে এবং শরৎচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করে গল্প রচনা করা হয়েছে যদিও এই গল্পদ্বারা শরৎচন্দ্র ও প্রমথ বিশী দুজনেই বিশেষ ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন।

বহুগল্পে সাংবাদিকতা বৃত্তি ও সম্পাদনা বিষয়ে রঙ্গ রসিকতা করা হয়েছে। জি. বি. এস ও প্র. না. বি গল্পে সাংবাদিকরা কি পরিস্থিতিতে কাগজনিক সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য হন তার ইঙ্গিত আছে—'মাকড়সা যেমন করিয়া নিজের রস দিয়া জাল বুনিয়া তুলে, তেমনই করিয়া চিত্তা রসের দ্বারা সংবাদ বয়ন করিব।' আধুনিক দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে এই অপ্রিয় সত্য কথা বলার সাহস প্রমথ বিশীকে করেছে বিশিষ্ট।

'কাঁচি' গল্পে বলেছেন - 'এক সময়ে চুরি করিতাম এখন জর্নালিজম করি। আমরা নিজেদের বলি সাংবাদিক, লোকে কি বলে না বলাই ভাল। 'কিংবা' কাগজের কাটিং কেটে সেঁটে দেবে। এরই নাম জর্নালিজম। এতে লেখা পড়ার কি দরকার? আমরা হচ্ছি সরস্বতীর দর্জি।' 'পরিস্থিতি' গল্পে দেখানো হয়েছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ এবং লাইন মেপে সাহিত্য বা সাংবাদিকতা করতে হয়।

বর্তমান দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী সম্পাদককে এত বেশী টানাপোড়েন সহ করতে হয় যে তাকে দৃঢ় মানসিকতা ও শক্ত দেহের অধিকারী হতে হয়। 'গণ্ডার' গল্পে গনেশের শক্ত চামড়া দেখেই তাকে সম্পাদকের পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে - 'মালিক তাহার কথা শুনিয়া তাহার গায়ের চামড়া হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়া তখনই তাহাকে সম্পাদক পদে বসাইয়া দিলেন। ... হাঁ এতদিনে আঘাত সহ সম্পাদক জুটিয়াছে—ইহাকে আর মারিবার প্রয়োজন নাই।'

'পূজার রচনা' গল্পটিতে আধুনিক বাংলা কবি ও কবিতাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করা হয়েছে। বিদেশী নামের অন্তরালে বিদেশী কাব্যের অনুকরণে আধুনিক কবিসাহিত্যিকগণ সাহিত্যের সব শাখাতেই পদচারণা করে থাকেন। পূজা সংখ্যা পত্রিকার জন্য তারা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের পসরা সাজিয়ে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সদা প্রস্তুত—'অজয় নিবারণ বাবুর ঘরে প্রবশ করিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। পূজা সংখ্যা? কি চাই? কবিতা? পঞ্চাশ টাকা। না, না কিছুতেই তার কমে হবে না। আমেরিকা থেকে দেয় পাঁচশো ডলার, দেশের লোকের জন্য পঞ্চাশ টাকা। এটা কনসেশন!'

অপর পক্ষের সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া নিবারণবাবু একটি রেফ্রিজারেটর খুলিয়া ফেলিলেন - এবং একটি কবিতা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। 'এর ব্যাখ্যা হিসাবে সে বলেছে - 'আমার কবিতার ইউরোপীয়ান Atmosphere তাই তাকে ইউরোপীয়ান temperature এ রাখতে হয়। নতুবা নষ্ট হবার আশঙ্কা। 'শেষ পর্যন্ত টাকা নয়, একবাক্স সিগারের বিনিময়েই তিনি কবিতাটি বিক্রি করলেন। বাংলা সাহিত্য যে কতখানি পরানুকরণ প্রিয় ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে তার প্রতি কটাক্ষ করেই এই গল্পটি রচিত।

'রাজকবি' গল্পেও সাহিত্যিকদের তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে সাহিত্যিক নির্বাচনে মানুষ ব্যর্থকাম হলে পশুর উপর নির্ভর করা হয়েছে - 'মানুষে না পারিলেও পশুতে অবশ্যই যথার্থ সাহিত্যিককে চিনিতে পারিবে।' আসলে যত অযোগ্য লোক আজ সাহিত্যের আসরে ভিড় জমাতে চায়-তাই প্র. না. বি. র. ব্যঙ্গকুশলী লেখনী বলসে ওঠে - 'সাহিত্যিক হওয়ার পক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি নিতান্তই গৌণ, না থাকিলেও চলে, থাকিলেও ক্ষতি নাই।'

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্বে শরৎচন্দ্রের হৃদয়বেগ প্রাধান্যকে কটাক্ষ করা হয়েছে -

' উদরের মধ্য দিয়া বাঙালীর হৃদয়ে প্রবেশের পথ আবিষ্কারের গৌরব আমার । ' কিংবা—' এদের বুদ্ধিতে আপীল করতে হলে হৃদয়ে ঘা দিতে হয় । '

বর্তমান সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অন্তঃসার শূন্যতা ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্যকে ব্যঙ্গ করে তীক্ষ্ণ তরবারির মতো প্রমথনাথের কলম দীপ্ত হয়ে উঠেছে ' সিদ্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী ' গল্পে ।

" প্রশ্ন : সংবাদপত্র কি ?

উত্তর : মুখ্য যাহার লেখক, ধূর্ত যাহার সম্পাদক, গুস্তা যাহার প্রকাশক, শঠ যাহার স্বত্বাধিকারী, রাত্রে যাহা বিছানার চাদর, দিনে যাহা সংগ্রামের ধ্বজা, চুল ছাঁটিবার সময়ে যাহা জামা, ভাত খাইবার সময়ে যাহা টেবিল ক্লথ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা যাহা যৌনতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা তাহাই সংবাদপত্র । "

কবিতা প্রসঙ্গে এই গল্পে বলা হয়েছে -

' মানসিক কণ্ঠ্যনের কাগজিক আত্মপ্রকাশের নাম কবিতা । ' আসলে সৃষ্টি ধর্মী, সত্য নিষ্ঠ সাহিত্য রচনা ও সংবাদ প্রকাশনা ক্রমশঃ বিরল হয়ে ওঠাতে এবং অধিকাংশ চর্বিচর্বি ও কৃত্রিম হয়ে পড়াতে প্রমথ বিশীর সৃষ্টিধর্মী ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণে লিপ্ত হয়েছে ।

' নর শাদুল সংবাদ ' - গল্পে একত্র আছে - ' যতজন সংবাদ পত্র পড়ে তাহার অধিকাংশই পশু ' । নিশ্চয়ই এই সমস্ত ব্যঙ্গঅতীব স্থূল ও পীড়াদায়ক । কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্যই ছিল এই মুমূর্ষু জাতিকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্ৰোপের খোঁচায় আবার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা । এই কারণেই তিনি পরিমল গোস্বামীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ' গালাগালিতে এদেশের চৈতন্য হবে না - ঢিল ছুড়ুন ' । ২২৪ রোহিনীর কি হইল গল্পে পতিতা নারী চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বক্তৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রের নারী-দরদের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে । ' নূতন বঙ্গ ' গল্পে পত্রিকা-সম্পাদককে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্ধ করা হয়েছে । তিনি ' জ্ঞান সমুদ্রের সাবমেরিন । ' আর ' প্রতিদিনের দৈনিক কাগজ এক একটি টর্পেডো তার ঘায়ে যে কত মিলন, কত প্রণয়, কত মস্তিষ্ক, কত সভা ভাঙিতেছে তার ইয়ত্তা নাই । '

বিদ্যাচর্চা ও ধনোপার্জন এখন পরস্পরসাপেক্ষ । তাই ' সাহিত্যে তেজিমন্দি ' গল্পে লেখকের ব্যঙ্গ ও ফোভ ফুটে ওঠে - ' একালে লক্ষ্মী সরস্বতীতে আপোষ হইয়া গিয়াছে । লক্ষ্মীর বরপুত্র সাদা কাগজে হিজিবিজি কাটিলে তাহা যুগান্তকারী রচনা বলিয়া পুরস্কার পায়, আবার সরস্বতীর খাস দরবারে একবার নাম লিখাইতে পারিলে

বাড়ীর দরজায় প্রকাশক, প্রযোজক ও সম্পাদকদের গাড়ীর সংখ্যা আঙ্গুলের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যায়। 'বর্তমান যুগে দলাদলি, রাজনীতি ও অর্থ প্রাচুর্য সাহিত্যের পুরস্কার লাভে বিশেষ সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে থেকে এবং বিভিন্ন সাধারণ সাহিত্যিককে অসাধারণ পুরস্কার পেতে দেখে অভিজ্ঞ প্রমথনাথ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এই বাস্তব চিত্রের অবতারণা করেছেন।

আধুনিক সাহিত্যের বাজারে সারগর্ভ পুস্তকের পরিবর্তে বাহ্যিক চাকচিক্যই বড় হয়ে উঠেছে। 'এখন আমি মলাট ছাপি। অবশ্য দুই মলাটের অভ্যন্তরে খানকতক মুদ্রিত পৃষ্ঠা থাকে, কিন্তু সে নিতান্ত ঢাকের বাঁয়ার মতো, নিতান্ত না থাকিলে নয় বলিয়াই থাকে। . . . খন্দের আসিয়া মলাটের রঙ, রেখা ও বাহার দেখিয়া বই পছন্দ করে। . . . বাংলা মলাটের প্রশংসায় বাঙালী পাঠক পঞ্চমুখ, হইবেই বা না কেন, বাঙালী যে জ্ঞাত শিল্পী'। ২২৫ বিজ্ঞাপনের জোরে সাহিত্যের বাজারে যে অনাচার ও অরাজকতা চলছে প্রমথনাথ তাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেননি।

'বাস্মীকির পুনর্জন্ম' গল্পেও সাহিত্য বিহীন সাহিত্যিকদের প্রতি বিদ্রোহবোধ নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে। 'শাপেমুক্তি' গল্পটিও অনুরূপ - 'অমরনাথ অনুদার নয়, মানুষে যাহা সম্ভব সে করিয়াছে, একমাসে ৩৫০টি লেখা সে ছাড়িয়াছে, অবশ্য সবগুলি নিজে লেখে নাই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা কবে সব লেখা নিজেরা লেখে। অধিকাংশ রচনাই ছেলে মেয়ের স্কুলের খাতা ও গৃহিণীর হিসাবের খাতা হইতে গৃহীত, অমরনাথ কেবল নিজের নামটি সই করিয়া দিয়াছে।' বাংলাদেশে পূজা সংখ্যা পত্রিকা বার করার জন্য কল্পিত উৎসাহের জোয়ার দেখা দেয় - অযোগ্য ব্যক্তির কিভাবে সাহিত্যের বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় নামে তার পরিচয় পাই এই গল্পে। শাপত্রষ্ট দেবতা, নূতন বঙ্গপত্রিকার সম্পাদক, লেখকের স্ত্রী, পুত্র, ডাক্তার এমন কি লেখকের চাকরটি পর্যন্ত পূজা সংখ্যা লেখার জন্য লালায়িত।

'শাপে বর' গল্পেও পূজা সংখ্যা পত্রিকার প্রতি - শ্বেষ বর্ষিত হয়েছে। জগবন্ধুর মোহমুক্তি গল্পে সাংবাদিকতার নীতিহীনতা বিষয়ে চূড়ান্ত বিদ্রোহ বর্ষিত হয়েছে - আচ্ছা কাল রসাতল সংবাদপত্র সম্বন্ধে অত বড় একটা মিথ্যা লিখিলেন, তাহারা কি মনে করিবে!

— মনে করিবে নুনের গুণ গাহিতেছি। আবার রসাতল কাগজে চাকরি লইয়া গেলে বিশ্বস্তর কাগজের ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দিব।

— কিন্তু লোকে কি মনে করিবে?

— নিন, সব গেল, এখন লোকের কথা তুলিলেন। হ্যাঁ, দেশে লোক কোথায়

মশাই ? সব নাবালোক ।

— সাবালোক নেই ?

— সাবালোক ঐ একটি মাত্র — নিউজ এডিটর । আর তার বাবা লোক হইতেছে যাহাদের হাতে ক্ষমতা এবং অর্থ, অর্থাৎ সরকার ও বিজ্ঞাপনদাতা ।

কিন্তু সরকারকেও তো ছাড়িয়া কথা বলেন না !

অবশ্যই বলি না । তবে সবই আপোষে । কোনদিন সরকারের বিরুদ্ধে কি লিখিতে হইবে সেক্রেটারিয়েট হইতে কপি আসে ।

(গ) রাজনীতি বিষয়ক :— প্রমথনাথ ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে বামপন্থী রাজনীতির বিরোধী, ফলে অনেক গল্পেই তিনি বামপন্থী সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমকে ব্যঙ্গ করেছেন ।

অবশ্য বহুতর তাঁর একদেশদর্শিতা প্রকট হয়ে পড়েছে । নিরপেক্ষতা বা আত্মসমালোচনা তাঁর অন্যবিধ ব্যঙ্গ গল্পে ভারসাম্য বজায় রেখেছে । কিন্তু নিজের রাজনৈতিক মতবাদ [কংগ্রেসী নীতি] - এর কোন ভ্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের বিষয় না হওয়াতে তাঁর সাহিত্যিক সততা নির্মল হয়ে উঠতে পারেনি । অবশ্য কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত না করে সামগ্রিকভাবে রাজনীতিই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে । যেমন - ' এই পকেট কাটার দল সুযোগ পাইলে রাজনীতিক হইত, কিন্তু সেজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই । কারণ রাজনীতিক হইলে পকেট না কাটিয়া মানুষের গলা কাটিত ' । ২২৬ কিংবা -

' প্রশ্ন : রাজনীতি কি ?

উত্তর : রাত্রের ক্ষুধা উদ্বেক করিবার জন্য বাক্ ব্যায়াম । এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাবেলা আহূত হয় ' । ২২৭ বঙ্গদেশের আইন পরিষদে যে পারস্পরিক দলীয় কোন্দল ও কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা হয় তার প্রতি প্রমথনাথের লেখনী মুখর হয়ে উঠেছে । ' ভোটের জোরে সেখানে যা খুশি করা যায় - এমন কি সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে এই মিথ্যাকেও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ' । ২২৮

' হাতুড়ি ' গল্পে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল ঝাণ্ডাবাহী কম্যুনিষ্ট পার্টির নিন্দা করা হয়েছে । ' আমি এখন একজন বোলকলায় বিকশিত লীডার । বামহাত তির্যকভাবে কোমরে রাখিয়া রক্তশোষণকারী ধনিক সম্প্রদায়ের অদৃশ্য নাসিকার অভিমুখে দক্ষিণ হস্তের উদ্যতমুষ্টি আমার ছবি কে না দেখিয়াছে । ' ২২৯ 'শ্রী ভগবানকে চাই ' গল্পে ও

২২৬। ছোটগল্প সংগ্রহ (১ম) ইনডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং - পৃঃ ৪৭ ।

২২৭। তদেব - সিদ্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, পৃঃ ৬৯ ।

২২৮। তদেব - চিত্রশৃঙ্গের এডভেঞ্চার পৃঃ ১৫৪ - ৫৫ ।

২২৯। ছোটগল্প সংগ্রহ (২য়) হাতুড়ি - পৃঃ ৩৩৮ ।

কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহের তীক্ষ্ণ হলে বিদ্রোহ করা হয়েছে। তারা ভগবানকে মানে না, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে মানতে বাধ্য হয় ও আদর্শবাদ পরিত্যাগ করে। 'রক্তাতঙ্ক' ও 'রক্তবর্ণ' শৃংখল গল্পে কম্যুনিষ্টদের বিষয়ে ব্যঙ্গবাণ নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে।

এছাড়া সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি গল্প-বিদ্রোহ করেছেন। দেব দেবীরা যে ঘুষ খায় এবং ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এমন ইঙ্গিত আছে বিভিন্ন গল্পে। এছাড়া বাঙালী জাতি ও বাঙলা দেশকে রঙ্গিলা জাতি ও রঙ্গদেশ রূপে রঙ্গ-ব্যঙ্গে রঙীন করে তুলেছেন। বাঙালীর চারিত্রিক বিভিন্ন অসংগতি ও দুর্বলতা বিষয়ে তিনি বিদ্রোহবাণ বর্ষণ করেছেন। যেমন 'সেকেন্দার শার প্রত্যাভর্তন' গল্পে বাঙালীর পরিচয় - 'আমরা সকলেই সেই মহাভেটকের উত্তর পুরুষ। বিবর্তনের নিয়মানুসারে আমাদের গায়ের ভেড়ার চামড়া ক্রমে মানুষের চামড়ায় পরিণত হইলেও ভেড়ার চামড়ার সহিষ্ণুতা ও স্থূলতা প্রভৃতি গুণ আমাদের চরিত্র গত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। . . . জম্বুদ্বীপবাসিগণ আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলেও আমরা নিজেরাই নিজ মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রীট অর্পণ করিয়াছি।' কিম্বা অনুকরণপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মকলহ, জাতিবৈর, পরজাতি বিদ্বেষ সমস্তই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।'

(২) *বিশুদ্ধ কৌতুকরসাত্মক* :— বাকবৈদম্ব্য ও বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যঙ্গ তির্যক ভাষণে পটু হলেও প্রমথনাথের বিশুদ্ধ কৌতুকরসসিক্ত শুভ্র-সুন্দর গল্প সংখ্যাও কম নয়। যেমন—'থার্মোমিটার' গল্পে একটি শিশুর জ্বর কোন ডাক্তার বা ঔষধেই কোনক্রমে যখন কমে না তখন আবিষ্কৃত হল যে আসলে থার্মোমিটার যন্ত্রটি খারাপ থাকাতাই জ্বর সর্বদা ৯৯°তে থাকতো। শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ। অবশ্য এর মধ্যেও ডাক্তারদের অজ্ঞতা বিষয়ে সূক্ষ্ম বা পরোক্ষ কটাক্ষ আছে। কিন্তু কৌতুক রসই প্রধান। গোল্ড ইনজেকশন অনুরূপ আর একটি গল্প। নারীর কাছে অলঙ্কার যে সর্বরোগহর মহৌষধ সেই বিষয়ে কৌতুকপূর্ণ কাহিনী। অদৃষ্টমুখী, রাশিফল, এলাজ্জি, এলসেশিয়ান ডগ, কৃষ্ণনারায়ণ সংবাদ, পকেটমারের প্রতিকার, একশ চুয়াল্লিশ ধারা, ফ্যামিলি প্লানিং, একগজ মার্কিন ও একচামচ চিনি, গুরুমারা চেলা, চেতাবনী, সাবানের টুকরো, শিখ, চাচাতুয়া, শাদ্দুল, ছবি, তিমিঙ্গিল, পুতুল, রাখব বোয়াল, পুকুর চুরি, ছাপ সন্দেশ, দর্জি ও প্রেম, নহষের অতৃপ্তি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ, ভগবান ও বিজ্ঞাপনদাতা, রজ্জুতে সর্প, বাইশ বৎসর, অটোগ্রাফ, বাঘদত্তা, ভেজিটেবল বোম, উতঙ্ক, গণক, মারণযজ্ঞ, গঙ্গার ইলিশ, পূজা সংখ্যা প্রভৃতি গল্পে কৌতুকরস স্বতোৎসারিত। অবশ্য লেখকের ব্যঙ্গ প্রবণতা বা ব্যঙ্গপ্রীতি অধিকাংশ কৌতুকরসাত্মক গল্পের উপর ব্যঙ্গের ছিটে দিয়েছে। মিষ্টস্বাদের মধ্যে একটু ঝালের স্বাদ যোগ করে এর বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মূল রস কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

(৩) *গভীর জীবন চেতনাবোধক* :— উক্ত কৌতুকরসাত্মক গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি

লেখকের গভীর জীবনোপলব্ধির স্মারক হিসাবে এবং গল্প-শিল্পের চরমোৎকর্ষে অসাধারণ সার্থকতাও সমুন্নতি লাভ করেছে। লেখকের অনুভূতি, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, গভীর জীবন সমুদ্রে ডুব দিয়ে অমূল্য অভিজ্ঞতার পেটিকায় রত্ন আহরণের প্রচেষ্টা, অনন্য সাধারণ ভাষা, আঙ্গিকের নূতনত্ব ; অসংখ্য, অমূল্য, সংহত ও সংক্ষিপ্ত, রসঘন, প্রবচনমূলক বাক্যের ঔজ্জ্বল্য ও গভীরতা গল্পগুলিকে মূল্যবান করে তুলেছে। বাস্তবের উপাদান নিয়ে গল্পগুলি তৈরী হলেও সে গুলি আমাদের বস্তুর অতীত এক অচিন্তনীয় ও মধুর রসলোকে নিয়ে যায়। গল্পগুলি শেষ হওয়ার পরেও যেন একটা অচরিতার্থতাবোধ আমাদের কৌতূহলকে বাড়িয়ে দেয় - এবং আমাদের ভাবনার শিখাটিকে উসকে দেয়।

গদাধর পণ্ডিত, পেস্কার বাবু, ডাকিনী, সুতপা, মাধবী মাসী, অতি সাধারণ ঘটনা, প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি গল্পের মধ্যে একটা সুস্বন্দিত কারুণ্যধারা ফসু শ্রোতের মতো নীরবে প্রবাহিত। 'পেস্কার বাবু' গল্পে বৃদ্ধ কর্মপ্রেমিক রতনমণি বাবু তার অবসর গ্রহণের পর যেভাবে নবযুগের উদীয় মান তরুণ অফিসারের কাছে অবাস্তিত ও লাঞ্চিত হয়েছেন তার নির্ভুরতা এবং তারই শোকে দেহ ত্যাগের কারুণ্য চিত্রিত হয়েছে।

'ডাকিনী' গল্পে শিক্ষিতা সুন্দরী পুত্র বধু মল্লিকা কিভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন শাওড়ি ও স্বামীর বিরাগভাজন হয়ে ক্রমশঃ অকালে মরে গেল তারই সঙ্করণ ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। মৃত্যুর পরেও সে তার নিকট আত্মীয়দের সমবেদনা পায়নি, এটাই তার জীবনের চরম ট্রাজেডি। বিপত্নীক, অদৃষ্টসুখী প্রভৃতি গল্পে জীবনের, জগতের ও দেহ-মনের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা বা স্বার্থপরতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গল্পগুলির কারুণ্য তত নিবিড় নয় - বরং প্রচ্ছন্ন হাস্যরস পরিলক্ষিত হয়। 'হাতি' গল্পটির মধ্যে জমিদারের অন্তায়মান সৌভাগ্য-রবির করুণ চিত্র দুঃখাবহ হলেও শেষাবধি হাতির উপস্থিত বুদ্ধিতে মেয়ের বিবাহ সমস্যার মধুর সমাধান - গল্পটিকে ট্রাজি-কমেডির কিরীটী-শোভায় ভূষিত করেছে। 'নূতন তীর্থ' গল্পে মানব প্রেমের জয়গাথা রচিত হয়েছে।

অভিজ্ঞতার সূতো দিয়ে জীবনের তাঁতে বোনা এক অপূর্ণ কারুণ্যময় শিল্প-বসন রচিত হয়েছে সাবানের টুকরো, একটিন খাঁটি ঘি, যার যেথা স্থান প্রভৃতি গল্পে। সামান্য ঘটনা শুক্টিতে অসামান্য গল্প মুক্তা আবিষ্কার করে লেখক পাঠক-সাধারণের বিস্ময় বিস্তৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। জীবন প্রেমী ও গল্প শিল্পী প্রমথনাথ উক্ত গল্পগুলিতে হয়ে উঠেছেন অনবদ্য। গল্পের দেহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে - স্থান কালের গভী অতিক্রম করে এগুলি যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৪) ঐতিহাসিক :— প্রমথনাথ বিশীর বিচিত্র গল্প-সম্ভারে ঐতিহাসিক গল্পগুলি অমূল্য

সম্পদ । সাধারণতঃ - ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত । কিন্তু ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে তেমন কোন আলোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়নি । তবে এটুকু বলা যায় যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো ঐতিহাসিক ছোটগল্পেও মূল কথা ইতিহাস রস ও ঐতিহাসিক পরিবেশ বজায় রাখা । সেখানে মুখ্য চরিত্রগুলি ও মূল কাহিনী ইতিহাস সম্মত হলেও কল্পনার স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত নয় । তবে লেখক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন - ' ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি' । ২০০

প্রমথনাথের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মুকুট ও দালিয়া নামে দুটি ঐতিহাসিক গল্প রচনা করেছেন । অবনীন্দ্রনাথ রাজকাহিনী গ্রন্থে ঐতিহাসিক গল্পের জাল বুনেছেন । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ঐতিহাসিক গল্প লিখেছেন । তবে তাঁর গল্পগুলিতে ইতিহাসের স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিত কাহিনীর উপর রোমান্টিক প্রলেপ দেওয়া হয়েছে বলে সেখানে কল্পনার বৈচিত্র্য লীলা প্রদর্শনের সুযোগ বেশী । ২০ টির উপর ঐতিহাসিক গল্পের রচনা করেছেন প্রমথনাথ । ' মহেন্দ্রজোদড়োর পতন ' গল্পটি প্রাগৈতিহাসিক অভিধা দাবি করতে পারে । মহেন্দ্র-জো-দড়োর সভ্যতা ধ্বংসের কারণ দুটি — সিদ্ধুদের বন্যা ও আর্য জাতির আক্রমণ । পন্ডিতদের এই আনুমানিক কারণ দুটি অবলম্বনে লেখক সেই যুগ পরিবেশকে সুন্দর ভাবে রূপায়িত করেছেন । অবশ্য সেই সঙ্গে লেখক উক্ত নগরীর উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের চূড়ান্ত বিলাসিতাকে এর অন্যতম কারণ বলে মনে করেছেন । অতিরিক্ত কল্পনা প্রয়োগে যাতে গল্পের ইতিহাসরসকে ব্যাহত না করে সেই মাত্রাজ্ঞান লেখক সর্বত্র বজায় রেখেছেন । 'রাজা কি রাখাল' গল্পে ক্ষেত্র বিশেষে আলমগীর আরঙ্গজেব যে একজন ভিখারিণীর চেয়েও কত দীন ও দুঃখী তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্যের দাবী করতে না পারলেও এখানে বাদশাহের ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মূল সত্তাটি ও মানসিকতাটি ইতিহাসসম্মত ।

'ধনেপাতা' গল্পটির ঐতিহাসিক ভিত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দশোপদেশ গ্রন্থে কাশ্মীর প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই বর্ণনা থেকে শ্রী নীহার রঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যা লিপিবদ্ধ করেছেন এই গল্পটির উৎস তাই । ' অসমাপ্ত কাব্য ' ও ' যক্ষের প্রত্যাবর্তন ' গল্প দুটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হলেও এগুলির মধ্যে কল্পনার প্রাধান্য অধিকতর ।

মহালক্ষ্ম গল্পে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আগমন উপলক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী

চন্দ্রশেখর ভাগ্যাবেষণ ও দৈবক্রমে এক গ্রীক রমণীর প্রণয়-ডোরে আবদ্ধ হওয়ার মধুর রোমান্টিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। পরী গল্পে মোঘল সম্রাজ্যের পতনের পর দুর্দশাগ্রস্ত, অনাহারক্লিষ্ট বেগমদের যে করুণ ছবি চিত্রিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্মত। কোতলে আম গল্পে অত্যাচারী পারস্য সম্রাট নাদির শার দিল্লি বাসের সঙ্গে একজন দেশীয় সুন্দরী নর্তকীর বৈপরীত্যে পূর্ণ বিচিত্র মানসিকতার সুন্দর অভিব্যক্তি দেওয়া হয়েছে। 'দশনী' গল্পটিও অতীব মনোমগ্নকারী, নাটকীয়। ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর কল্পনার কারুকার্যে বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক। 'বেগম শমসুন্দর' তোষাখানা গল্পে ইতিহাস রস ও মানব রসের হরগৌরী মিলন ঘটেছে— প্রেম, প্রতিহিংসা, লোভ ও লালসা মানবজীবনের অনিবার্য করুণ পরিণতি ডেকে এনেছে। 'ছিন্ন মুকুল'—এ সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ইংরাজ প্রেমিক বাঙালীর কাপুরমুখতা ও মোসাহেবীয়ানার কথা বলা হয়েছে। তবে তারক বাঙালীর গৌরব। কেননা সে ইংরাজের চাটুকার নয় — যথার্থ দেশপ্রেমিক।

সিপাহী বিদ্রোহকে অবলম্বন করে প্রমথনাথ বিশী একাধিক ছোট গল্প রচনা করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখকের পড়াশুনা প্রচুর - তারই ফলশ্রুতি পাই লালকেল্লা উপন্যাসে।

প্রথম জাতীয় জাগরণ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এই বিদ্রোহ যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে সজাগ ও সক্রিয় করে তুলেছিল সে বিষয়ে অনেকেই একমত। এই বিদ্রোহের নায়ক রূপে চিহ্নিত নানাসাহেবকে কেন্দ্র করে একাধিক গল্প রচনা করেছেন প্রমথনাথ। লেখকের মতে — সিপাহী বিদ্রোহের কোন কোন গ্রন্থে গল্পাঙ্কুরগুলি পাইয়াছি। কেবল নানাসাহেব গল্পটিতে কিছু স্বাধীনতা লইয়াছি। 'তিনহাসি, অভিশাপ, রক্তের জের, প্রায়শ্চিত্ত, রুথ, মড, ছায়াবাহিনী, কোকিল, জেমিগ্রীনের আত্মকথা, গুলাব সিং এর পিস্তল প্রভৃতি গল্পগুলি ইতিহাসের পটে কল্পনার চলচ্ছবি। লেখক স্বীকার করেছেন যে ঐতিহাসিক গল্প রচনা করা খুবই কঠিন কাজ - 'ইতিহাস ও গল্প দুয়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া কলম চালনা কঠিন, সর্বত্র পারি নাই, সর্বত্র পারা যায় না।' তবুও লেখক যে সার্থক ঐতিহাসিক গল্প রচনায় কৃতকার্য হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগম-ই গল্পাবেগম গল্পটি ইতিহাসের রক্ষা শিলাতলে করুণরসের অফুরন্ত নিব্বর। 'পলাশীর' শতবার্ষিকী গল্পে অঙ্কিত হয়েছে ইতিহাসের পটে অতিপ্রাকৃতের ছবি।

- (৫) অতিপ্রাকৃত রসাত্মক :— অজ্ঞানাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। রহস্যপ্রিয় মানুষ তাই রহস্য গল্পের ভক্ত। কোন অশরীরী সত্তা মানুষের পরোক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। নানা বস্তুর মুখ ঘুরে এই ধরনের রহস্য কাহিনীকে কৌশলে পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। রহস্যঘন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠকের

কৌতুহলকে ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন করে যে সব ভৌতিক কাহিনী পাঠকমনে একটি রোমাঞ্চকর ভীতিরসের উজ্জীবন ঘটায় সেগুলিই সেরা অতিপ্রাকৃত গল্পের মর্যাদা লাভ করে থাকে।

অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত রসের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু প্রভৃতিও এই পথে সার্থকভাবে পদচারণা করেছেন। প্রমথনাথ বিশী তাদের যোগ্য উত্তরসূরী। কৌতুকপ্রিয় প্রমথনাথের প্রায় সব ধরনের গল্পেই কৌতুক রসধারা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের মর্মদাহ অনুভূত হয়। কিন্তু অতিপ্রাকৃত রসাত্মক গল্পগুলি এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে লেখক কৌতুক বা ব্যঙ্গের পরিবর্তে গা ছমছম করা, আতঙ্কময় একটা ভৌতিক পরিবেশ রচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ভৌতিক গল্পের মতো প্রমথনাথের গল্পে মনস্তত্ত্বের কোন নিগূঢ় সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। ত্রৈলোক্যনাথের মতো কৌতুকরসের প্রবাহ বা রাজশেখর বসুর মতো ব্যঙ্গ তির্যক বিশ্লেষণ প্রমথনাথের ভৌতিক গল্পে সুলভ নয়। তবু ভূতের গল্পকে যথার্থ ভূতের গল্প হিসাবে ফুটিয়ে তোলার প্রতি লেখকের সযত্ন প্রয়াস তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর নয়। লেখকের মতে— 'শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন ভূতের গল্প গল্পের রাজা। কথাটা মিথ্যা নয়। ভূত আছে কিনা জানি না, তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গীর উপরে' ২০১ এই ভঙ্গীটি যে লেখকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন অলৌকিক রসের গল্পে।

আসলে অতিলৌকিক গল্পে ইচ্ছা করেই পাঠকের যুক্তিবাদী মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় যাকে কোলরিজ বলেছেন - *Willing suspension of disbelief*. — অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই অলৌকিকের মধ্যে জীবন সত্যেরই অন্বেষণ করে ফিরি। কারণ জীবনের মতো রহস্যময় বস্তু আর কি আছে। ভীতিরসের যে নিজস্ব সৌন্দর্য আছে তা কবিকল্পনা ও শিল্পচেতনার সাহায্যে সুন্দর ও মনোহারী করে ফুটিয়ে তুলে আনন্দরস পরিবেশন করা হয় এই ধরনের গল্পে। প্রমথনাথের গল্পগুলি আলোচনা করলেই তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। 'চিলারায়ের গড়' গল্পটিকে রহস্যমেদুর ও রোমাঞ্চকর করে তুলবার জন্য সুদীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে লেখক পাঠকের আগ্রহকে শান দিয়ে তীক্ষ্ণতর ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। রহস্য রোমাঞ্চে ভরা এই গল্পের মধ্যেও আছে করুণরসের ফসুধারা - 'এ কাহিনী নাটকে আর চোখের জলে পূর্ণ'। ২০২ পরিবেশটি ছায়াছন্ন, মায়াময়। ঘরের মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী, স্তিমিত আলোতে, দেয়ালে মস্ত দুটি ছায়া, বাড়ি নির্জন, বাহির নির্জনতর, নিস্তব্ধতার আর অন্ধকারের যুগল আস্তরণে চরাচর নিরেট নীরজ্জ করিয়া জড়ানো। ২০৩

২০১। খেলনা - নীলবর্ণ শৃগাল - পৃঃ ৬৫।

২০২। চিলারায়ের গড় - তদেব পৃঃ ১০৭।

২০৩। তদেব - পৃঃ ১০৭-১০৮।

'পাশের বাড়ি' গল্পের পরিত্যক্ত, নির্জন বাড়ীটিকে ঘিরে রহস্যের জাল যখন অচ্ছেদ্য এবং ভৌতিক রস যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই বাস্তবের কঠোর পদার্পণে সেই রহস্যের যবনিকা পতন ঘটেছে। এই কারণে পরিণতিটি ঠিক ভৌতিক গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকেনি। 'আয়নাতে' গল্পে দীর্ঘকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত এক হত্যালীলার বীভৎসতা ও কারুণ্য কিভাবে প্রতি রাত্রে বিরাট অটালিকার সেই সুসজ্জিত কক্ষের সুন্দর একটি আয়নার উপরে ছায়াভিনয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটায় তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'বিনা টিকিটের যাত্রী' গল্পে ট্রেন ফেল করা একটি ভদ্রলোক কিভাবে স্টেশন মাষ্টারের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি রহস্যময় ভৌতিক কাহিনীর শ্রোতারূপে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন তারই ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। এখানেও কৌশলে সেই ভয়াল পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে — 'বাহিরে অন্ধকারে শীতের মধ্যে ঝিঝির একটানা আওয়াজে রাত্রির নিস্তরুতা ঝিমঝিম করিতেছে—পৃথিবীতে আর যেন কোন শব্দ নাই। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় আমরা চারিটি প্রাণী চারিটি ছায়া লইয়া নীরবে বসিয়া আছি। মাষ্টারবাবু বলিতেছেন '। ২৩৪ খেলনা গল্পে রহস্যমেদুরতা থাকলেও একটি মৃত শিশুকে ঘিরে তার পিতা মাতার স্নেহ ভালোবাসা মাখা স্বপ্নময় কল্পজগতের আশা আনন্দের খেলাঘর কিভাবে বাস্তবের কঠিন আঘাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রান্ত রেখায় তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কালো পাখী ও ভৌতিক চক্ষু গল্পদুটিতে দুই আঘাত প্রকোপে কিভাবে দুটি নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু ঘটেছে তারই বিষাদাচ্ছন্ন ও ভয়ঙ্কর প্রতিলিপি অঙ্কিত হতে দেখি।

'অবচেতন' নামের গল্পটিতে এক অতিপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক বনস্থলীর মধ্যে লেখকের যে অবাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা যেন লেখকের অবচেতন মনের কোন অচরিতার্থ কামনার বিকৃত রূপায়ণ ও কল্পজগতে চরিতার্থতা অন্বেষণ। এই ভয়াত ও শিহরিত মনোবিশ্লেষণ অনেকটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হয়। আসলে লেখক তাঁর অলৌকিক গল্পগুলিকে সচেতন ভাবেই রহস্যমন্ডিত করে রেখেছেন - বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত করতে চান নি— 'বাদানুবাদে নামিতে আমি অপারগ ; যাহারা খুশি বিশ্বাস করিবেন, যাহারা খুশি নয়, অন্যথা করিবেন '। ২৩৫

এছাড়া তাঁর অলৌকিক গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দ্বিতীয় পক্ষ, তাত্ত্বিক, ভূতের গল্প, স্বপ্নাদ্য কাহিনী, গোম্পদ, অশরীরী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, কপালকুণ্ডলার দেশে, নিশীথিনী, পুরন্দরের পুঁথি, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি। গুলাব সিং এর পিস্তল গল্পটির কাহিনী ঐতিহাসিক হলেও পরিবেশ ও পরিণতি অনেকখানি অলৌকিক। অশরীরী

২৩৪। বিনা টিকিটের যাত্রী - নীলবর্ণ শৃগাল - পৃঃ ৮৫-৮৬।

২৩৫। অবচেতন - নীলবর্ণ শৃগাল - পৃঃ ৪।

গল্পটির মধ্যে অবচেতন মনের রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। স্বপ্নাদ্য কাহিনীতে লেখক ভূতের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'ভূত এবং ভগবান দুইই প্রমানাতীত ও বিশ্বাসঘাতক'।^{২৩৬} তাত্ত্বিক, ভূতের গল্প প্রভৃতির মধ্যে ইতস্ততঃ রঙ্গব্যঙ্গের প্রলোভন গল্পের অলৌকিক রসকে অনেকখানি ফিকে করে দিয়েছে। সর্বাসীন বিচারে প্রমথনাথের অলৌকিক রসের গল্পগুলি লেখকের বিচিত্রমুখী প্রতিভার এক অসাধারণ ফলশ্রুতি এবং বাংলা গল্প সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

(৬) রূপক ও নীতিমূলক গল্প:— সাহিত্যে শিল্পে রূপক ও প্রতীক দুটি বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। রূপকের মূলধর্ম প্রতিকল্প সৃষ্টি করে ব্যাখ্যা করা। রূপকে একটি আপাত প্রবহমান অর্থ থাকে। কিন্তু এই অর্থের পাশাপাশি আর একটি অন্তর্নিহিত অর্থ রূপকের আবরণে লুপ্ত থাকে। এই আভ্যন্তর অর্থ উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত ইঙ্গিত বা কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে। এই সব কারণে রূপকের আবেদন মূলতঃ বুদ্ধি ও মননশীলতার কাছে এবং রূপক অনেকখানি উদ্দেশ্যমূলক। বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী একটি বিশিষ্ট রূপক গল্প। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাকে অনাবৃত করাই এর উদ্দেশ্য। প্রমথনাথ আমাদের শিক্ষা, ধর্ম, সামাজিক অনাচার, অসঙ্গতি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করে একাধির রূপক গল্প রচনা করেছেন। 'জামার মাপে মানুষ' গল্পে সংসারে বিশেষতঃ সাহিত্য জগতে আসল বস্তুর অপেক্ষা তার ভড়ং বা শাঁস অপেক্ষা খোলারই আদর যে বেশী তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য' গল্পে দেখানো হয়েছে সংসারে যারা বাস্তববুদ্ধিহীন ও অলীক কল্পনা বিলাসে মগ্ন থাকে তাদের সংসার থেকে সুখ ও শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়। অলঙ্কার গল্পে দেখা যায় যে অলঙ্কার কদাচ ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে না তা থাকা না থাকা সমান। আছে এই কল্পনাই যেখানে আনন্দের কারণ সেখানে অলঙ্কারের পরিবর্তে ইষ্টকথণ্ডকেই অলঙ্কার কল্পনা করলেও আনন্দের কোন ঘাটতি হয় না। পঞ্চশীলাতে আমাদের গৃহীত দেশকল্যাণ নীতি ও সেই নীতিকার্যে প্রয়োগের যে অসঙ্গতি তাই তুলে ধরা হয়েছে। 'টিকি' গল্পে আছে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অসারতা। 'সিন্দুকতন্ত্বে' আছে টাকা প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও টাকার খ্যাতি বজায় রাখার চেষ্টার উপকারিতার কথা। 'ওরা' তে আছে হিন্দী ভাষাভাষীদের প্রতি বাঙালীর উন্নাসিকতা, নির্ভরতা এবং নিজেদের অকর্মণ্যতা। 'ওলট পালট পুরাণ' গল্পে দেখানো হয়েছে যে সংসারে অর্থ, প্রতিপত্তি ও ধর্মের আনুকূল্য লাভের মূল কথা তাত্ত্বিক ও তৎস্থানিক সত্যকে চিরন্তন সত্যের উর্ধ্বে ঠাঁই দেওয়ার ক্ষমতায়। 'সিংহ চর্মাবৃত গদর্ভের' রূপকে হিন্দু মুসলমানের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্পের ভয়ঙ্কর রূপ এবং

আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাহেবী পোষাক পরিধানের বাস্তব সুবিধার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'ঋণজাতকে' আছে — জগতে মৃত্যু ও ঋণ গ্রহণ চিরন্তন নিয়ম। 'সদা সত্য কথা কহিবে' গল্পে দেখানো হয়েছে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে সত্য কথা বলতে না পারলে ইহলোকে ও পরলোকে কষ্টের সীমা থাকে না। অর্থাৎ তাত্ত্বিক না হয়ে ব্যবহারবাদী হওয়া উচিত।

শাদুলের শিক্ষা, শৃগালের মনুষ্যত্ব বর্জন, ভিক্ষুক-কুকুর সংবাদ, চোখে আঙ্গুল দাদা, দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য, ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যায়াম, রাঘব বোয়াল, নর-পশু সংবাদ, রক্তবর্ণ শৃগাল, রক্তাতঙ্ক, ধমনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রভৃতি রূপক গল্প। পক্ষিরাজ গাথা ও বাজীকরণ নীতিমূলক গল্প। পক্ষিরাজ গাথাতে লেখক বলেছেন— 'গল্পটির অন্তর্নিহিত নীতি এই যে গাধার ডানাই গজাক, ডিগ্গি লাভই হোক, সভাপতিত্বই জুটুক কিম্বা সম্পাদকত্ব বা অধ্যাপক পদ যাহাই জুটুক না কেন, গাধা সর্বদাই গাধা— তাহার বেশী কিছুই নয়'। ২৩৭ 'বাজীকরণে' গাধার ঘোড়া হওয়ার মধ্যে মূর্খের পণ্ডিত এবং ভিখারীর রাজা হওয়ার বিড়ম্বনার কথা বলা হয়েছে।

(৭) সাহিত্য বিষয়ক - প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন ধারা সংযোজনের কৃতি অগ্রপথিক। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে গল্প রচিত হলেও বাংলা সাহিত্যকে গল্পের বিষয়ীভূত করা এই প্রথম। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিখ্যাত চরিত্র, কাহিনী বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি একাধিক গল্প রচনায় ব্রতী হয়েছেন। রসিক সাহিত্যিক প্রমথনাথ এই সব গল্পের মাধ্যমে মূল চরিত্র বা কাহিনীর রস-উৎসকে অব্যাহত করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাণীর বরপুত্র কালিদাসকে অবলম্বন করে রাজকবি, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি গল্পগুলি রচনা করেছেন।

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ও শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব নামক গল্প দুটি রচিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী, ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও জীবন-দর্শনকে তিনি পরিহাসরসে সিক্ত করে, কখনও ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করে নবতর রূপদান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের গোরা শৈশবে কিভাবে সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিকূল মাৎস্যন্যায়ের সময় মাতৃ-পিতৃহীন হয়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু ও আনন্দময়ীর আশ্রয় লাভ করেছিল লেখক কল্পনা নেত্রে তা উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন 'সেই শিশুটি' গল্পে। 'কমলার ফুলশয্যা' গল্পে কবিগুরু নীলাদ্রি উপন্যাসের রমেশ-কমলা-নলিনাক্ষের জীবনের জটিল সমস্যার এক ভিন্নতর সমাধান চিত্র অঙ্কন করেছেন।

'বিষবৃক্ষ'-তে কুন্দনন্দিনী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা খেমে গেলেও প্রমথনাথের কল্পনা তাকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছে—সে বেঁচে উঠে কমলমণির আশ্রয়ে থেকে বিদ্যাসাগরের উৎসাহে শিক্ষিতা হয়ে একটি স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হয়েছে এবং সূর্যমুখীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনুরূপ পতিপুত্র পরিবৃত সংসার জীবনের ব্যর্থ স্বপ্ন দেখেছে।

'রাধারাণী' গল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী ও চরিত্র প্রমথনাথের সৃষ্টি ধর্মী লেখনীর স্পর্শে নবরূপ ধারণ করেছে। তাই এটি এযুগের কলমে সে যুগের কাহিনী। যুগান্তরের লেখকের হাতে তাই নায়ক-নায়িকার মিলনের পরিবর্তে ঘটেছে রোমান্টিক বিচ্ছেদ।

পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রকে প্রমথনাথ বহুক্ষেত্রে যুগোপযোগী বেশভূষা ও মানসিকতায় সজ্জিত করে নতুন গল্প রচনা করেছেন — কখনও তার মধ্যে কৌতুক প্রিয়তা, কখনও রঙ্গব্যঙ্গ, কখনও রূপক দ্যোতনা প্রাধান্য লাভ করে গল্পগুলির স্বাদবৈচিত্র্য ও রূপসজ্জা বৃদ্ধি করেছে। কবি প্রমথনাথের সৃষ্টিধর্মী কল্পনা যে কত সুদূর প্রসারী তারই পরিচয় মেলে স্বর্গ ও দেব দেবীদের এই নরায়ণ ও নবায়ণে। ন - ন - লৌ - ব - লিঃ, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, কঙ্কি, ব্রহ্মার হাসি, রামায়ণের নূতনভাষ্য, ওলটপালট পুরাণ, চোখে আঙ্গুল দাদা, যমরাজের ছুটি, জগবন্ধুর মোহমুক্তি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ, অটোগ্রাফ, চিত্র গুপ্তের এডভেঞ্চার, কীটানুতঙ্গ, প্রভৃতি এই ধরনের গল্প। নিচ্চধনের পরীক্ষাও খুন্স বিহার গল্পদুটি বৌদ্ধধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তাপুষ্ট।

সাহিত্য বিষয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্প ভাঁড়ু দত্ত, প্র-না-বি-র সঙ্গে কথোপকথন, ভূতের গল্প রোহিনীর কি হইল, জি-বি-এস ও প্র-না-বি, কপালকুন্ডলার দেশে, শকুন্তলা, বাস্মীকির পুনর্জন্ম, শাপে বর প্রভৃতি।

প্রেমের গল্প : কল্পনা সম্পদে স্বল্প কবি প্রমথনাথ প্রেমের গল্প রচনায় সিদ্ধি লাভ করলেও তিনি তুলনামূলক বিচারে প্রেমবিষয়ক গল্প বেশী রচনা করেন নি। কারণ লেখকের ভাষায় — 'ব্যঙ্গ লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। . . . ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে?'^{২৩৮}

এতদসত্ত্বেও প্রমথনাথের প্রেমের গল্পের কয়েকটি অসাধারণ মহিমা লাভ করেছে। 'শকুন্তলা' গল্পে কালিদাসের শকুন্তলা কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অতীশ ও

মালতীর প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম জীবনে তাদের প্রেমে রোমান্টিক মোহ থাকলেও বিবাহের পর বাস্তব সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে সেই রোমান্সের স্বর্গ থেকে বঞ্চিত, কঠিন বাস্তবে পতনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'সুতপা' গল্পে দুঃখের পারাবার পার হয়ে প্রণয়কুণ্ঠিতা সুতপা নিজ প্রেমিকের সঙ্গে শান্তির নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করার মুহূর্তে দেখলো তারই আশ্রিতা ও ভগ্নীসমা শিক্ষয়িত্রী রমা তাঁরই প্রেমিকের সঙ্গে প্রণয় সম্পূর্ণ। তখন সে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের স্বরূপ রমার কাছে প্রকাশ করেছে। সুখের ক্ষণপ্রভা মিশে গেছে অমানিশার ঘনাক্ষকারে। উন্টাগাড়ি, মাধবী মাসী, ছবি প্রভৃতি গল্পে আছে বয়স্ক নায়ক বা নায়িকার যৌবনের বেদনাসুরভিত স্মৃতিচারণা। 'অতি সাধারণ ঘটনা' গল্পটি বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের দাম্পত্যজীবনের কঠোর সংগ্রাম ও পরাজয়ের এক মর্মস্পর্শকাহিনী। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেমের গভীরতা ও আত্মত্যাগের মাধুরী গল্পটির ট্রাজেডিকে করে তুলেছে নিবিড়তর ও মহিমময়। মানবপ্রেমিক গল্পকার এখানে বেদনাক্লান্ত, মৃত্যু পথযাত্রী চরিত্রদ্বয়ের সঙ্গে সহমর্মিতা সূত্রে একাত্ম হয়ে উঠেছেন। 'চেতাবনী'-তে আছে প্রেমের সার্থকতার পথে প্রকৃতির সহায়তা। 'প্রত্যাবর্তন'-এ নিঃস্বার্থ প্রেমের জয়পতাকা উড্ডীন করা হয়েছে। নিবারণ বাবুকে তুলসী মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল - জীবন তুচ্ছ করে ভয়ঙ্কর রোগের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল এবং নিবারণ বাবুর মৃত্যুর পরে নীরবে সমস্ত সম্পত্তি ও বাড়ীর দাবি তুচ্ছ করে আবার সেই অরণ্য প্রান্তরে পূর্বস্থলীতে প্রত্যাবর্তন করেছে। সেখানে তার অসহায়, করুণ পরিণতির কথা চিন্তা করে চোখে জল আসে। বাস্তবজ্ঞান ও স্বার্থপরতার উদ্দেশ্যে প্রেমের প্রোজ্জ্বল মূর্তি সংস্থাপনে তার মহাত্মার প্রতি শির নত হয়ে আসে এবং পরবর্তী জীবনধারা বর্ণিত না হলেও শেষ হয়ে হইল না শেষ - এই ভাবনার রেশটি করুণ সুরের মুচ্ছনা তোলে।

গল্প শিল্পী প্রমথনাথ বিনী : প্রমথনাথ বিনীর রঙ্গ-ব্যঙ্গে ভাস্বর ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। লেখক শুধু অন্যকে নিয়েই রঙ্গ-ব্যঙ্গের আসর জমান নি, নিজেকে নিয়েও তিনি বিভিন্নভাবে রসিকতা করে আনন্দ ভোগ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে রঙ্গ-পরিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদানরূপে লেখক নিজেকে নির্দেশ করেছেন। প্র. না. বি.-র সঙ্গে কথোপকথন, প্র.- না. - বি.- র সঙ্গে ইন্টারভিউ প্রভৃতি গল্পে প্রমথনাথ ও প্র.- না. - বি.- কে লেখক যখন আলাদা করে দেখাতে চান তখন লোকে সে কথা ভালো বুঝতে পারে না যে কোনটা ঠিক। লেখক তখন শিশুর মতো মজা উপভোগ করেন পাঠকের সেই রহস্যজালে জর্জরিত দূর্দশা দেখে — 'এ বড় মন্দ মজা নয়, আমরা দু-জনে ভিন্ন লোক, অথচ বাঙালী পাঠক কিছুতে তা স্বীকার করবে না'। ২৩৯

আসলে প্র.- না.- বি. এত বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যে তাঁর যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারে ব্যর্থ হয় পাঠকবর্গ। তারা খানিকটা হতচকিত হয়েই প্রশ্ন করে - 'লোকটা কবি, পাগল না বিদুষক ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।' আসলে তিনি যে এই তিনের সমষ্টি হয়েও এর উর্ধ্বে একথা পাঠক সহজে বুঝতে পারে না। আর লেখক সর্বতোভাবে কৌশলে নিজের স্বরূপ চাপা দিয়ে রেখেই আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করেন।

জীবনরসিক প্রমথনাথ মানবপ্রেমিক বলেই মানবসমাজের যেখানে যত অসঙ্গতি দেখেছেন সেগুলির প্রতি অশ্লুলি নির্দেশে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বহু-বিচিত্রা সাহিত্য সেবক তিনি। সাহিত্যিকদের দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ভাবে ওয়াকিবহাল। তিনি বহুদিন সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, সাংবাদিকতাও করেছেন। কাজেই সংবাদপত্র-সম্পাদকের ত্রুটি ও দুর্বলতা তার নখদর্পণে। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কাজেই পূজাসংখ্যা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, প্রকাশক, লেখক সকলের মানসিকতা সম্পর্কেই তিনি পরিজ্ঞাত। সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত থেকে তিনি শিক্ষাজগতের সমস্ত খুঁটিনাটি, সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাই তাঁর ছোট গল্পগুলিতে সাহিত্য, সংবাদপত্র, শিক্ষাধারা প্রভৃতির অসঙ্গতি বিষয়ে এমন তীক্ষ্ণ শ্লেষের বজ্র ঝলসে উঠতে দেখা যায়। আধুনিক কবিতার মধ্যে যে দুর্বোধ্যতা ও নীরসতা বাসা বেঁধেছে তাকে তিনি ভূত তাড়ানো মত্রে পরিণত করতে দ্বিধা করেন না এই কারণেই।

বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বাংলাদেশের সর্বত্র যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, যে সাংস্কৃতিক অবনমনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছিল সমাজসচেতক শিল্পী প্রমথনাথের গল্পের দর্পণে তা সুন্দর ও যথায়থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিআপাত বক্র। চোরাকারবার (অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ), ঘুষ (মোটর গাড়ি), দুর্নীতি (ঘোগ), বাঙালী চরিত্রের শূন্যগর্ভ আশ্ফালন (সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন), শিক্ষা জীবনের অসহায়দীনতা (আধ্যাত্মিক ধোপা) প্রভৃতি যে সব বিষয় আমাদের সমাজের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ও উন্নতির প্রতিবন্ধক, প্রমথনাথ হাস্যরসের প্রবাহে তাদের গল্পস্রোতে— ভাসিয়ে তুলেছেন।

আসলে সত্যতা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতা তাঁকে, সার্থক ব্যঙ্গ শিল্পীতে রূপান্তরিত করেছে। অন্যদিকে ঐ একই কারণে অনেক সমালোচক, লেখক ও পাঠকের কাছে তাকে করে তুলেছে বিরূপ। স্পষ্টবক্তা প্রমথনাথ অনেকের কাছেই তাই চক্ষুশূল মমপিড়ক ও উদ্বেগের কারণ।

বহুক্ষেত্রে তার ব্যঙ্গের ছল বিশেষ জ্বালাময়ী ও পীড়াদায়ক, বহু ক্ষেত্রেই তিনি নির্মমভাবে ঈর্ষিত লক্ষ্যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে

আসলে তার সহানুভূতি ও সহমর্মিতাই তাকে নির্মম হতে প্রণোদিত করেছে 'ব্যঙ্গ করুণার বিকার, করুণার অভাব নয়।' শিক্ষকদের সম্পর্কে অনেক রূঢ় সত্য ভাষণের দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয় - কিন্তু তা সবই করুণা প্রসূত - 'কোন শিক্ষক হয়তো ভাবিতে পারেন, আমি শিক্ষক সমাজের নিন্দা করিতেছি। কিন্তু যাহারা মরিয়া আছে, তাহাদের নিন্দায় কি ফল? যাহারা মরিয়াছে পারিলে তাহাদের নিন্দা করিত্রম বই কি? ১৯৪০'

এই কারণেই তিনি নিজেকে নিয়েও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন না। এছাড়া রঙ্গ ব্যঙ্গ করলে যে লোকের বিরূপ সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হতে হয় একথা তিনি জানতেন। তাই 'সদা সত্য কথা কহিব' গল্পে সত্যবাদীর দুঃখ দুর্দশার চিত্র তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বার বার দুঃখ পেয়েও কিন্তু এই গল্পের নায়ক রামতনুর আক্কেল হয়নি। তেমনি রঙ্গব্যঙ্গের কারবারী, সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী, সমাজের অসঙ্গতি দর্শনে ব্যথিত-হৃদয়, প্রমথনাথকে বহু বঞ্চনা ও নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট ভাষণই তার কষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে। তবু তিনি রঙ্গব্যঙ্গের ইষ্ট মন্ত্র ত্যাগ করতে পারেন নি। 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস' গল্পেও অনুরূপ ভাবে আকাট মন্ডলের দুর্দশা তো প্র.-না.-বি.-র ঠোঁট কাটা স্বভাবেরই প্রতিচ্ছবি। জীবনের সর্বত্রই আকাট মন্ডলকে তার বাঁকা হাসিটির জন্য কষ্ট পেতে হয়েছে। তবে মৃত্যুর পর শিষ্যরা তার সমাধির উপর 'হাসিয়া বাবার মঠ' তৈরী করেছে। প্রমথনাথ হয়ত আশা করেছিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী অনুরূপে তাঁকে স্মরণের মণিকোঠায় অমর করে রাখবে।

স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন জাগে যে প্রমথনাথ বিশীর ছোট গল্প নামে প্রচলিত সবগুলিই ছোটগল্প শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত কিনা। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়ে বাংলা ছোটগল্পকারগণ আত্মসাধনায় ব্রতী হলেও অনেকেই রবীন্দ্রনাথের পথকে পিছনে ফেলে নূতন পথের সন্ধানে সচেতন থেকেছেন - নতুন আঙ্গিক ও চেতনার নবদিগন্ত আবিষ্কার করে বাংলা ছোট গল্প ধারার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছেন। এই বৈচিত্র্যের শোভাযাত্রায় দেখা যায় কখনও ছোটগল্প গীতি কবিতার সমান্তরাল রেখায় চলেছে, কখনও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে হৃদয় হয়ে উঠেছে, কখনও তা সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়ে হীরকের মতো উজ্জ্বল, ক্ষুদ্রায়ত ও দ্যোতনাধর্মী হয়ে উঠেছে। আবার কখনও বর্ণনাসর্বস্ব প্রবন্ধধর্মী বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এই অসংখ্য বর্ণছটাময় প্রতিভাস্বকটিকের বিচিত্রতর কাপের প্রতিফলন দেখা যায় প্রমথনাথের বিভিন্ন, বিচিত্র ছোটগল্পে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপসচেতনতা আধুনিকতার লক্ষণ। প্র.- না.-বি.-র প্রতিভার বুদ্ধিদীপ্ত রূপ ছোটগল্পের শরীর সীমায় চেনা জীবনকে নূতন রূপে নূতন করে আশ্বাদ করার আধুনিক বৈচিত্র্য দান করে। এই দিক থেকে তিনি প্রমথ চৌধুরীর মত শিষ্য এবং আধুনিক গল্প-রূপের পথিকৃৎ।

তঁার প্রায় সব গল্পেই অনুভূতি আছে কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত চাপা হাসির ও সকৌতুক কথার কারসাজির তলায় সেই অনুভূতিকে চেপে রাখাই তঁার রচনা-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে এই অনুভূতিকেও তিনি বিচার বিশ্লেষণের নিক্রিতে তৌল করেছেন। এই বিচার বিশ্লেষণের বৌদ্ধিক অংশটুকু তঁার কিছু গল্পের পটভূমি-আলোচনা, বিতর্ক, বর্ণনা ও কথকতার ভঙ্গীতে যার নিয়ত প্রকাশ। এই কারণে তঁার কিছু গল্প আসলে গল্প ও প্রবন্ধের দ্বৈত মিলন। ভাঁড়ুদত্ত, চিত্র গুপ্তের এডভেঞ্চার প্রভৃতি এই ধরনের গল্প।

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাতঙ্গী, ভাব ও রূপ উভয়দিকেই প্রমথনাথ নূতনত্বের সন্ধান করেছেন। ফলে গতানুগতিক-চিহ্নিত ও পরিচিত পথ না দেখতে পেয়ে অনেকেই তঁার গল্পগুলিকে যথার্থ ছোটগল্প বলতে অস্বীকার করেছেন।

বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রমথনাথ যে কোন তুচ্ছ বিষয়কেই সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে অসামান্য গল্প-কাঠামোয় রূপান্তরিত করতে পারেন। আর জগতের সবকিছুই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে বলে চিন্তাশীল মনীষীরা মত প্রকাশ করেছেন - "The short-story can be anything the author decides it shall be ; it can be anything from the death of a horse to a young girl's first love affair, from the static sketch without plot to the swiftly moving machine of bold action and climax, from the prose poem, painted rather than written, to the piece of straight reportage in which style, colour and elaboration have no place, from the piece which catches like a Cobweb the light subtle iridescence of emotions that can never be really captured or measured to the solid tale in which all emotion, all action, all re-action is measured, fixed, pulled, glazed, and finished like a well-built house, with three coats of shining and enduring paint. In that in-finite, flexibility, indeed, lies the reason why the short story has never been adequately defined."^{২৪১}

এককথায় শিল্পীর চেতনা ও অবধারণার আলোকে জীবন ও জগতের যে কোন ভাসমান উপাদান প্রতিফলিত হয়ে ছোটগল্পের রূপ-রসে ফুটে উঠতে পারে। প্রমথনাথও তাই করেছেন। আর এই কাজে তাকে বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন রীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। প্রেমের গল্প ও পৌরাণিক গল্পের রীতি যেমন এক হতে পারে না, ঐতিহাসিক

ও অতি প্রাকৃত রসের গল্পের রীতিও তেমনি ভিন্ন হতে বাধ্য। আর রীতির পার্থক্যানুযায়ী বর্ণনাভঙ্গীও যায় পরিবর্তিত হয়ে। এই কারণেই প্রমথনাথের রঙ্গব্যঙ্গের গল্পগুলি অনেকক্ষেত্রে বর্ণনাসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তীব্র শ্বেষ ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের অশনিভরা বিদ্যুৎ গল্পগুলির বর্ণনাভঙ্গীকে করে তুলেছে বর্ণহীন, জাঁকজমকহীন, চাঁচাছোলা। কিন্তু এই অনাড়ম্বর ও লক্ষ্যভেদী বর্ণনাগুলিকে কাব্যসুষমামণ্ডিত, অলঙ্কারভূষিত ও নমনীয় করে তুললে তা গল্পগুলির ভাব ও রসকে ক্ষুণ্ণ করতো নিঃসন্দেহে। প্রমথনাথ বিশী এই গল্পগুলিতে প্র.- না.- বি. কে স্বতন্ত্র ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। ফলে চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, সদা সত্য কথা কহিবে, চাকরিস্থান, নূতন বক্ত, কক্ষি, রাখব বোয়াল, ভগবান কি বাঙালী প্রভৃতি গল্পের উদ্ভব হয়েছে।

আসলে তাঁর গল্প শুধু লঘু কৌতুকে মোড়া নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বেশ গুরু তিরস্কারে দক্ষ। রচনার প্রতিটি বাক্যকে রসসমৃদ্ধ ও সার্থক করে তোলার বৈশিষ্ট্যটিও অধিকাংশ গল্পেই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। আবার ক্ষুরধার ব্যঙ্গ বহুক্ষেত্রে যুগপৎ হাসি ও চিন্তার খোরাক জোগায়, কোথাও অযথা বিদ্ধ করে যজ্ঞনা দেয় না।

এছাড়া গভীর, গম্ভীর জীবনরসকে অবলম্বন করে যখন ছোটগল্প রচিত হয়েছে তখন মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন লেখক নিজে। প্রমথনাথ বিশী একজন বড় গীতিকবি। ফলে তাঁর কল্পনাসমৃদ্ধ ভাব-ভাবনা ও ভাষা এই ধরনের গল্পগুলিকে করে তুলেছে জীবনরসে সম্পৃক্ত। যেমন - সুতপা, পেস্কারবাবু, শকুন্তলা, অতিসাধারণ ঘটনা, আরোগ্য স্নান, ডাকিনী প্রভৃতি। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়—'প্রমথনাথ বিশীর পরিচয় প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পে। কিন্তু চরিত্রধর্ম কবি প্রমথনাথ বিশী কেবল ব্যঙ্গের বক্রতাতেই নিজেকে নিঃশেষিত করেন নি। একদিকে যেমন তাঁর রচনায় ছুরির ফলার বলক, অন্যদিকে রোমান্টিক কবি কল্পনার মহিমায় তাতে সুগভীর সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি'। ২৪২

আর সর্বোপরি প্রমথনাথের সমস্ত গল্পেই মানবপ্রেমিক প্রমথনাথের যে পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাকে আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। পাষাণের অভ্যন্তরে স্রোতস্বিনীর মতো সেই মানবিক রসের ধারায় সিক্ত হয়েই তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্প কালের গম্ভী অতিক্রম করে চিরস্থায়ী ও অমর আসন লাভ করবে বলে মনে হয়।

প্রমথনাথ একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। তাঁর উক্ত সমস্তগুলির ছায়াপাত ঘটতে দেখা যায় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। উপন্যাসে যেমন প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পাঠকদের উদ্দেশ্যে বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার

করেছেন গল্পগুলির মধ্যেও তার প্রয়োগ লক্ষ্যগোচর হয়। তাছাড়া প্রবাদ প্রবচনমূলক বহু অর্থঘন সুভাষিত বাক্য ব্যবহার প্রমথনাথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন - 'মানুষের জীবন একটি অন্তহীন জোড়াতালির মালিকা [২য় খণ্ড, পৃ-১৯৩]। 'রাজবাক্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্যই সভাসদদের প্রয়োজন' [২য় খণ্ড, পৃ-৩৬৫] প্রভৃতি।

তবে প্রমথনাথ একাধারে ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হলেও উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন - ' ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের শিল্প কলা। ছোটগল্পে পাত্রপাত্রী আছে, আবার পরিণাম আছে - এই দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ সাধনে ছোটগল্পের সার্থকতার রহস্য - এ অনেকটা সনেট জাতীয় রচনার সগোত্র . . . ছোটগল্প জীবনখন্ড, উপন্যাস জীবনবিস্তার '। ২৪০

আসলে ছোটগল্পের আত্মীয়তা উপন্যাসের চেয়ে নাটকের সঙ্গেই বেশী সংস্কৃত। তার কারণ উপন্যাস বিস্তার ধর্মী। তাই কবি প্রমথনাথের কলমে লিখিত ছোটগল্পগুলি একাধারে কবিত্ব, নাটক ও গল্পের ত্রিবেণীসঙ্গম। এই কারণেই তাঁর ছোটগল্পগুলি ইঙ্গিতময়, ব্যঞ্জনাধর্মী।

একাধিক সত্তার সমন্বয়-পুষ্ট হলেও প্রমথনাথ মূলতঃ কবি। তাঁর সর্বস্তরের সাহিত্য সাধনার মধ্যেই সেই মূল উৎস আবিষ্কার করা যায়। বাংলা ছোটগল্পেও তাঁর এই কবিসত্তা প্রাধান্য লাভ করেছে। কবির অন্তরে থাকে একটি সংবেদনশীল মন-একটি হৃদয়বান শিল্পী। একদিকে প্রকৃতিপ্রেমী অন্যদিকে মানবপ্রেম-এই দুয়ের হরগৌরী সম্মিলন ঘটে সেই মানসপটে। অধিকাংশ গল্পেই কবি প্রমথনাথের এই দ্বিমুখী চেতনাধারা অনুভূত হয়। তাঁর ভাষাও বহুক্ষেত্রে কবিত্বমণ্ডিত। তাই কোথাও তিনি ভাষার ইন্দ্রজালে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির মেলবন্ধন প্রয়াসী, কোথাও বা গীতিকবির মতো আবেগদীপ্ত।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আরোগ্যস্থানে' প্রকৃতিপ্রেমিক প্রমথনাথের এক সহজ-সুন্দর পরিচয় মেলে। অবশ্য লেখকের অল্পবয়সের ও অপরিণত হাতের রচনা এটি। সমসাময়িক কালে [১৩৩১ বঙ্গাব্দ] প্রকাশিত 'সাগরিকা' গল্পেও রোমান্সপ্রিয়, প্রকৃতিপ্রেমিক, ব্যক্তি প্রমথনাথের হৃদয়দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র-শিষ্য, আবাল্য পদ্মাবিধৌত রাজশাহী, পর্বতবেষ্টিত দেওঘর ও নিসর্গ লালিত শান্তিনিকেতনে বাস করে প্রমথনাথের মনোলোকে প্রকৃতির রুক্ষ-কোমল বৈচিত্র্য, সৌন্দর্যরসপিপাসা ও পূর্ণতার চেতনা গভীর ও দৃঢ়রেখায় মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। কবি প্রমথনাথের ধারণা—এক পূর্ণায়ত জীবনচেতনাই পারে অজস্র জটিল যন্ত্রনা ও

সমস্যাগ্ণতিকিত মানব জীবনকে সকল সমস্যা ও রহস্যের পরপারে নিয়ে যেতে । কবির এই গভীর প্রত্যয় ও নিভৃত মনোবাসনা যেখানে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সমাজ ও ব্যক্তি, রাজনীতি বা অর্থনীতির নানাবিধ অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি যেখানে জীবনের সৌন্দর্যসাধনা ও সার্বিক উন্নতির বিরোধিতা করেছে সেখানেই রোমান্সপ্রিয়, সৌন্দর্যসাধক, জীবনরসিক প্রমথনাথের ব্যঙ্গ খরশান তরবারির মতো ঝলসে উঠেছে । সমালোচকের ভাষায় - 'প্রমথ বিশীও কল্লোল যুগের তথা আমাদের আত্মখন্ডিত বিশ শতকের অপূর্ণতা-পীড়িত জীবনের শিল্পী । অন্তরের গভীরে আলোক-তীর্থের পিপাসা আর প্রত্যক্ষ জীবনে শূন্যতা, অপূর্ণতা, রিক্ততা, বঞ্চনা, এ দুয়ের পারস্পরিক অভিঘাতে গঠিত হয়েছে প্র.- না.- বি.-র রহস্য জটিল বিচিত্র শিল্প-প্রকৃতি ' । ২৪৪

ব্যঙ্গকুশলী হলেও প্রমথনাথ মূলতঃ কবি ও জীবনবাদী শিল্পী । তাই তাঁর হাতে অসংখ্য গভীর-গভীর জীবন ভাবনাময় গল্প রচিত হতে দেখা যায় । বিভিন্নধর্মী বিচিত্রস্বাদী যে কোন ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করলেই কবি প্রমথনাথের অনুভূতি ও কল্পনা, সৌন্দর্যভাবনা ও জীবনচেতনার অন্তঃস্পন্দ অনুভূত হয় । ডাকিনী, ভাঁড়ুদত্ত, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, গদাধর পণ্ডিত, অসমাপ্ত কাব্য, মহেঞ্জোদড়োর পতন, রত্নাকর, সিন্দুক, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, কুন্দনন্দিনীর বিষ পান - প্রভৃতি সববিধ গল্পেই অল্পবিস্তর রঙ্গ-ব্যঙ্গের অন্তরালে ফন্সুধারার ন্যায় প্রমথনাথের মানবিক অনুভূতি ও কবিপ্রাণতার পরিচয় মেলে । এককথায় অন্যান্য রচনার মতো প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলিও কবির কলমে লিখিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধকার প্রমথনাথ বিশী :

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রমথনাথ বিশীর প্রাবন্ধিক সত্তাটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। বিভিন্ন, বিচিত্র প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-পুস্তকের জনক তিনি।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন ১৬।১৭ বছর বয়স থেকেই তিনি গুরুগম্ভীর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা দুইই লিখতে শুরু করেন। ১৩২৩, 'আশ্বিন সংখ্যা', 'প্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাঠান শাসনে ভারতবর্ষ', কিংবা পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৈদিক ইতিহাসের ধারা' বা ১৩২৪, মাঘ-ফাল্গুন, সংখ্যা 'প্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রোগীর উৎসব' নামক রম্যরচনা প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত।

এই সময়ের প্রবন্ধ বা রম্যরচনার মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস ও কবিশর্মের প্রাধান্য থাকলেও যুক্তির অবতারণা, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর তিনি 'শান্তিনিকেতন' [১৩৩০-৩১] ও 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাটকের সমালোচনা করে কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীজনের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভায় পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার কোন কোন দিক নিয়ে প্রবন্ধরচনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগুলি তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' বা 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আবার কিছু কিছু প্রবন্ধ আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রমথনাথের প্রবন্ধপুস্তকগুলিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায় [১] স্মৃতিকথা [২] চরিতকথা [৩] সমালোচনা [৪] রসরচনা [৫] বিবিধ।

অবশ্য এই উপবিভাগগুলির মধ্যে জল-অচল প্রভেদ রেখা টানা যায় না। কারণ বহুক্ষেত্রেই একটির সঙ্গে অন্য একটি বা একাধিক ধারা ওতপ্রোত হয়ে আছে। তবে আলোচনার ব্যাপ্তি, গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচার করলে উক্ত বিভাগ-বিন্যাস সঙ্গতিহীন মনে হবে না। প্রতিটি উপবিভাগই বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

[১] স্মৃতিকথা :

স্মৃতিকথা আত্মজীবনী নয়, কিন্তু আত্মসুরভিত জীবনচিত্র। আত্মজীবনীতে অখণ্ড জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়, স্মৃতিকথা খণ্ড চিত্র। মনের জানলা দিয়ে অতীত জীবনের কোন বিশেষ অংশকে দেখার আনন্দ স্মৃতিকথার মূল উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের

'জীবনস্মৃতি' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি জানিয়েছেন - 'স্মৃতিরপটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না, কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে'। প্রমথনাথ ও পঞ্চাশোর্ধ্বে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তাঁর বিগত ছাত্রজীবনের খন্ড, খন্ডচিত্র উপস্থিত করেছেন। সঙ্গে আছে যথোপযুক্ত পটভূমিরূপে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি। আর আছেন সেখানকার মূলহোতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এ যেন স্মৃতির এলবামে জমিয়ে রাখা জীবনের সুন্দর, সুন্দর খণ্ডচিত্র; তুলির নিপুণ টানে শিল্পীর আঁকা ছবির মত সহজ, সরল, সাবলীল ভাষার সাহায্যে জীবনালেখ্য অঙ্কন।

এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অসাধারণ। প্রখ্যাত সব্যসাচী সাহিত্যিক প্রমথনাথের সমস্ত সাহিত্যিক কৃতির সুপ্তবীজ যে শান্তিনিকেতনের উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করেছিল তার প্রমাণ মেলে এই গ্রন্থে। প্রমথনাথের ছাত্রজীবনের সতের বছরের [১৯১০ - ১৯২৭] ইতিবৃত্ত বহন করছে এই গ্রন্থ। সেই সঙ্গে আছে শান্তিনিকেতনের প্রাণপুরুষ, কবি, শিক্ষক ও সাধক রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও এষণা, চিন্তা ও চেতনা। এছাড়া আছে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা বিশ্বভারতীরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রাণোচ্ছল গঠনশীল ভূমিকা।

এই স্মৃতিকথা যেন সূত্র, আর প্রমথনাথের পরবর্তী জীবনের সমস্ত সাহিত্যসত্তার যেন তারই ভাষ্য। লেখকের কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, জীবনী, সমালোচনা - সব কিছুরই মূল খুঁজে পাওয়া যায় এই স্মৃতিচারণার মধ্যে। ভূমিকায় প্রমথনাথ বলেছেন - 'এ বই শান্তিনিকেতনের ইতিহাস নয় . . . এই বই আমার মনের উপর শান্তিনিকেতনের ছাপ। স্বভাবতই এজাতীয় রচনা ব্যক্তিগত। . . . এই বইয়ের লেখককে নিজের কথাই বারংবার বলিতে হইয়াছে, তাই বলিয়া লেখক ইহার নায়ক নহে। . . . যদি ইহার প্রকৃত নায়ক কেহ থাকেন তবে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর তাহার সঙ্গে আছে বিশ্ব প্রকৃতির যে রূপ শান্তিনিকেতনের মাঠে অব্যবহৃত।'

অন্যত্র তিনি লিখেছেন - 'আমি শান্তিনিকেতনের রীতিমত ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। স্মৃতিকথা মাত্র লিখিব। স্মৃতির ঝুলিতে হাত ঢুকাইয়া দিব, কি যে উঠিয়া আসিবে তাহা আমার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। . . . তবু প্রাচীন শান্তিনিকেতন পল্লীর আভাস এখানে দিবার চেষ্টা করিব'। ২৪৫

কর্তব্যের খাতিরে নয়, আনন্দের তাগিদেই তিনি নিজের শিক্ষানিকেতনের কথা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এবং ফলে বইটি স্মৃতিরাগে রঞ্জিত হয়ে

এমন আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্যরূপ পেয়েছে। মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ কৌতুক ও মিষ্ট পরিহাস রচনাটিকে লীলায়িত মাধুরী দান করেছে।

এই গ্রন্থ লেখকের শিক্ষার্থী জীবনের কাহিনী শুধু নয়, এতে আছে বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী এবং সূর্য সহ সৌরমন্ডলের মতো রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সমবেত জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষক ও পরিচালকমন্ডলী। আছে শান্তিনিকেতনের পল্লী প্রকৃতি; আছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি। রবীন্দ্রভাবনার নিপুণ ভাষ্যকার প্রমথনাথ। এভাষ্য কল্পনা নির্ভর নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জীবন্ত। তৎকালীন শান্তিনিকেতন, সেখানকার শিক্ষক সতীর্থ ও সুহৃদ গোষ্ঠীর আলেখ্য অঙ্কনে লেখক যে প্রসন্ন-সুন্দর গদ্যভঙ্গিমা প্রয়োগ করেছেন তা অতীব প্রাণবন্ত, রম্য, আবেগদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী।

আলাপচারণার ভঙ্গীতে প্রতিটি ক্ষুদ্র, মহৎ চরিত্র প্রাণময় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের শৈশব ও কৈশোরের বিস্ময়, কৌতুহল ও কৌতুকবোধ পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। অতীতমুখী লেখকের বিষয় মুখশ্রী সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। সুধীরঞ্জন দাশের 'আমাদের শান্তিনিকেতন', সুরেন্দ্রনাথ করের 'শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ', সৈয়দ মুজতবা আলির 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের ও তৎসহ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হলেও 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইয়ের গভীরতা, পেলবতা, সরলতা ও সরসতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শান্তিনিকেতনে এসেই বহু মানুষ তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে জ্ঞানী-গুণী হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালীমোহন ঘোষ, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপাল চন্দ্র রায়, সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নাম করা যায়। লেখকের ভাষায় - 'এখানে না আসিলে তাহাদের শক্তির স্ফূর্তি যেন কিছুতেই হইত না, জীবনের গতি যেন অন্যরকম হইত। শক্তি তাহাদের নিজের, সেই শক্তির উদ্বোধন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে, সেই শক্তির বিকাশ আশ্রমের অনুকূল আবহাওয়ায়'। ২৪৬

উপরিউক্ত মানুষগুলির অনেকেই আজ প্রতিভাগুণে দেশখ্যাত। শান্তিনিকেতনে এসে বাস করার সুযোগ না পেলে কেউ বা হয়ে থাকতেন জমিদারের নায়েব, কেউ বা হেডমাস্টার, কেউ সরকারী উকিল বা কোন কলেজের অধ্যক্ষ। আত্মশক্তি বিকাশের পরিবেশ লাভের সুযোগ দিয়ে শান্তিনিকেতন তাদের অনেক উপরে টেনে

তুলেছে। এমনকি ভেবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শান্তিনিকেতন পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথকেও বহুল পরিমাণে সৃষ্টি করেছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক্ষেত্রে পরস্পরসাপেক্ষ।

লেখকের নিজের উপর বা তৎকালীন শিক্ষার্থীদের উপর শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ যে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন তার পরিচাও এই গ্রন্থে বিদ্যমান। নব যুগের প্রয়োজনে শান্তিনিকেতন এখন নব কলেবর ধারণ করেছে। কিন্তু শান্ত, স্নিগ্ধ, কোলাহলবিহীন শান্তিনিকেতন কিরূপে স্মৃটনোন্মুখ শিশুকে পরিণত মনুষ্যত্বে পৌঁছে দিত আমরা প্রমথনাথের জীবন থেকেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই।

লেখকের বর্ণনানৈপুণ্য ও আন্তরিকতাবোধ অসাধারণ। পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় লেখক, অধ্যাপক প্রমথনাথ যেন হঠাৎ তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর পাঠকগণ যেন তারই সার্থী হয়ে পড়েছেন। এ যেন পুরানো একটি পারিবারিক ফটোর এলবাম দেখার মতো। যারা বুড়ো হয়ে গেছেন প্রমথনাথ আবার তাদের শিশুতে পরিণত করেন। কিংবদন্তী পুরুষ ও মানুষ গড়ার কারিগর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এই গ্রন্থে যেন চাক্ষুষ দেখতে পাই। প্রত্যক্ষদর্শী লেখক অন্যত্র রবীন্দ্রনাথকে অনুপম ভাষায় বর্ণনা করেছেন — 'শারদরাত্রে চন্দ্রালোক যেমন দেহমনকে স্নিগ্ধ করে তোলে সেইরকম স্নিগ্ধতার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে। কাছে গিয়ে বসলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটি শান্ত, সংহত ও সুস্নিগ্ধ হয়ে উঠতো'। ২৪৭

এইযুগের শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের মানসসন্তান। একে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ পাদপীঠরূপে গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথকে যে কুছু সাধনা করতে হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের মধ্যে প্রমথনাথ একজন। রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া মানুষ ও লেখক হিসাবে প্রমথনাথ দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। বিশ শতকের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা লেখকের চোখের সামনে ঘটেছে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এবং শান্তিনিকেতনে ছাত্র-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে ও পরে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের প্রতিক্রিয়া, ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর দরদ, সকলকে নিয়ে একটি পারিবারিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সবই প্রমথনাথের অতিপ্রত্যক্ষ ঘটনা। সেই কারণে এই স্মৃতিচিত্রগুলি এমন বিচিত্র, সুন্দর ও মহার্ঘ হয়ে উঠেছে।

অল্পবয়স থেকেই লেখক ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাচক, চাকর, ধোপা, নাপিত, হাসপাতালের ডাক্তার প্রভৃতির যে চিত্র তিনি এ গ্রন্থে এঁকেছেন তা তাঁর সহজাত শিল্পী সত্তার পরিচয়বাহী। এগুলি পরবর্তীকালে তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে অমর হয়ে আছে।

এই গ্রন্থের ভাষাভঙ্গিমা অসাধারণ। সমালোচকের ভাষায় - 'রবীন্দ্রনাথ ও

শান্তিনিকেতন বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় গদ্যরচনা, এক জীবনস্মৃতি ছাড়া এই জাতীয় আর কোন রচনাই এর সমকক্ষ নয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্র-গদ্যরীতির একটা চূড়ান্ত পরিণাম ঘটেছে . . . রবীন্দ্রশিষ্য প্রমথনাথ কবিতা বা গদ্য কোন রচনাতেই কবির এত কাছাকাছি আসেন নি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব আছে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে জীবন স্মৃতির রবীন্দ্র লেখনী যেন পূর্ণতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৪৮

প্রমথনাথের আত্মজীবনীর অংশবিশেষ তাঁর বহুলেখায় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু এখানেই তার প্রকাশ সবচেয়ে সার্থক ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথকে মধ্যমণি করে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের সহপাঠী ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রমথনাথ একটি সুন্দর মাল্য রচনা করেছেন যার সূত্র হল প্রমথনাথের ছাত্রজীবন। সূত্রটি যেমন অসাধারণ, গ্রন্থন নৈপুণ্যও তেমনি অসামান্য। আত্মজীবনের সূত্রে একটি মহামানব ও মহাপ্রতিষ্ঠানের জীবনী রচনার গুণে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন শুধু জীবনী বা স্মৃতিকথা নয়। এটি প্রমথ সাহিত্যেরও মর্মস্থল উদ্ঘাটন করে দেয়। এটি গুরু-শিষ্যের সাহিত্যের অন্তরঙ্গ টীকা'। ২৪৯

এই স্মৃতিকথা সম্ভারে আর একখানি পুস্তক বিশেষভাবে স্মরণীয়। তার নাম 'পুরানো সেই দিনের কথা'। এটিও সম্পূর্ণভাবে শান্তিনিকেতনের জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। নিবেদনে প্রকাশক বলেছেন - 'শান্তিনিকেতনের গোড়ার দিকে যখন স্বল্প কটি ছাত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম পত্তন করেছিলেন সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রমথবাবুর প্রবেশ। . . . প্রমথনাথ সেই সব দিনের কথা তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি থেকে একে একে বার করে সাজিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থে। পুরাতন শান্তিনিকেতনের নানা আনন্দ-দুঃখ-কৌতুক ভরা দিনের কথা, বিভিন্ন জ্ঞানী ও নী যারা অলঙ্কৃত করেছিলেন শান্তিনিকেতনের রত্নসভা - তাঁদের প্রসঙ্গ, আর সবাইকে ধরে রেখেছে যে রবীন্দ্র স্মৃতিসূত্র এরই সম্মিলিত রূপটির কথাভাব্য এই গ্রন্থ'। লেখকের মৃত্যুর তিনমাস আগে এটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার কিছু আগে থেকেই কথাসাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। এই গ্রন্থে কিছু নতুন তথ্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থের মতো অনবদ্য ভাষাসম্পদ, অনুভূতির গভীরতা, সাবলীল গতিবেগ, ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ও কবিত্বের সৌগন্ধ এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। প্রজিত-প্রবীর-অতসীর যে প্রেমের লীলাচাক্ষুণ্য এ গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সংযোগ আছে বলে অনুভূত হলেও সামগ্রিকভাবে চিত্রটি খুবই অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে লেখকের প্রসঙ্গ মানসিকতা ও স্নিগ্ধ কৌতুকচ্ছটায় এই গ্রন্থটি আনন্দ স্রস ও উপাদেয় হয়ে উঠেছে যা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

২৪৮। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ-সংখ্যা, ১৩৭৩ - পৃঃ ১৪৪১ - রবীন্দ্রনাথ রায়।

২৪৯। তদেব— পৃঃ - ১৪৭০ - প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

[২] চরিতকথা :

প্রমথনাথ বিশী কয়েকটি চরিতকথা জাতীয় গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এগুলির মধ্যে 'মাইকেল মধুসূদন জীবনভাষ্য', 'জওহরলাল নেহেরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব'; 'গান্ধী-জীবনভাষ্য' এবং 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি গ্রন্থের স্বতন্ত্র পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) মাইকেল মধুসূদন : জীবনভাষ্য :— প্রমথনাথ বিশীর মধুসূদন জীবনী প্রচলিত জীবনী থেকে স্বতন্ত্র। প্রচলিত তথ্যকে তিনি বিকৃত করেননি বা তথ্যের পাহাড় জমিয়ে জীবনীকে দুর্ভাষ ও নীরস করে তোলেন নি, কিংবা নূতন তথ্যের সন্ধানে সময় ক্ষেপন করেন নি, তথ্যের নির্যাসটুকু গ্রহণ করে তার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদের ভাষ্যরচনা করেছেন মাত্র। মধুসূদনের মনের গভীরে ডুব দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব, আশা-নিরাশা, সাধ ও সাধ্য, আলো ও ছায়ায় মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি। মধুসূদন নিজে যেমন রাবন চরিত্রের অন্তরের হাহাকারকে ও অন্তরতম ব্যক্তিত্বকে অনাবৃত করেছেন তাঁর কাব্যে, প্রমথনাথ তেমনি স্বর্ণমুগ সন্ধানী ও যশোলিঙ্গু মধু ব্যক্তিত্বের করুণ-মধুর চিত্রটি ও অচরিতার্থ কবি চিন্তের বেদনাবিধুর মূর্তিটি বিশেষ আন্তরিকতা, তীক্ষ্ণ মনীষা ও গভীর অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করেছেন।

জীবনযুদ্ধে ক্রান্ত, বিপর্যস্ত মহাকবি মধুসূদনের বহু অপরাজেয় গৌরব-মুহূর্তকে আবিষ্কার করেছেন প্রমথনাথ। মধু-জীবনে যে সংযম ও শৃঙ্খলার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল তারই সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি কাব্যসাহিত্যে। একাধারে মধু-কবির জীবন ও কাব্যের এই দ্বৈত রূপ, তাঁর দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অতীব সুকৌশলে ভাষ্যকার প্রমথনাথের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভূমিকায় লেখকের প্রতিশ্রুতি - 'আমি মধুসূদনের সমগ্র সত্তার পরিচয় দিতে বসিয়াছি', কিংবা 'এই গ্রন্থে নূতন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা নাই, পুরাতন তথ্যের নূতন ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।' - গ্রন্থ মধ্যে এই ভাবে সার্থকতা লাভ করেছে - 'মাইকেলের জীবনে যে অসংযম ছিল, সাহিত্যে তাহার কোন চিহ্ন নেই। সেইজন্য তাঁহার কবিপ্রকৃতি এত বিঘ্ন উদ্ভীর্ণ হইয়াও বাড়িতে পারিয়াছিল . . . কাব্যের এই নিয়ম-শৃঙ্খলা মাইকেলের প্রতি সনেটে দৃষ্ট হয়। . . . মাইকেলের জীবনে যে নিষ্ঠা ও নিয়মচর্যাজাত শান্তি কাম্য ছিল, এই অমোঘ শৃঙ্খলিত সনেটগুলিতে তাহাই রূপ পাইয়াছে'। ২৫০

প্রমথনাথ জীবনী বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে মিতবাক মন্তব্য ও অর্থঘন, তীক্ষ্ণ, সংযত বিশ্লেষণের সাহায্যে মধু-মানসের এক একটি রুদ্ধ কক্ষ মুক্ত করেছেন। তথ্যভারাক্রান্ত বা পাদটীকাকণ্টকিত করে এই অনন্য সাধারণ জীবনী গ্রন্থের নাটকীয় গতিবেগকে তিনি

প্রথমে করে তোলেন নি। কৌতুকে কৌতুহলে অভিভূত তার ব্যাখ্যার ভঙ্গী ; বক্তব্যের গভীরতা ও ভাষার স্বাদুতা হৃদয়নন্দন। যেমন 'মাইকেল শিল্প সৃষ্টির জন্যই ঐশ্ব্যের কামনা করিতেন - ঐশ্ব্যের জন্য ঐশ্ব্য নয়। কিন্তু তিনি ঐশ্ব্য ও আত্মার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই, ঐশ্ব্যের উল্লাস ও আত্মার উল্লাস, মূলতঃ যাহা পরস্পর বিরোধী নয়, মাইকেলের জীবনে তাহা সুগম হইয়া উঠে নাই। দুইটি ভিন্নসুরে তাঁহার হাতে একতান বাজিয়া উঠিল না। এই দুই কোটির মধ্যে জ্যা আরোপ করিতে গেলে বিশাল হ্রদধনু ভাঙিয়া পড়িল ; মাইকেলের জীবনের সাধনা ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহাই মাইকেলের জীবনের ট্রাজেডি। তাঁহার জীবনের দুইটি ধূয়া - দুইটি মিলিয়া একটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইতে পারে নাই; এই দুই ধূয়া তাঁহার জীবনে ভিন্ন কণ্ঠে অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে—মহাকাব্য কতদূর ! ইংলণ্ড কতদূর !^{২৫১}

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাঁর জীবন কাহিনীকে লেখক 'আদিকাণ্ডের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মাদ্রাজ গমন ও সেখানকার জীবনধারাকে 'বনবাস' আখ্যা দিয়েছেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে বাংলা সাহিত্যের সাধনা, সিদ্ধি ও জ্ঞানী গুণীজনের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ তাঁর জীবনকে কিছুটা মাধুর্যে পূর্ণ করেছিল। দাম্পত্য জীবনও এই সময় সুখকর ছিল। ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন-পরিধিকে লেখক 'মধুচক্র' নামে নামাঙ্কিত করেছেন। অর্থ ও যশের সন্ধানে অবশেষে কবি ইংল্যান্ড গমন করেন। সেখানে তাঁর নিদারুণ অর্থকষ্ট ও মনোকষ্ট উপস্থিত হয়। আশার ছলনায় ভুলে তিনি অনুতাপনালে দগ্ধ হন এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের বদান্যতায় দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন। এই পর্যায়কে লেখক নাম দিয়েছেন 'স্বর্ণমৃগ'। শেষ পরিচ্ছেদের নাম 'সীতাহরণ'। সীতাহরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন - 'মধুসূদনের শেষ জীবন অর্থের স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে পরিভ্রমণের ইতিহাস, অর্থের স্বর্ণমৃগও আয়ত্ত হইল না, কাব্যের সীতাও অপহৃত হইল'।^{২৫২} আর প্রতিটি, পরিচ্ছেদের প্রথমে মধুসূদনের চিঠি পত্র থেকে এমন কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন যেগুলি সেই পরিচ্ছেদের মর্মবাণী।

অনেক বিদগ্ধ সমালোচক প্রমথনাথরচিত জীবনভাষ্যগুলির মধ্যে স্ট্রেচি ও মরোয়ার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। স্ট্রেচির 'Eminent Victorians' — গ্রন্থের সঙ্গে প্রমথনাথের 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। স্ট্রেচি উক্ত গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক চেতনা ও নাটকীয় শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন প্রমথনাথের 'চিত্র চরিত্র' বা 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থেও তার সঙ্গে মিল আছে। তবে দুজনের দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে

২৫১। তদেব - পৃঃ ৫।

২৫২। মাইকেল মধুসূদন - প্রমথনাথ বিশী - ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮১, পৃঃ ১১৭।

মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। স্টেচি তাঁর অঙ্কিত নরনারীদের শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন যুক্তি, বুদ্ধি ও সংশয়বাদের অনুরাগী। কিন্তু প্রমথনাথের মাইকেল জীবনীর মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব নেই। তিনি Hero-worship এর বিরোধী। মানুষের দোষগুণের সমবায়ে সমগ্র মানুষটির চিত্র আঁকতেই সমুৎসুক। তাই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন - 'আমি মাইকেলকে দেবতা করিয়া তুলি নাই, তাঁহার দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছি - এমনকি তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপও করিয়াছি, ইহাতে তাঁহার অসম্মান হইয়াছে মনে করি না - বরঞ্চ ইহা দ্বারা তাঁহাকে মানুষ মনে করিয়া সম্মান দেখানোই যেন হইয়াছে। মানুষকেই ঠাট্টা করা যায় - ভালোবাসা যায়, দেবতাকে ঠাট্টা করাও যেমন যায় না, তেমনি ভালোবাসাও যায় না'। ২৫৩

সমালোচকের ভাষায় প্রমথনাথ 'কালিহিলের বীরপূজাকে প্রীতিভাজন মানুষের জীবনচর্চায় নামিয়ে এনেছেন। বাংলা চরিত সাহিত্যের অঙ্গণ থেকে ভক্তিবাদ বহিষ্করণে এই গ্রন্থের একটি বড় ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া এমন সরস, স্পষ্ট ভাষণও অন্যত্র নেই'। ২৫৪

মাইকেলের জীবনী রচনায় প্রমথনাথ তিনখানি গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। এদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোমের গ্রন্থ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন তথ্য, আর শশাঙ্ক মোহন সেনের গ্রন্থ থেকে মধুসূদনের অন্তর্জীবন ব্যাখ্যার রেখাচিত্র। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল কবির ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিশ্লেষণ, প্রয়োজনে তিনি কাব্য থেকে সাহায্য নিয়েছেন - 'মধুসূদন ব্যক্তিটি কেমন ছিলেন তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য যে পরিমাণে তাহার কাব্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন - তাহাও করিয়াছি'। ২৫৫

প্রমথনাথ শশাঙ্ক মোহন-কৃত ভাষ্যের অনুসারী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা দৃশ্যমান। যেমন শশাঙ্ক মোহন কিছুটা Hero Worship — এ বিশ্বাসী। মধুসূদন তাঁর কাছে ভাব-বীর। প্রমথনাথের কাছে তিনি মানুষ। প্রমথনাথ জীবন ভাষ্যের রচয়িতা। তাই জীবন চরিতমূলক দিকটিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

আদিকাণ্ড, বনবাস, মধুচক্র, স্বর্ণমৃগ, সীতাহরণ নাটকের পাঁচটি অঙ্কের মতো মধুসূদন জীবন-নাট্যের পঞ্চাঙ্ক। এরই ভিতর দিয়ে কবির জীবন-ট্রাজেডি রূপায়িত হয়েছে। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও কবির ত্রিবেণীসঙ্গমে মধুসূদনের জীবনী - শতদলটি অপরূপ শিল্প সুসমায় বিকশিত হয়েছে। 'যিনি রামায়ণকে ভেঙে মেঘনাদবধ কাব্য

২৫৩। তদেব - পৃঃ

২৫৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য - ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র (১৯৭৫) - পৃঃ - ১২।

২৫৫। মাইকেল মধুসূদন - প্রমথনাথ বিশী - ভূমিকা - পৃঃ

রচনা করেন তাঁরই জীবনকে রামায়ণী কথার ছাঁচে ফেলে চরিত-সাহিত্য রচনা করা উন্নত শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর'।^{২৫৬} মরোআ শেলীর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে বা লুড উইগ Genius and character — গ্রন্থে অনুরূপ শিল্প-সুখমা ও কবি-কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। শেলির জীবন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মরোআ যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। প্রমথনাথ মধু-কবির সঙ্গে অতখানি একাত্মতা অনুভব না করলেও তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও বেদনা বোধ প্রকাশ করেছেন তা নিখাদ ও আন্তরিক।

[খ] জওহরলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব :—

গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫১ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর ; অবশ্য গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশের পূর্বে পণ্ডিত নেহরুর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশ পত্রিকায় [৩ অগ্রহায়ণ থেকে ৯ই পৌষ, ১৩৫৬] কয়েকটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও প্রমথনাথ একাধিক সময়ে জওহরলাল সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন ১৯৫১ খৃঃ ২৯শে জুলাই ও ১৯শে আগষ্ট রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় জওহরলাল সম্পর্কে দুটি মননসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। ১৯৬৪ খৃঃ জওহরলালের মৃত্যুর পর ৪ঠা জুন আনন্দবাজারে 'কমলাকান্তের আসরে' 'নেহরু ও আমরা' - প্রবন্ধটি লেখেন, ৮ই জুন সংখ্যায় 'জওহরলালের পুত্র ভ্রম্মাধার আগমন প্রতীক্ষায়' নামে একটি কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়। ১১ই জুন ও ১৮ই জুন লেখেন যথাক্রমে 'নেহরু ও পাশ্চাত্য মন' এবং 'নেহরুর ব্যক্তিত্ব'।

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে 'বিচিত্র উপল' গ্রন্থে 'পণ্ডিত জওহরলাল' নামে এবং 'কমলাকান্তের আসর' গ্রন্থে 'জাদুকর নেহরু' নামে যে দুটি প্রবন্ধ আছে তাদের মধ্যে নেহরুর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও নাটকীয়তাপূর্ণ জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যেমন 'ভারতবর্ষে পণ্ডিতজীর চেয়ে মহত্তর ব্যক্তি অনেক জন্মিয়াছেন - কিন্তু এমন বিচিত্রতম ব্যক্তিত্ব আর দেখা যায় নাই'।^{২৫৭} কিংবা - 'কর্মপ্রবাহের জনকল্লোলের তীরে বসিয়া উদাসীন এই দার্শনিক। প্রচলিত উৎসাহের কেশরপুঞ্জ আকর্ষী শিল্পের এই সন্ন্যাসী। জওহর চরিত্র বিষয়ের সমন্বয়। তাঁহার চোখের প্রশান্ত বিবাদের কালো যবনিকা ঘুটাইয়া কেহ তাঁহাকে কখনো জানিতে পারিবে না। আর সেই জন্যই তাঁহার বিষয়ে কৌতূহলেরও কখনও শেষ হইবে না'।^{২৫৮}

জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের জাতীয় নেতা, পৃথিবীর দেশ বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে একাধিক জীবনী গ্রন্থ

২৫৬। বাংলা চরিত সাহিত্য-দেবী পদ ভট্টাচার্য - ১৩৬৪ সং, পৃঃ ২৬২।

২৫৭। বিচিত্র উপল - প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ৪৬।

২৫৮। বিচিত্র উপল - পৃঃ ৪৭।

লিখিত হয়েছে। কিন্তু প্রমথনাথ লিখিত 'জওহরলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' সম্পূর্ণ ভিন্ন হাতের ও ভিন্ন ধাঁচের লেখা। প্রচলিত ধাঁচে বিভিন্ন তথ্যের পুঞ্জীভূত রূপ অবলম্বনে প্রমথনাথ নেহেরুর জীবন ধারা লিপিবদ্ধ করেননি। বরং নেহেরু রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, কর্মেষণা ও মতাদর্শ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। মোট ৭টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে সমগ্র গ্রন্থটিকে - ব্যক্তিরূপ, ব্যক্তিত্বের উপাদান, আত্মচরিত, ভারত আবিষ্কার, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, নেহেরু আবিষ্কার, দুই জীবন।

ইতঃপূর্বে 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থে প্রমথনাথ মধু-কবির জীবন ভাষ্য রচনা করেছেন। সেখানে ঐতিহাসিক পটভূমি ও স্বরচিত কাব্য-সাহিত্যের সাহায্যে লেখক জীবনীকে করে তুলেছেন জীবন শিল্প। উপন্যাস, নাটক, ও কবি-কল্পনার সমন্বয়ে মধুজীবনের অন্তর্বিব্রাণ এক নবতর মাত্রা ও মর্যাদা লাভ করেছে। তথ্যের নির্যাসটুকু নিয়ে লেখক এক অসামান্য মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু দশ বছর পরে লেখা 'জওহরলাল নেহেরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থে নেহেরুর জীবনদর্শন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা, কর্মজীবন ও ভাবজীবনের বিধা-দ্বন্দ্বের কথা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্নভাবে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মিল ও অমিল তথা সমসাময়িক অন্যান্য ভারতীয় ও বিশ্ববিখ্যাত পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্যের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন।

লেখকের দৃষ্টি নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত। তবে তিনি নিরাবেগ বা কল্পনাবর্জিত নন। বরং তাঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও বিদ্যার সঙ্গে ভাবুকতা ও অনুভূতির গভীর মেলবন্ধন ঘটায় ফলে মূল বিষয়বস্তু যথার্থভাবে বিপ্লিষ্ট হয়েছে এবং স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন— 'নেহেরুর জীবনী এ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা ঐ কর্মফলের স্তূপমাত্র। . . . ব্যক্তি নেহেরুর চেয়ে, কর্মী নেহেরুর চেয়ে, রাজনৈতিক নেহেরুর চেয়ে নেহেরুর ব্যক্তিত্ব অনেক অনেক মহৎ —অনেক চিন্তাকর্ষক তো বটেই'। ২৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক নেহেরুর উক্ত ব্যক্তিত্বের উপাদান সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর মতে নেহেরুর নিঃসঙ্গ শৈশব ও বাল্যকাল, হারো ও কেন্দ্রিজের শিক্ষাজীবন, বৈজ্ঞানিকোচিত নির্বিকার, নিস্পৃহ মনোভাব প্রভৃতি তাঁর ব্যক্তিত্বের উপাদান। আর 'নেহেরুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান গান্ধীজীর প্রভাব'। ২৬০

২৫৯। জওহরলাল নেহেরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব - প্রমথনাথ বিশী, ১৯৫১, পৃঃ ৭।

২৬০। তদেব - পৃঃ ১১।

ব্যক্তিগত সাধুতায় ও আদর্শ নিষ্ঠায়, আন্তরিকতা ও নিস্পৃহতায় নেহেরু গান্ধীজীর উপযুক্ত শিষ্য। কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। নেহেরু লৌকিক পুরুষ, আর গান্ধীজী লোকোত্তর পুরুষ। গান্ধীজীকে লোকে বোঝে প্রজ্ঞা ও অনুভূতির দ্বারা, নেহেরুকে বোঝে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে নেহেরুর আত্মচরিতে লিখিত বিভিন্ন বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিণতি দেখানো হয়েছে। নেহেরুর ব্যক্তিত্ব দ্বিধা বিভক্ত - 'একজন ভারতমুখী, অপরজন পাশ্চাত্যমুখী, একদিকে আদর্শ নিষ্ঠা, অন্যদিকে বাস্তবপ্রীতি। উভয়ের যথায়থ সমন্বয় কখনও হয় নি। এখানেও গুরু-শিষ্যের প্রভেদ প্রকট - 'নেহেরু সেই সমুদ্রের নাবিক যাহাতে ঝড় আছে অথচ কূল নাই, গান্ধীজীর সমুদ্রে ঝড়ও আছে, কূলও আছে, নেহেরু নাবিকমাত্র, গান্ধীজী দিশারী'। ২৬১

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নেহেরুর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থ থেকে তাঁর ব্যক্তি স্বরূপের মর্মোন্মোচন করার চেষ্টা হয়েছে। এখানে তাঁর ভারতচেতনা আরো স্পষ্ট ও গভীরতর। সেই সঙ্গে নেহেরুর নিজের পরিচয় আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজবাদী মনের সংশ্লেষণের প্রচেষ্টা এই সময়ের নেহেরু মানসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এরই মধ্যে পাওয়া যায় মানবতাবাদী ও সৌন্দর্যপ্রিয় নেহেরুর ভিন্নতর প্রেক্ষাপট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে নেহেরুর অধ্যাত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য ও তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর ধারণার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নেহেরু চরিত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ও স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। লেখকের মতে— 'নেহেরুর যথার্থ প্রতিষ্ঠা তাঁহার ব্যক্তিত্বে। তাঁহার অসাধারণ মনীষা, তীব্র ভাবাবেগ, সুদৃঢ় চরিত্র, সমস্তই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আনুষঙ্গিক'। ২৬২

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ভিন্নবস্তু। 'নেহেরুর চরিত্র হীরার ভার। কিন্তু তাহার আসল মূল্য ব্যক্তিত্বের প্রভায়'। ২৬৩ এইভাবে লেখক জীবনী রচনার এক নূতন দিগদর্শন রচনা করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদে নেহেরুর ভাবজীবন ও কর্ম জীবনের বিপরীতমুখী আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিশ্লিষ্ট হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি ও ভারত-প্রীতি তাঁকে ভাবুক ও কর্মীরূপে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে। লেখক অতি সুন্দর ও কবিত্বময় ভাষায় নেহেরু-জীবনে ভারতবর্ষের স্বপ্ন, সাধ, সাধনা ও কল্পনার সমন্বয় বর্ণনা করেছেন— 'দেশের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কবির স্বপ্ন, বীরের বীর্য, ঋষির তপ্তচিন্তা,

২৬১। তদেব - পৃঃ ২৩।

২৬২। জগদ্বরলাল নেহেরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব — প্রমথনাথ বিশী, ১৯৫১, পৃঃ ৩৯।

২৬৩। তদেব, পৃঃ ৪০।

যোগীর সাধনা, সমস্ত ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, ভারতের চিন্তাশক্তিদের মাধ্যমে সংগৃহীত হইয়া, একীভূত হইয়া একটি ব্যক্তিত্ব শিখারূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। নেহেরু সেই ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিক নেহেরুর উর্ধ্ব ব্যক্তি নেহেরু, আর ব্যক্তি নেহেরুর অনেক উর্ধ্ব নেহেরুর ব্যক্তিত্ব'। ২৬৪

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ১৯৬৪ খৃঃ নেহেরুর মৃত্যুর পূর্বেই নেহেরুর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধায় ভাঁটা পড়ে। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের উপর পাকিস্তান যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করতো এবং এদেশে এসেও উদ্ভাস্ত হিন্দুরা যে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করতো তার প্রতিকারে নেহেরু কোন সক্রিয় ব্যবস্থা না করায় আনন্দবাজারে কমলাকান্তের আসরে প্রমথনাথ নেহেরুর বিরূপ সমালোচনা করেছেন নির্ভীক চিন্তে। তাঁর জগৎহরলাল প্রীতি এবং জগৎহরলালের জীবদ্দশাতেই প্রীতি হাসের কথা জানতুম। নেহেরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বভারতীয় মত বাঙালী কমলাকান্তের হাতে কিছু বদলে ছিল'। ২৬৫

লেখক একত্র স্বীকার করেছেন যে মধুসূদন জীবনভাষ্য ও গান্ধী জীবন ভাষ্যের সঙ্গে নেহেরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। তার ভাষায়— 'সে ঠিক এ ধাঁচে লিখিত নয়, নেহেরুর সংগ্রামী জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও আলোচনা'। ২৬৬

গ্রন্থের শেষের দিকে লেখক ইঙ্গিত করেছেন যে ভাবুক নেহেরু কর্মী নেহেরুকে পিছনে ফেলে শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তাঁকে পরিস্থিতির চাপে অসময়ে বিদায় নিতে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। জীবনী বা চরিত্র-চিত্র-রচকের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী না করে জীবনের পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করার পর বিশ্লেষণ করাই শ্রেয়। তা না হলে চরিত্রকথা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়।

এটি প্রচলিত জীবনী নয় বলেই এর মধ্যে নেহেরুর জীবনধারার চেয়ে জীবনদর্শন, তথ্যের চেয়ে তত্ত্ব, বর্ণনার চেয়ে বিশ্লেষণ, ইতিহাসের চেয়ে দর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের চেয়ে মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে এই গ্রন্থের আবেদন উচ্চস্তরের শিক্ষিত মানুষের মতোই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই কারণেই গ্রন্থটি প্রকাশের ৫ মাস পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে সমালোচনা করা হয় তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়— 'এই পুস্তকখানিতে স্বল্প পরিসরে নেহেরুর জীবনের বিভিন্ন দিক সরলভাষায় আলোচিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার কোন কোন মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকও নেহেরুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন'। ২৬৭

২৬৪। তদেব, পৃঃ ৫২।

২৬৫। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩ - শঙ্করী প্রসাদ বসু - পৃঃ ১৪১৫।

২৬৬। গান্ধীজীবন ভাষ্য - প্রমথনাথ বিশী, ১৩৮৩, ভূমিকা।

২৬৭। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, পৃঃ ২৫১ - সমালোচকশ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল।

বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত নেহরু মানস অনুধাবন করা বেশ আয়াসসাধ্য। লেখকের বস্তুবোয় গভীরতা এবং সংযত, সংহত, মিতবাক, অর্থঘন উক্তি ও মন্তব্য অনুধাবন করা বিশেষ শিক্ষা ও পরিণত চিন্তাধারার বিষয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা সাহিত্যে কোন জীবনীর মধ্যে শুধু ব্যক্তিত্বের নির্যাসটুকু নিয়ে এমন তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক আলোচনা একান্তই বিরল। এই গ্রন্থে নেহেরুকে ভারতাত্মার প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে। একথা সর্বাংশে ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হতে পারে। কিন্তু যে কয়জন মনীষী একদা ভারতকে বিশ্বসভায় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছিলেন নেহেরু তাদের মধ্যে একজন। লেখক সেই ভারত আবিষ্কারের মূলস্রোতে নেহেরুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরূপে অঙ্কন করতে সফল হয়েছেন।

আসলে এমন বিশাল ব্যক্তিত্বের সন্ধান করা যায় কিন্তু তার তল পাওয়া যায় না। এবং সেই কারণেই শেষ কথা বলা হলেও, কথার শেষ হয় না। গ্রন্থটির উপসংহার এই অশেষের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হওয়াতেই লেখকের দূরদর্শিতা ও প্রতিভার গভীরতা ধরা পড়ে।

[গ] গান্ধীজীবন ভাষ্য : [১৩৮৩]

গ্রন্থটির নামেই প্রকাশ যে গ্রন্থকার গান্ধীর জীবনী রচনা করেননি, জীবনের বিভিন্ন উপাদান ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করে গান্ধী-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন - 'গান্ধী জীবনভাষ্য গ্রন্থখানিকে ঠিক গান্ধী জীবনী বলা উচিত হইবে না'। আবার কোন পদ্ধতিতে এই জীবনভাষ্য রচিত হয়েছে সে প্রশ্নে জানিয়েছেন— 'আমার ভক্তের চোখ নয়, সমালোচকের চোখ। . . . গান্ধীর প্রতি আমার অহেতুক ভক্তি, তৎসত্ত্বেও তাঁহার দোষ ত্রুটি [আমার বিশ্বাস মতে] আমার চোখ এড়ায় নাই। আমার ভক্তিও যেমন অহেতুক, সমালোচনাও হয়তো সেইরূপ। দুয়ের সঙ্গেই নুন মিশাইয়া গ্রহণ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি'।^{২৬৬} তাঁর মতে এই গ্রন্থ 'গান্ধী জীবনীর উপাদান' এবং পরবর্তী জীবনীকারগণ যদি এই গ্রন্থ থেকে গান্ধী জীবনী রচনার কোন উপাদান লাভ করেন তবে লেখকের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

অবশ্য 'উপাদান' কথাটি এখানে বিশেষ ইঙ্গিতবহ। গান্ধীজীবন বিশাল ও দুরধিগম্য ব্যক্তিত্ব ও কর্মযজ্ঞ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য নয়। সেদিক থেকে এই গ্রন্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তবে সম্পূর্ণতার পথের দিশারী। গান্ধী-জীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী তথ্যপঞ্জী থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলিকে নির্বাচন করে প্রমথনাথ স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী তাকে বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন। একাজে গান্ধীজীবন আত্মজীবনী ও অন্যান্য রচনাবলী তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছে।

এই গ্রন্থে গান্ধী রচিত আত্মজীবনীৰ ভাষ্য। লেখকের ভাষায়— 'গান্ধী লিখিত আত্মজীবনী যেকোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে আমার মনে, তারই সংগ্রহ গান্ধী জীবন ভাষ্য'। ২০৯

এদিক থেকে বিচার করলে এই গ্রন্থ ভাবাত্মক ও হৃদয়বেদ্য, বুদ্ধিভিত্তিক বা বস্তুগত নয়। এ গ্রন্থের বহু অর্থঘন মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত উপলব্ধিগত সত্যে উদ্ভাসিত। জীবনী ও জীবনভাষ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিহিত আছে। সমালোচকের ভাষায় — 'জীবন ভাষ্য স্বতন্ত্র জিনিস। জীবনীর লক্ষ্য যদি হয় তথা, জীবনভাষ্যের লক্ষ্য ঐ তথ্যের তাৎপর্য। তাৎপর্য হয়তো জীবনীতেও থাকে, কিন্তু তা কেবল ব্যঞ্জনায়া। তাৎপর্য প্রাধান্য পেলেই তা ভাষ্য হয়ে দাঁড়ায়'। ২১০

অবশ্য একথা ঠিক যে সার্থক জীবনী মাত্রেই কিছুটা ভাষ্য-নির্ভর হতে বাধ্য। আর গান্ধীর মতো লোকোত্তর ব্যক্তির জীবনীতে ভাষ্য-ধর্ম অপরিহার্য। আবার সকল জীবন ভাষ্যই জীবনী আশ্রিত হতে বাধ্য। জীবনী ও জীবনভাষ্য পরস্পর সাপেক্ষ।

গান্ধীজী সমকালীন যুগের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, এক মহাবিশ্ময়কর ও রহস্যময় পুরুষ। সেই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা অতীব কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। মহাত্মা গান্ধীর এই বরণীয় জীবন-ভাষ্য চিত্রণে প্রমথনাথ একাধিক ছোট বড় প্রবন্ধে মহাত্মাজী সম্পর্কে নিজের চিন্তা চেতনা ও ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এদের মধ্যে 'নানারকম' গ্রন্থে বিবৃত 'গান্ধীজী', 'সাধারণ মানুষ গান্ধী', 'নীলকণ্ঠ', 'মহামানব মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান', 'মহাত্মাজীর সাধনার বৈশিষ্ট্য' প্রভৃতি; 'বিচিত্র উপল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মহাত্মাগান্ধীর লাঠি'; 'বিচিত্র সংলাপ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'গান্ধী ও চার্চিল', 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে গান্ধী নামক এই রহস্যময় পুরুষের মৌলিক ব্যক্তিরূপ অতি সরল ও স্বল্প উপাদানে গঠিত। 'সত্যে নিষ্ঠা এবং সেবার আগ্রহ এই তাঁর ব্যক্তিরূপের মূলধন'। ২১১ গান্ধীর জীবনই গান্ধীর বাণী। উক্ত সত্য ও সেবা তাঁর জীবনে একাত্ম। আবার তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন এই সেবারই অভিন্নরূপ। গান্ধীজী যে অহিংসার পথে সারাজীবন চলেছেন বা মানুষকে চলার কথা বলেছেন তার মধ্যে তাঁর কোন মৌলিকতা নেই। কারণ ভারতে ইতিপূর্বে অনেকেই উক্ত জীবনবোধ

২৬৯। তদেব।

২৭০। গান্ধীজীবন ভাষ্য : সমালোচনা - সত্যেন্দ্রনাথ রায়, কথাসাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩৮৫, পৃ: ৬০৪।

২৭১। গান্ধীজীবন ভাষ্য - প্রমথনাথ বিশী, পৃ: ২।

প্রচার করেছেন। তাঁর মৌলিকতা হল এই যে এই ভাবধারা আগে ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্মচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু গান্ধী তাকে প্রথম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগ করলেন। আর এই জন্য তিনি যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব।

গান্ধীজির সত্য ও সেবধর্মের সার্থকতার মূলে আছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক উপাদান - ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা। ব্রহ্মচর্য জন্ম দেয় সংযমের। গান্ধীজির জীবনের সর্বত্র এই সংযমের চিহ্ন স্পষ্ট। এমনকি তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে এই সংযমের প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। স্বল্পতম শব্দে প্রভূততম ভাব প্রকাশের ক্ষমতায় পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ।

প্রমথনাথের এই ভাষ্য রচনাতেও উক্ত সংযত, সংযত, অর্থঘন ও ভাবগর্ভ বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতা ফুটে উঠেছে। এ ব্যাপারে একদিকে স্বয়ং গান্ধীজির আত্মজীবনী অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মনে হয়। সংযত, পরিমিত, নিরলঙ্কার রচনার চরম গান্ধী সাহিত্য। তাঁর রচনারীতি যেন তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রক্ষেপ - 'গান্ধী রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে গান্ধীর ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়'। ২৭২

চরিত্র গঠনে বংশগতির প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন। প্রমথনাথ দেখিয়েছেন গান্ধীজির ধর্মজীবন গঠনে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল অসীম। যে উপবাসের গুরুত্ব গান্ধীজীবনে ও রাজনীতিতে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী তার জন্যও তিনি মায়ের কাছে ঋণী। পিতার ধীরোদাস আচার আচরণ, এবং নিজে আত্মশুদ্ধির নামে দুঃখভোগ করে অপরকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গান্ধীজিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

গান্ধীজির ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা এবং সেখানে একদিকে খাঁটি ইংরেজ হওয়ার প্রচেষ্টা অন্যদিকে মায়ের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিরামিষ ভক্ষণ, সুরা ও নারীবর্জন - তার আত্মগঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল। আধ্যাত্মিক শক্তি ও মানবিকতাবোধ অর্জনে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল বিখ্যাত সংব্যবসায়ী রায়চন্দ্র ভাই এর সংসর্গ; টলস্টয়ের "Kingdom of God is within you" — এবং রাষ্ট্রিনের "Unto this last" — নামক পুস্তকদ্বয়।

ব্যারিস্টারী পাশের পর - চাকুরিসূত্রে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন। ১৮৯৩ খৃঃ থেকে দীর্ঘ একুশ বছর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-বেদনায় সঙ্গী ছিলেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্ব শক্তির প্রকাশ ও সত্যগ্রহ নীতির সূত্রপাত ঘটে। নির্যাতিত ভারতবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন সংগঠনের পীঠস্থান ছিল আফ্রিকার নাভাল। পরবর্তীকালে

এরই জোরে তিনি আসমুদ্র ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণের হৃদয়-সিংহাসনের অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন। শান্তিরক্ষা করে ও স্বৈচ্ছায় দুঃখ বহন করে বিপক্ষের মনে স্পৃহনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব এই মহত্তর সত্যের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। পরবর্তীকালে বুয়র যুদ্ধে, টলস্টয় ফার্মে এবং ভারতবর্ষের শান্তিনিকেতন আশ্রমে, সাবরমতী আশ্রমে, চম্পারণ সত্যাগ্রহে তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আরো পরে এসেছে অসহযোগ, আইন অমান্য, ডাঙী অভিযান ও ভারতছাড়ো আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাঁর বাণী আর জীবন সমার্থক হয়ে উঠেছে - 'হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তামাম হিন্দুস্থান উথাল পাথাল হো যায়েঙ্গে'।

রাজনীতির ক্ষেত্রে গোখেলকে গুরুত্ব মর্যাদা দিলেও যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সৃষ্টি করে গান্ধীজি নিজে ইতিহাসে পরিণত হয়েছেন তা কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রতিভা। লেখকের ভাষায় - 'সত্যে নির্ভার সত্যর সঙ্গে যুক্ত হলো সেবায় আগ্রহের আগ্রহ, আর দুয়ের সন্ধিতে হয়ে দাঁড়ালো সত্যাগ্রহ'।^{২৭৩} এই সত্যাগ্রহ কোন নিষিদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি নয়, এ হচ্ছে আত্মিক শক্তি, প্রেমের শক্তি।

গান্ধীজির তত্ত্বের শিকড় বাস্তবের মাটিতে প্রোথিত। তাঁর অনেক ব্যবহারিক গুণের মধ্যে একটি প্রধান হচ্ছে কখন আক্রমণ করতে হবে, কখন আপস করতে হবে সে বিষয়ে তাঁর নিখুঁত সহজাত বুদ্ধি। তাই 'গান্ধী আপসপছীও নন, যুদ্ধপছীও নন, তিনি বাস্তবপছী। নিজেকে তিনি বলেন — Practical Idealist.^{২৭৪}

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ। কর্মী ও কবি পরস্পরের কিছু সমালোচনা করলেও মূলতঃ ছিলেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গান্ধীজির কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গুরুদেব। আর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের জগতে যে ত্যাগী, ভারত প্রেমিক মহাত্মার ছবিটি ছিল সযত্নে লালিত তারই বাস্তব ও জীবন্ত বিগ্রহ স্বয়ং গান্ধীজি।

'গান্ধী জীবনভাষ্য' শুধু জীবনীকার বা ঐতিহাসিকের কলমে লেখা নয়। এর মধ্যে প্রমথনাথের লেখক সত্তার বিচিত্র বর্ণের উদ্ভাস ফুটে উঠেছে। তিনি একাধারে জীবনীকার, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবি, শিক্ষক ও কথাকারের সম্মিলিত সত্তা নিয়ে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অসাধারণ ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র সত্তাকে

২৭৩। গান্ধীজীবন ভাষ্য, পৃঃ ৪৫।

২৭৪। গান্ধীজীবন ভাষ্য, পৃঃ-৭৭।

ছাপিয়ে উঠেছে একজন খাঁটি মনযোগী পাঠকসত্তা। আর সেই পাঠকের একচোখে ভক্তির বিনম্র দৃষ্টি, অন্যচোখে সমালোচকের বিচারশীল ও তীক্ষ্ণ নজর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সমালোচকের উর্ধ্ব স্থান পেয়েছে ভক্ত। তাঁর মাথা লুটিয়ে পড়েছে সেই হিমালয় সদৃশ রহস্যময় ব্যক্তিত্বের চরণতলে বিনম্র নমস্কারে। এখানে যুক্তির বাঁধ ভেঙে ফেলেছে আবেগের মহাপ্রোতস্বিনী; গান্ধীভক্তির অকৃত্রিমতাই হয়তো এর মূল কারণ। এই অবিমিশ্র গান্ধীভক্তি কিছুটা অস্বাভাবিক, তবে অসম্ভব নয়। সমালোচকের ভাষায়— 'অনুরাগ আসে সূক্ষ্ম কারণ সূত্রে, আসার পর তার প্রাবল্য কারণের সুতো ছিঁড়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর গান্ধীজি প্রমথবাবুর বুদ্ধি-জগতের বিপরীত ভূমিতে আছেন। তাই আকর্ষণ। গান্ধীজির স্থির প্রত্যয়ের ভিত্তিকে ক্ষুদ্র, ক্ষত করতে পারে না বুদ্ধিশর। প্রতিহত হয়ে তা ফিরে আসে এবং লুটিয়ে পড়ে নমস্কারে'। ২৭৫

এই ভক্তির ভিত্তি রচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ শান্তিনিকেতনে যখন প্রমথনাথ ছাত্রাবস্থায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২১ দিন গান্ধীজির তত্ত্বাবধানেও গুস্তাভায় গান্ধীজির করুণাঘন মূর্তি অতি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

জীবনভাষ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়নের মধ্যে এই আবেগের ফেনিল সংসক্তি যেন একটু দুর্বলতাপ্রসূত ও বিসদৃশ বলে মনে হয়। তবে এর নাটকীয়তা ও শৈল্পিক মাধুর্যটুকুও বিশেষ হৃদ্য।

[য] চিত্র-চরিত্র : [১৯৪৯] যে কোন পুস্তক রচনা বা নবতর পরিকল্পনানুযায়ী কোন কিছু লেখার আগে সেই সম্পর্কে উপযুক্ত ভূমিকা লেখা প্র. না. বি.-র একটি বৈশিষ্ট্য। 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে দেশ পত্রিকায় [সাপ্তাহিক] ২১শে কার্তিক, ১৩৫৪ থেকে 'প্র.-না.-বি.-র এলবাম [চিত্র চরিত্র]' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রথম সংখ্যাতে লেখক তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনার কথা ভূমিকা রূপে উপস্থাপিত করেছেন। লেখকের ভাষায় 'এই জাতীয় রচনা না ইতিহাস, না জীবনচরিত, না সমালোচনা, না তত্ত্বাত্মক অন্যকিছু, ইতিবাদের চেয়ে নেতিবাদের দ্বারাই এগুলির পরিচয় দেওয়া সহজ। কোন একজন লেখকের একখানি ছবি দেখিলে পাঠকের মনে যে ভাব যেভাবে ও যে পরিমাণে উদ্ভিক্ত হইতে পারে, প্র. না. বি.-র এলবামে সেটুকু ধরিবার চেষ্টা হইবে। . . . নাক, চোখ, কান, ওষ্ঠাধরের ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্তির অন্তর্জীবন ও চরিত্রকে প্রকাশ করাই এই এলবামের উদ্দেশ্য। সেই কারণে এগুলির অপর নাম চিত্র-চরিত্র। . . . বৈচিত্র্যই জীবনচরিত্রের প্রধান সম্পদ। প্র. না. বি.-র এলবামে সাদা কালো দুইরকম আঁচড়ই পড়িবে। প্র. না. বি.-র এলবামে চার শ্রেণীর চিত্র চরিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। দেশী, বিদেশী, ঐতিহাসিক

ও কাল্পনিক। দেশী চিত্র যেমন রামমোহন ও গান্ধী। বিদেশী চিত্র বার্ণাডশ ও টলস্টয়, ঐতিহাসিক যেমন আকবর ও বুদ্ধ, আর কাল্পনিক বলিতে বুদ্ধিতেছি যেমন কালিদাসের দুঃস্বপ্ন আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ রায়। অঙ্কিত চিত্রগুলির সমস্তই যে মহত্বে সমপর্যায়ভূক্ত হইবে, এমন নয়; কারণ আগেই বলিয়াছি, বৈচিত্র্য প্রদর্শন প্র. না. বি-র উদ্দেশ্য, নিছক মহত্ব বর্ণনা নয়'। ২৭০ অবশ্য ভূমিকায় গৃহীত পরিকল্পনা তিনি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। কারণ চার শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণের পরিবর্তে তিনি শুধু দেশী চিত্রকেই শেষ পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। ডেভিড হেয়ার, কেরী, ডিরোজিও, নিবেদিতা প্রভৃতি চরিত্রকে বিদেশী বলা যায় না। লেখক নিজেও তা স্বীকার করেছেন। কারণ তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মোট ৩৯ জনের অন্তর্জীবন ও চরিত্রকে স্বল্পরেখায় চিত্রিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কাজেই প্রচলিত অর্থে একে জীবনচরিত বা জীবনী আখ্যা দেওয়া যায় না। তবে এ গুলির মাধ্যমে বাংলার ঊনবিংশ শতকের গৌরবোজ্জ্বল যুগচিত্র অঙ্কনের সচেতন প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ইহা একটি যুগের জীবন চরিত। মানুষের মতো প্রত্যেক যুগেরও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকে। সেই ব্যক্তিত্ব সেই যুগের মনীষিগণের কর্মে ও জীবনে বিশিষ্ট স্বরূপে প্রকাশ পায়। সেই স্বরূপের ব্যাখ্যাতেই যুগ জীবনী রচিত হইতে পারে। চিত্র চরিত্র যুগ জীবনী রচনার সেই চেষ্টা'। ২৭৭

ঊনবিংশ শতকের যুগস্বরূপ তথা ব্যক্তিস্বরূপের মূল কথা আত্মোপলব্ধি। বিশদভাবে ইহাই চিত্র চরিত্রগুলিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মোপলব্ধিরই অপর নাম ভারতোপলব্ধি। এই ভারতোপলব্ধির লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মনীষিগণ মানুষের সর্ববৃত্তির সমন্বয়সিদ্ধ একটি পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লক্ষ্য ভারততীর্থ, পন্থা সর্ব বৃত্তির সমন্বয়সিদ্ধি'। ২৭৮

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্র, রবীন্দ্র পরিমন্ডলে মানুষ ও বঙ্কিম ভাবধারায় পুষ্ট প্রমথনাথ খন্ডিত প্রাদেশিক চেতনার পরিবর্তে অখন্ড ভারতবোধে দীক্ষিত ছিলেন। যাদের চিন্তা, কর্ম ও জ্ঞানসাধনা ঊনিশ শতকে এই ভারতীয় চেতনার মর্মমূলে রসসঞ্চার করেছিল তাদের জীবনচিত্রের খসড়া রচনা করেছেন লেখক। এইসঙ্গে উক্ত যুগের সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মর্মবাণীও তিনি স্বল্পকথায় লিপিবদ্ধ করতেও বিপ্লবে প্রয়াসী হয়েছেন। কিভাবে বিভিন্ন, বিচিত্র, পরস্পর

২৭৬। দেশ পত্রিকা, ২১শে কার্তিক, ১৩৫৪, পৃ: ৪।

২৭৭। চিত্র চরিত্র, ১৩৭২, ভূমিকা

২৭৮। তদেব-ভূমিকা-

বিরোধী ভাবধারার মধ্যে তৎকালীন মনীষিগণ একটি অখন্ড সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তারই ভাষ্যরচনায় প্রমথনাথ আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে যুগজীবনের টানাপোড়েনে যে আধুনিকতাও নবজীবনবোধের সঞ্চার হয়েছিল তার হৃদস্পন্দনটি প্রমথনাথ বিশী যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে - '১৮৩৫ এ বাঙলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূচনা, ১৮৩৬ - এ রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম, একটার টান বাহিরে, আর একটার টান ভিতরে, আর এই দুইয়ের টানাটানির সমন্বয়ের পথে নব্য বঙ্গের যাত্রা। ... ইয়ং বেঙ্গলের অবিশ্বাস, আর ওল্ড ফুলদের অতিবিশ্বাস, দুয়ের ঠেলাঠেলিতে নব্যবঙ্গের বিশ্বাসের সূত্রপাত। মধ্যযুগীয় সাধন পছা আর চিরযুগীয় সাধন লক্ষ্য, দুইয়ের টানাটানিতে নব্যযুগের সিংহদ্বার খুলিয়া গেল। শিক্ষাভিমানী বাঙলাদেশের ভাবসাধনার গুরু এক নিরঙ্করপ্রায় সাধক'।^{২৭৯} চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে সংযম সমুজ্জ্বল ভাষার যোগে দ্রষ্টা ও শ্রব্য, মনীষী ও শিল্পীর এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় উক্ত রচনাটির মতো প্রায় সব রচনাতেই। সমালোচকের ভাষায় - 'ভারতবর্ষরূপ দেবতাস্বা হিমালয়ের বাস্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ রূপ স্রোতধারা সম্বন্ধে বিশ্বজন অবহিত। বাংলা সাহিত্যের শ্যামলিম তৃণচ্ছায়ায় প্রবাহিত প্রমথনাথের সাহিত্য স্রোতস্বিনী এঁদের সমকক্ষ নয়, কিন্তু স্বগোত্র। এঁদেরই মতো প্রমথবাবুর সাহিত্যসাধনার মূল প্রেরণা ভারতোপলব্ধির প্রেরণা। তাঁর সাহিত্যের যদি কোন দর্শন থাকে, তা ভারতদর্শন'।^{২৮০}

এই ভারতোপলব্ধির সঙ্গে বোধ হয় অতি সঙ্গতকারণেই জড়িত আছে প্রমথনাথের সাধু গদ্যের প্রতি সহজাত প্রীতি। সংস্কৃত তৎসমশব্দবহুল ভাষার সংহত, গভীরও গভীর ক্লাসিক রূপটিকেই তিনি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন এই গ্রন্থে। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের পূর্বসূরী। প্রমথনাথের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে এই সাধুভাষা হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ, স্বজু, ওজো গভীর, দীপ্ত ও বেগবান।

অনেক সমালোচক 'চিত্র-চরিত্র' বইয়ের নামকরণে লিটন স্টেচির 'Portraits in Miniature' — [১৯৩১] গ্রন্থের বা লুডউইগের "Genius and character" — গ্রন্থের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে চিত্র-চরিত্র গ্রন্থের বিশিষ্ট যুগন্ধর ব্যক্তিদের আলোচ্য অঙ্কনের সঙ্গে স্টেচির 'Eminent Victorians' গ্রন্থের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনচিত্রের কথা মনে আসে। স্টেচির রচনা পদ্ধতির সঙ্গে প্রমথনাথের রচনার সাদৃশ্য

২৭৯। চিত্র চরিত্র, ১৩৭২, পৃঃ ৭-৮।

২৮০। প্রমথনাথ বিশী : লক্ষ্য ভারততীর্থ - প্রণবরঞ্জন ঘোষ। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ,

১৩৭৩, পৃঃ ১৩৪৫।

থাকলেও এবং একই প্রকার ঐতিহাসিক চেতনা ও নাটকীয় প্রবণতার পরিচয় মিললেও কিছু মৌলিক পার্থক্যও চোখে পড়ে। স্ট্রাচি ভিক্টোরিয়ান যুগের নর নারীকে নিয়ে বহু ক্ষেত্রে পরিহাস করেছেন বা শ্লেষ-বাণে বিদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁদের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি। কিন্তু প্রমথনাথ উনিশ শতকের মনীষিগণকে তথা তাঁদের বিভিন্নমুখী অবদানকে সপ্রশংসীকৃতি জানিয়েছেন। লঘু হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়ে চরিত্রচিত্রণের ইচ্ছা পোষণ করলেও পরবর্তীকালে 'তাঁহারা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। কলমের লঘুরেখা আপনি কখন গভীর দাগ টানিতে শুরু করিল'।^{২৮১}

"Eminent Victorian" গ্রন্থ প্রসঙ্গে স্ট্রাচি সম্পর্কে বলা হয়েছে - "Strachy had introduced a newly creative form of biography, in which imagination was used to illumine and interpret fact to bring history to life."^{২৮২} প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থে প্রমথনাথ ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তথ্যের সঙ্গে কল্পনার ঐশ্বর্যযোগ করে এবং সূক্ষ্মদর্শনে নবতর ভাষ্যরচনা করে একাধিক মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করে একটি যুগেরই জীবন চরিত্র রচনা করেছেন।

কোন কোন লেখায় তথ্যের স্বল্পতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তা সত্ত্বেও প্রতিটি চরিত্রের হৃদয় রহস্যের গভীরে ডুব দিয়ে মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করে আনা বিশেষ নিষ্ঠা, সাধনা ও প্রতিভার কাজ। প্রমথনাথ এমনভাবে চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যাতে অন্তরের যথার্থ মানুষটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আসলে কৃতী ব্যক্তির জীবন কাহিনী তাঁর জীবনের কোন বিশেষ আচরণ বা ঘটনা বা মূল্যবান উক্তির মধ্যেই বহুলাংশে নিহিত থাকে। প্রমথনাথ সুকৌশলে সেই আপাততুচ্ছ অথচ গভীর অর্থবহ দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের প্রাণভোমরার যথাযথ পরিচয়টি উদ্ধার করেছেন।

১৯ শতক যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল, যৌবনের দিগ্বিজয়ের আঘাত প্রত্যাঘাতে তরঙ্গসঙ্কুল। তাই যুবকরা কিছু ভাবাবেগে আন্দোলিত। পরে এই ভাবালুতার উপর ডিরোজিও সম্প্রদায়ের 'Reason' — এর অস্ত্রোপচার শুরু হয়। আরো পরে কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব প্রভৃতি প্রগতিশীল রক্ষণবাদীরা এই যুগকে সংযত, সংহত করে তোলেন। পরিশেষে জ্ঞান, ভক্তি ও সমন্বয় মার্গের ভারত পথিকেরা আত্মোপলব্ধির

২৮১। চিত্র চরিত্র - ১৩৭২, ভূমিকা

২৮২। Eminent Victorians-Lytton Strachy—Collins, London & Glasgow, 1959, Introduction by 'Neol' Annan—Page-6.

দ্বারা ভারতোপলব্ধির মহাতীর্থে উপনীত হন। এইভাবে ভারতীয় মনীষীরা কঠিন সাধনাদ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে ভারতের শাস্বত আত্মাকে নূতন করে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বাংলা সারা ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মধ্যে প্রাদেশিকতার প্রসার ও ভারতবোধের সংকোচন ঘটায় তারা সেই গৌরবের আসন থেকে চ্যুত হয়েছেন। বাঙালীপ্রেমিক ও ভারতপ্রেমিক প্রমথনাথ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ও প্রাজ্ঞ ভাবার তুলিতে সেই অসাধারণ চিত্রটিই স্ফুটতর করেছেন 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থটিতে। প্রমথ-প্রতিভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি খন্ড ছিন্ন উপাদান অবলম্বনে একটি অখন্ড ভাববস্তু গঠন করেন; পরস্পর বিরোধী বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্রীয় ঐক্য আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে তার জীবনদর্শনের সমগ্রতা ধরা পড়ে। এই সমগ্রতার আবির্ভাব ঘটে দৃষ্টির ও মানসিকতার গভীরতা থেকে। শ্রদ্ধেয় সমালোচকের ভাষায় বলা চলে - 'উনচল্লিশটি বাঙালীর রেখা চিত্রের মধ্যদিয়া একটি গোটা যুগের চিত্র উপস্থিত করিতে যে প্রতিভার প্রয়োজন হয় তাহা যে কোন দেশেই বিরল। প্রমথনাথের এই বইখানি তাই ভারতীয় সাহিত্যের এক অপূর্ব সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে'। ২৮৩

[৩] সমালোচনা :

[ক] রবীন্দ্র-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী :

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথনাথ বিশীর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-সমালোচক হিসাবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। শান্তিনিকেতনে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও বিপুল সাহিত্য সম্ভারের প্রত্যক্ষ সাক্ষিগোষ্ঠী এসেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই এবং তাঁর সম্মুখেই প্রমথনাথ কাব্য, নাটক এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ সূচক বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেগুলি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের অন্যান্য বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সম্মুখে সাহিত্যসভায় পাঠ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত হননি। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের মনসৃষ্টির দিকে না তাকিয়ে নিজ মতানুসারে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর ভাষায়— 'তখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা বিশ্বভারতীর ছাত্র। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটি সাহিত্যসভা ছিল। সেবার অধিবেশন হইল উত্তরায়ণে স্বয়ং গুরুদেবের উপস্থিতিতে। শ্রোতার সংখ্যা বেশি ছিল না, ডক্টর উইগটারনিজ ও ডক্টর লেজনী

উপস্থিত ছিলেন। পাঠ্য প্রবন্ধ একটি মাত্র-‘রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব’ ; লেখক আমি। . . . মনে হইল, আমার বক্তব্য অকাট্য যুক্তি দ্বারা অছিদ্র করিয়া বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় বলিলেন, তাঁহার কবি-মন হাঁসের পাখার মতো, তাহাতে বাহিরের প্রভাব জলের মতো গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু আমার অবস্থা অন্যরূপ, আমার কপাল বাহিয়া তখন ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছিল - সেটা মাঘ মাস। হায় হায়, ঘরে পরে আর কোথাও আমার মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না - ইউরোপ হইতে পন্ডিতেরা আসিয়া আমার দুরবস্থা দেখিয়া গেল।

সেদিনের পরে অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, সেদিনকার প্রবন্ধের বক্তব্য সম্বন্ধে আমার মত দৃঢ়তর হইয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উপরে যে দুখানি কাব্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সে দুখানি কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। উপনিষদের প্রভাবও তাঁহার উপরে এত বেশি নয়। ইহা আমার সুচিন্তিত, দৃঢ়ভিত্তি অভিমত। এ বিষয়ে যে কোন লোকের সঙ্গে দীর্ঘকাল তর্ক চালাইতে আমি প্রস্তুত, কেবল যাঁহার সঙ্গে পরিতাম না, তিনি আজ নাই। ২৮৪

ম্যাট্রিক পাশের আগেই যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যুৎ আনার ব্যাপারে কয়েকটি গাছের ডালপালা কাটা হইছিল, তখন বন সম্পদ রক্ষার আবেদন জানিয়ে ও কলুপঙ্কজের নির্ভুরতা বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রমথনাথ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ‘এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার উপস্থিতিতে সভায় পড়িলাম। আমার অজ্ঞতা যে প্রশান্তসাগরিক অতলস্পর্শ তাহা বুঝিবার বুদ্ধি কি আমার ছিল। যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবি, তাহাকে প্রকৃতির প্রতি সজাগ করিবার আমার প্রগল্ভ প্রয়াস। যথোচিত তিরস্কারের কর্ণমর্দন পাইলাম’। ২৮৫

১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যা ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকায় ‘কালিদাসের চিঠি প্রথম ডাকে’ প্রবন্ধে কালিদাসের উষ্মশী ও রবীন্দ্রনাথের উষ্মশীর তুলনামূলক আলোচনা আছে।

১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা, ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকায় ‘রাজা’ নাটকের একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা পাওয়া যায়। ঐ সংখ্যায় ১৮১ পৃঃ আশ্রম সংবাদ এ আছে “ গত সভায় শ্রী প্রমথনাথ বিশী ‘ রবীন্দ্রকাব্যে পদ্মার প্রভাব ’ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ”

প্রভাত, বৈশাখ, ১৩২৬, পৃঃ ৬ -এ ‘রাজা ও রানী’ নাটকের ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা আছে। পরিণত মনের ছাপ এতে না থাকলেও প্রাথমিক

প্রয়াস হিসাবে এটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

রবীন্দ্র-সমালোচক হিসাবে প্রমথনাথের গ্রন্থ ও রচনাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় -

১। রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা :

[ক] রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ - ১৯৩৯।

[খ] রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর - ১৯৪৬ [পরে রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ১৯৬৬ তে]।

[গ] রবীন্দ্রসরনী - ১৯৬২।

২। রবীন্দ্রনাটকের সমালোচনা :

[ক] রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ [প্রথম] — ১৯৪৮।

[খ] রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ [দ্বিতীয়] — ১৯৫১।

[গ] রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ [পূর্ণাঙ্গ সং] — ১৯৬৬।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমালোচনা :

[ক] রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - ১৯৫৪।

৪। বিবিধ : এই পর্যায়ের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনা হলেও আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্র-সমালোচনা নয়।

[ক] রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - ১৯৪৪।

[খ] রবীন্দ্র বিচিত্রা - ১৯৫৪।

[গ] মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ - ১৯৬১ [পরে রবীন্দ্র বিচিত্রার অন্তর্ভুক্ত]।

[ঘ] শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ - ১৯৭২।

[ঙ] মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ - ১৯৭৪।

[চ] রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার - ১৯৮৫।

এছাড়া বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র পত্রিকায় [পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত] কিছু প্রবন্ধ আছে। লেখক চিত্রচরিত্র [১৯৪৯] গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ; 'বিচিত্র সংলাপ' [১৯৫৮] গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ; 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' [১৯৪৫] গ্রন্থে 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' ও 'রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধদ্বয়; 'বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল' [১৩৮৪] গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ,' 'রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ' - প্রবন্ধদুটি; 'নানারকম' গ্রন্থে [১৯৫৮] 'ভারতাস্থা রবীন্দ্রনাথ,' 'কাবুলিওয়ালা,' 'কবিশ্রাণ,' 'রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রসঙ্গ,' 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী,' 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ,' 'মুক্তধারা,' 'শান্তিনিকেতন,' 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি প্রবন্ধ; 'বিচিত্র উপল' [১৯৫২] গ্রন্থে 'কবির পদ্মা' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনা; কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচনা নয়।

রবীন্দ্র ভাবাদর্শের প্রসার ও স্বরূপ নির্ধারণই এদের মূল উদ্দেশ্য। তবে রবীন্দ্রভক্ত প্রমথনাথের এই সব রচনার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সমালোচক প্রমথনাথের যথার্থ স্বরূপটি সম্যকভাবে উপলব্ধ হতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা :

'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থটি ১৩৩৯ খৃঃ প্রকাশিত হলেও এটি রচনার সূত্রপাত হয় ১৯২৫-২৬ খৃঃ। এর কয়েকটি প্রবন্ধ 'সবুজপত্র' [১৩৩৪] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের সময় প্রমথ চৌধুরীর লিখিত ভূমিকা ছিল। পরে সেই ভূমিকা পরিত্যক্ত হয়েছে কেন জানা যায় না।

প্রমথনাথ যখন এই গ্রন্থটি রচনা করেন তখন রবীন্দ্র সমালোচনার নিতান্ত শৈশবাবস্থা। রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশ বিশেষ অবলম্বনে কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয়েছে। যেমন - রবীন্দ্রনাথ [১৩১৯] - অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী [১৩২০] - বিনয় কুমার সরকার, গীতাঞ্জলি সমালোচনা [১৩২১] - উপেন্দ্র কুমার কর, রবীন্দ্রপ্রতিভা [১৩২১] - একরামদীন, রবিয়ানা [১৩২৩] - অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি। তখন রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভা ও কাব্য গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রচেষ্টা ছিল সুদূরপর্যন্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের অভিব্যক্তি' [১৯০৬] প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যকে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে ও স্ববিরোধী বলে এবং 'কাব্যে নীতি' [১৯০৯] প্রবন্ধে চিত্রাঙ্গদা কাব্যকে অশ্লীল ও দুর্নীতিপূর্ণ বলে অভিযোগ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ দুটির প্রতিবাদে এবং রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে রচিত হয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'কাব্যে সমালোচনা' ; প্রিয়নাথ সেনের 'চিত্রাঙ্গদা' [১৯০৯] ; ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' [১৯০৯] এবং প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে চাবুক' [১৯১৩]।

এই সময়ে নারায়ণ, কল্লোল, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় অনেকেই রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু অচিরেই তা স্তিমিত হয়ে আসে। রবীন্দ্র পক্ষেও তখন অনেক পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইভাবে রবীন্দ্র সমালোচনা গতি, ব্যাপ্তি ও পরিণতি লাভ করতে থাকে।

একই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কলম ধরেন অজিত কুমার চক্রবর্তী কতকগুলি প্রবন্ধে এবং 'রবীন্দ্রনাথ' [১৯১২] নামক গ্রন্থে। রসগ্রাহী সমালোচক অজিতকুমার রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে অন্তর্মুখী কবি-মানস আবিষ্কারে যত্নবান হয়েছিলেন। কবির নিগূঢ় ভাবজীবনের পরিচয় উদ্ঘাটনই কাব্যালোচনার মূলকথা বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এই কবি মানস বিচারে তিনি জীবন দেবতা তত্ত্বকে কবি প্রতিভার কেন্দ্রবিন্দুরূপে স্থাপন করেন। অজিতকুমার রবীন্দ্রকাব্যকে সৌন্দর্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার ভাবজীবনের সন্ধানেও ব্রতী ছিলেন তিনি। তবে বিশ্লেষণ প্রবণতা এবং

ভাবোচ্ছ্বাস ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধদেব বসু 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে অজিত কুমার চক্রবর্তী অনুসৃত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনধারার সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীজাত সমালোচনার প্রশংসা করেছেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রচিত 'কাব্য পরিক্রমা' [১৩২২] প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থগুলির পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ত বিচার বিশ্লেষণ নাই, তাঁর প্রতিভার সূত্রগুলি নিরূপণের চেষ্টা আছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কিত প্রবন্ধের সমষ্টি এটি।

প্রমথনাথের 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহে' রবীন্দ্রনাথের সঙ্ক্যাসঙ্গীত থেকে বলাকা পর্যন্ত কাব্য গ্রন্থগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তবে এর মধ্যে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির আলোচনা ছিল না। সঙ্ক্যাসঙ্গীতের পূর্ববর্তী রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অপরিণত রচনা বলে দূরে সরাতে চাইলেও রবীন্দ্রপ্রতিভার উৎস-পরিচায়করূপে তাদের মূল্য অনস্বীকার্য। তাই প্রমথনাথ 'রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর' গ্রন্থে বনফুল, কবি কাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও শৈশব সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে গীতাঞ্জলি পর্বের তিনটি কাব্যসহ বলাকা পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যগুলির সমালোচনা লিপিবদ্ধ হয় 'রবীন্দ্র সরণী' গ্রন্থে। লেখকের ভাষায় 'কাব্যপ্রবাহ ও রবীন্দ্র সরণীকে একই ধারার সমগ্ররূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, পূর্বখন্ড আর উত্তর খন্ড, এই রকম আর কি। বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যকে সমগ্ররূপে ধারণ করা সহজ সাধ্য নয়, রবীন্দ্র সরণীতে সে চেষ্টা করেছি। পেরেছি কিনা জানিনা। কাব্যপ্রবাহ লিখবার সময়ে পদে পদে উপাদানের অভাব অনুভব করেছি, রবীন্দ্র সরণী লিখবার সময়ে সে অভাব আর ছিল না, বরঞ্চ উন্টোরকমের বিপত্তির কারণ ঘটতে পারতো উপাদানের প্রাচুর্যে। . . . কাব্যপ্রবাহ যখন লিখতে বসি তখন এসব কিছুই ছিল না। কাজটা কত কঠিন ছিল সহজেই অনুমেয়, এমন কি নির্ভরযোগ্য একখানা গ্রন্থপঞ্জী পর্যন্ত ছিল না, প্রতিপদে অঙ্কের মতো হাতড়িয়ে পথ চলতে হয়েছে। তথ্যের অভাবে যেমন হওয়া সম্ভবতাই-ই হয়েছে। কাব্যপ্রবাহ একান্তভাবে subjective - হয়েছে, তুলনায় রবীন্দ্র সরণী অনেক পরিমাণে objective.'^{২৮৬}

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে কাব্যপ্রবাহে সমালোচনার ধাঁচটি ভাবমুখ্য, আর রবীন্দ্র সরণীতে তা বস্তুমুখ্য। 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের রচনা সরস। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্বের গ্রন্থগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে লেখক জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিয়েছেন। ফলে তাঁর বস্তুব্য অনেক তথ্যপূর্ণ ও বিচার-নির্ভর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার পরিবেশ সৃজনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারীলালের প্রভাব ছিল। তবে রবীন্দ্রকাব্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বৈষ্ণব

কবিগণ, শেলি ও কালিদাস। রবীন্দ্রকাব্যে জাতীয়তাবোধ থাকলেও বিশ্বজনীনতা ও মানবমুখীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। এছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির ভূমিকাও কম নয়। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান মিলে গঠিত যুক্তবেনী রবীন্দ্রকাব্যের তিন জগৎ সৃষ্টির মৌল উপকরণ। কবি কাহিনী, শৈশবসঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে লেখক রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ কবি প্রতিভার বীজ লক্ষ্য করেছেন এবং সেইভাবে তাদের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রন্থটি যুগপৎ পাঠকের আনন্দরস পিপাসা নিবৃত্তিতে ও চিন্তা উদ্বোধনে বিশেষ সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সহজাত ও মৌলিক প্রতিভা কতখানি যুগসচেতন ও যুগাতিসারী ছিল, কত তার ঐশ্বর্য ও দীপ্তি—প্রমথনাথ এই গ্রন্থে তা সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রমথনাথ নিজে সুকবি। তাই রবীন্দ্র কবি-মানসের রহস্য উন্মোচন করা তাঁর পক্ষে আয়াসসাধ্য হলেও অসাধ্য হয় নি। বিভিন্ন ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষায় তিনি রবীন্দ্রকবি প্রতিভার গভীর রহস্যের যবনিকা উন্মোচনে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে রবীন্দ্র-প্রতিভা-সাগর অপরিমেয়। কোন সমালোচক-ডুবুরির পক্ষেই তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা বলা অসম্ভব।

সমালোচনাও যে কতখানি সৃজনধর্মী ও মৌলিকতার স্বাক্ষরবাহী হতে পারে তার বহু উদাহরণ এই গ্রন্থে সুলভ। যেমন মাইকেলের আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর বাংলা কাব্যের মুক্তিদূত। তাকে রবীন্দ্রনাথ নবতর মূর্তি ও মাত্রাদান করেছেন। এই বক্তব্যটি প্রমথনাথ অপূর্ব কাব্যকুশলতায় প্রকাশ করেছেন - 'রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর কখনও নাটকোচিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে লিরিকধর্মাক্রান্ত। সে চলিতে গিয়া নাচিয়া ওঠে, বলিতে গিয়া গাহিয়া ওঠে, তাহার অমিত্রাক্ষরের অভিসারিকা পায়ের নূপুর খুলিতে ভুলিয়া যায় বলিয়াই অঙ্ককারেও সে শ্রুতিগম্য হইয়া ওঠে'। ২৮৭

ছন্দের বহিরবয়বের কোন আক্ষিক পরিচয় বিবৃত না হলেও তার আক্ষিক পরিচয়টি যে এখানে সার্থকভাবে দো্যোতিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রমথনাথ রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার তিনটি মূল সূত্র অবলম্বন করে আলোচনা শুরু করেছেন। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম মানবমুখিতা। দ্বিতীয়তঃ এই মানবমুখিতা কিছুটা অপূর্ণ। কারণ 'ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই। বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নাই'। ২৮৮ তৃতীয়তঃ, 'রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানব সত্তাকে জানিয়াছেন। প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যে তিনি মানবপ্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন'। ২৮৯

২৮৭। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ - ষষ্ঠ সং - পৃঃ ৩০৪।

২৮৮। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ - (পূর্ণাঙ্গ সং) ১৩৭৩, পৃঃ

২৮৯। তদেব, পৃঃ

যে পরিকল্পনা ও পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ রচিত সে সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন - 'রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি, কাজেই তাঁহার সম্পূর্ণ মনকে বুদ্ধিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য রচনা মিলাইয়া পড়া দরকার, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর পরিপূরক' । ২৯০

গীতাঞ্জলি সম্পর্কে কোন আলোচনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হওয়ার যে কারণ লেখক পেশ করেছেন তা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না । লেখক পরে নিজেই সে সম্পর্কে উপলব্ধি করে 'রবীন্দ্র সরণী' গ্রন্থে গীতাঞ্জলি পর্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ।

সঙ্ক্যাসঙ্গীত থেকে বলাকা পর্যন্ত কাব্যধারা লেখক চারটি পর্বে বিভক্ত করেছেন (১) সঙ্ক্যাসঙ্গীত পর্ব (২) সোনার তরী পর্ব (৩) খেয়া পর্ব (৪) বলাকা পর্ব । এছাড়া কয়েকটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে তিনি আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ও শেলী, কীটস, কালিদাস' ; 'রবীন্দ্রকাব্যে দ্বিধা : তথ্য ও সত্য' ; 'রবীন্দ্রকাব্যে সমন্বয় : প্রকৃতি ও লীলারস' ; 'রবীন্দ্রকাব্যে দোষ : অতিকথন ও সামান্য কথন' । পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে ঐ গুলির সঙ্গে যুক্ত হয় 'রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক', 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'শৈশবসঙ্গীত' ।

প্রমথনাথের রসানুভূতি রবীন্দ্রকবি-প্রতিভাকে যে ভাবে সূত্রায়িত করেছে তা কিছুটা ভাবধর্মী হলেও অতীব সঙ্গত, হৃদয় ও আকর্ষণীয় । যেমন 'সঙ্ক্যাসঙ্গীত ও প্রভাত সঙ্গীতে সুরের পঞ্চলাভ ঘটিল । কিন্তু পরবর্তী ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্রের উপরেই কবির অধিক ঝোঁক । মানসীতে চিত্র ও গীত উভয় পছন্দ কবি অনুসরণ করিয়াছেন । এই পর্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার যুগ, নানাভাবে নানা বাহনে নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা । সোনার তরীতে কবি স্পষ্টভাবে বুদ্ধিতে পারিলেন তাঁহার স্বাভাবিক বাহন সঙ্গীত ; চিত্র আনুষঙ্গিক । . . . একবার যেমনি তিনি বাহন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, অমনি সুরের পক্ষীরাজে তাঁহার ভাবের সপ্তলোক যাত্রা আরম্ভ হইল, সোনার তরী হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত' । ২৯১

অবশ্য ইতঃপূর্বে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় [১৯০৩] । রবীন্দ্রকবিতায় চিত্ররীতি ও সঙ্গীত রীতির আভাস প্রথম মেলে এই গ্রন্থের ভূমিকায় । রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব ও প্রকৃতিচেতনার আলোচনা শুরু হয় এই ভূমিকা থেকে । তবে প্রমথনাথের বক্তব্য আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমথনাথ অতিরিক্ত তত্ত্বানুসন্ধানী । যেমন - 'প্রভাতসঙ্গীতের প্রধান কবিতা - নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও প্রতিধ্বনি । এ দুটির মধ্যে বীজরূপে রবীন্দ্রকাব্যের

তত্ত্ব নিহিত। নির্ব্বরের গতিময় বিশ্ব আর প্রতিধ্বনির ছায়াময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্ব - এ দুইয়ে মিলিয়া রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ণতত্ত্ব। এই দুটির মিশ্রনেই বলাকার চঞ্চলা ও বলাকা কবিতার উদ্ভব; বলাকার, ফাঙ্কুনীর গতিতত্ত্বের সৃষ্টি'। ২৯২ এইসব কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিচারের বড় বড় ছাঁদ বানিয়েছিস। যেন তোর আত্মবচনই আপ্তবচন'। ২৯৩

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমথনাথের উপলব্ধি বড় গভীর, বিশ্লেষণ বিশেষ নিপুণ ও প্রকাশভঙ্গী খুবই সুচারু। যেমন - 'মানসী বস্তুরস হইতে বস্তুরস্বরূপে, কায়াময় সত্য হইতে ছায়াময় সত্যো, কালিদাসীয় মানস হইতে সুরদাসীয় মানসে অর্থাৎ চিত্ররীতি হইতে সঙ্গীত রীতিতে সংক্রমণের কাব্য'। ২৯৪ ভাবগর্ভ, অর্থঘন, সংহত ও সংযম সমুজ্জ্বল বাক্যও কম নয়। যেমন - 'ক্ষণিকা পলায়নপর বর্তমান মুহূর্তের কাব্য'। ২৯৫ কিংবা 'উৎসর্গ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কাব্য'। ২৯৬ বা 'কবি তো সর্বদাই আত্মব্যখ্যা করিয়া থাকেন, কালিদাস ও মল্লিনাথ জরাসন্ধের মত নিত্য সংযুক্ত'। ২৯৭

রবীন্দ্র সমালোচক প্রমথনাথের কৃতিত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে সমসাময়িক একজন সাহিত্যিক বলেছেন - 'অন্যান্য সমালোচকদের মতো তিনি বক্তব্যকে দুরূহ, কোটেশন সর্বস্ব বা অস্পষ্ট করে তোলেন না। তাঁর চিন্তাও স্বচ্ছ, রচনাইশৈলীও তাই। তাছাড়া তিনি নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেছেন - কবিকে তাঁর পরিবেশ, মানসিক আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। হয়তো একথা বলাও খুব ধুষ্টতা হবে না, রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু - নূতন আলোকপাতও করেছেন'। ২৯৮ প্রতিটি রচনাতেই রবীন্দ্রমানসিকতার স্বরূপ ও সামগ্রিক সত্তাটি নিজের উপলব্ধির আলোকে উজ্জ্বল করে পাঠককে উপহার দিয়েছেন প্রমথনাথ। তিনি শুধু সমালোচক নন, কবি-সমালোচক; আবার সেই সঙ্গে সাধক-সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্ররচনাকে তিনি চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে দেখেছেন। তাঁর সেই অন্তর্দৃষ্টি সঞ্জাত ও গভীর উপলব্ধিজাত সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। তাঁর সমালোচনা বস্তুপ্রধান নয়, ভাব প্রধান; তথ্যসর্বস্ব নয়, ব্যক্তিত্বসুরভিত। 'রবীন্দ্র সরণী' গ্রন্থটি বস্তু-মুখ্য বলে

২৯২। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ - পূর্ণাঙ্গ সং ১৩৭৩, পৃঃ ৩৪।

২৯৩। শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ - ১৮ সংখ্যক পত্র - পৃঃ ৩৩।

২৯৪। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ - পূর্ণাঙ্গ, সং ১৩৭৩, পৃঃ ৪৭।

২৯৫। তদেব, পৃঃ ১৩৭।

২৯৬। তদেব, পৃঃ ১৯৬।

২৯৭। তদেব, পৃঃ ২৮৭।

২৯৮। দেশ-সাহিত্য সংখ্যা। বড় বিশ্বায় লাগে - গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পৃঃ ২০০।

দাবী করলেও আসলে সেখানে বস্তুর সঙ্গে ভাবের, চিন্তার সঙ্গে অনুভূতির এক অদ্বয় ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে তা নীরস বস্তুকে অতিক্রম করে সরস ও শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ গ্রন্থের চেয়ে রবীন্দ্র সরণীতে আরো বেশি বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনায় সচেতন হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কবি-মানসিকতা ও সৃজনশীল কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টি তাকে বস্তুজগতকে ভাবলোকে ও রসলোকে উত্তীর্ণ হতে প্রণোদিত করেছে। অন্য সমস্ত রবীন্দ্র সমালোচকদের থেকে এখানেই তাঁর পার্থক্য। 'একাডেমিক সমালোচনা বাঁধা পথে চলে বলেই অনেক সময় অভিনব বস্তুকে খুঁজে পায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যে সীমার মাঝে অসীমের মিলন সাধনের পালার কথা অনেকেই বলেছেন। এই যুক্তবেণী কখন যে মুক্তবেণী হয়ে উঠাও হয়ে গেছে সে কথা প্রমথনাথ বিশীর লেখাতেই ঝিকিয়ে ওঠে। যে গভীর গূঢ় বিশ্বাসে রবীন্দ্রসাহিত্য অগ্রসর হচ্ছিল তা যে শেষ পর্যন্ত এক ট্রাজিক বেদনায় মুর্ছিত হয়ে পড়ল প্রমথনাথ বিশী তা আবিষ্কার করেছিলেন'। ২৯৯

প্রমথনাথের সমালোচনা-প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য - 'তোমার এই বইয়ের একটা মন্তব্য এই দেখলুম নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা এতে নেই। কিন্তু আমার হাসি পায় যখন দেখি সাদা কথায় ভালো লাগল বা লাগল না বলে বিচারের বড় বড় ছাঁদ বানিয়েছিস। যেন তোমার আশ্ববচনই আপ্তবচন। এর কোন উপায় নেই। আর যাইহোক বইয়ের ভাষাটা ভালো। সুতরাং এটা সাহিত্য শ্রেণীতে গণ্য। অর্থাৎ এর মূল্য কোন চরম তত্ত্ব নিয়ে নয়, নিজেরই স্বরূপ নিয়ে, শিক্ষালাভের জন্য না পড়লেও চলে, আনন্দ লাভের জন্য পড়া যায়। মাঝে মাঝে তোমার ইস্কুল মাস্টারি দেখে হেসেছি, কিন্তু মোটের উপরে খুশি হয়েছি। বলেছি সাবাস! এতে আমার পরিচয় হয়তো আছে, কিন্তু তোমার নিজের পরিচয়ও আছে'। ৩০০

'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থ সম্পর্কিত ভালোমন্দ মেশানো উক্ত মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান এবং রবীন্দ্রসমালোচক প্রমথনাথের যথার্থ পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় মানুষ হলেও প্রমথনাথ অঙ্কস্তাবক হননি। প্রয়োজনে তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার প্রতিও খোলাখুলি ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'রবীন্দ্রকাব্যের দোষ : অতিকথন ও সামান্যকথন' তারই উদাহরণ। অবশ্য তিনি কখনই অকারণ ছিদ্রাধেবীর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। এই গ্রন্থে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা বাক্য না থাকাতাই

২৯৯। কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২, পৃ: ১০৭৫, প্রমথনাথ বিশী : চিত্র চরিত্র -

বিজিতকুমার দত্ত।

৩০০। শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ - ১৮ সংখ্যক পত্র, পৃ: ৩৩।

যথার্থ সমালোচনা হয়ে উঠেছে এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে তা 'মস্তগুণ' রূপে প্রশংসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'রবীন্দ্রসাহিত্যের এতবড় বোঝা হয়েও স্তাবক হয়নি, ভক্ত হয়ে অনুকারক হয়নি - এবং ক্রিটিক বলে অহেতুক ছিদ্রাঘেবী হয়নি'।^{৩০১}

কিন্তু প্রমথনাথের দুর্বলতা এই যে তিনি সর্বদা একটা তত্ত্বকথাকে খাঁড়া করে তাঁর সাহিত্য বিচার পরিচালনা করেন। মুক্ত, মহৎ, নবনবোন্মেষ শালিনী - প্রতিভাকে এই ভাবে তত্ত্বের ছাঁচে সীমাবদ্ধ করতে যাওয়া কিছুটা বিপত্তিকর। বহুক্ষেত্রে তিনি ভাষ্যের চেয়ে সূত্রের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; বিশেষের মধ্যে একটি নির্বিশেষ সাধারণ সত্যের আবিষ্কারে যত্নবান হয়েছেন। এই পদ্ধতির কিছুটা সুবিধাও আছে। সাধারণ সত্যকে মছন দন্ডরূপে ব্যবহার করায় নানা বিরূপ মতামত ও বিষয়বস্তুকে মথিত করে আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের পথ পরিক্রমা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। একটি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, নির্দিষ্ট, সাধারণ তত্ত্বকে অনুসরণ ও আবর্তন করার ফলে আলোচনা দানা বেঁধে উঠতে পারে এবং তার মধ্যে শিথিলতা বা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর অবতারণা এড়ানো সম্ভবপর হয়। প্রমথনাথ চৌধুরীর মত প্রমথনাথ বিশী বিশ্বাস করেন যে সাহিত্য বা সমালোচনার উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া নয়, আনন্দ উদ্বোধনে সাহায্য করা। প্রমথনাথের রবীন্দ্রসমালোচনা গ্রন্থগুলি শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে আসে না, কিন্তু পাঠকের ঔৎসুক্য ও আগ্রহের দীপশিখাটিকে উসকে দিয়ে পরোক্ষে সাহিত্য সচেতনতা, রচনা ও রচয়িতার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে। এই কারণেই 'শিক্ষালাভের জন্য না পড়লেও চলে। আনন্দলাভের জন্য পড়া যায়'।^{৩০২}

প্রমথনাথ যখন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন তখন লেখকের সৃজনশীল কল্পনাকুশলতা ও অনুভূতি গভীরতার গুণে তা স্বতন্ত্র, মৌলিক ও সাহিত্য পদবাচ্য এককথায় নবতর সৃষ্টি হয়ে ওঠে। তাই 'কাব্যপ্রবাহ' গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শ্রেণীতে গণ্য করেছেন এবং সমালোচকের নিজস্ব পরিচয়কে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রমথনাথের সমালোচক সত্তার উক্ত পরিচয়টি তাঁর প্রায় সকল সমালোচনা গ্রন্থেরই মূল কথা।

প্রমথনাথের 'রবীন্দ্র সরণী' গ্রন্থটি পরিণততর। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির এক একটির মর্মার্থদ্যোতক এক একটি চরণ নামকরণ হিসাবে ব্যবহার করে তার

৩০১। কথাসাহিত্য - শ্রাবণ, ১৩৭৩ - বিশীকে যেমনটি দেখেছিলাম - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, - পৃঃ ১৩৫০।

৩০২। শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ - ১৮ সংখ্যক পত্র। পৃঃ ৩৩।

বিচার বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা চলেছে। বিশ্লেষণ যেমন সূক্ষ্ম, ভাবনা যেমন গভীর, ভাষা তেমনি কাব্যিক। যেমন - 'রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যখানি একান্তভাবে নিঃসঙ্গ, ইহার কোন দোসর নাই। এমন নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধারণতঃ দু'তিনটিতে মিলিয়া অল্প সময়ের ব্যবধানে ঝাঁক বাঁধিয়া আসে - তাহারা এক জাতের পাখী, এক নীড়ের অধিবাসী, এক লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু খেয়া কাব্যের বেলায় দেখি সে নিয়মের ব্যতিক্রম। তাহার সঙ্গী নাই, তাহার আশে পাশে আগে পিছে বৎসর কয়েকের ব্যবধানেও খুব উল্লেখযোগ্য কাব্য নাই'।^{৩০৩} কিংবা - 'নিঃসঙ্গ খেয়া কাব্যের দোসর নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাহার তুলনা আছে। বাংলাদেশের জনমানবহীন বৃক্ষবনস্পতিহীন বিশাল, প্রান্তরের প্রান্তে নদীতীরবর্তী খেয়াঘাটের নিঃসঙ্গছায়াবটের রাজকীয় মহিমা খেয়াকাব্যের যথার্থ তুলনা। . . . সন্ধ্যার ঘনায়মান আকাশের পটে যতই পৌঁচের পর পৌঁচ কালি বুলাইয়া দিতে থাকে, পরিচিত ছায়াবট ততই রহস্যময় হইয়া ওঠে, অবশেষে একসময়ে অন্ধকারের পটে তারাগুলি যখন পূর্ণ দীপ্যমান হইয়া ওঠে আমাদের পরিচিত ছায়াবট তখন দেখা না দেখার প্রান্তে, থাকা না থাকার প্রান্তে এক রহস্যভয়াল মূর্তি গ্রহণ করে; তাহা আকাশের কি পৃথিবীর মন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না, তাহার পরিচিত সত্তার মধ্যে কোথা হইতে যেন অপরিচয়ের প্রক্ষেপ ঘটিয়া দৈবী সত্তার আবির্ভাব ঘটে। ছায়াবট অবশ্যই খেয়াকাব্যের তুলনা, কিন্তু তাহা অন্ধকার নিশীথের ছায়াবট'।^{৩০৪}

সমালোচক মূলতঃ কবি বলেই এখানে বিষয়বস্তুকে অর্থময় করে তুলতে উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা রীতির প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেও সমালোচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কবিকল্পনা ও উপমা বা রূপক অলঙ্কারের আশ্রয় নিতেন। এই গ্রন্থের শেষদিকে লেখক রবীন্দ্রপ্রতিভার রহস্যময় জটিলতা সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে মন্তব্য করেছেন - 'এসব গভীর ও গূহানিহিত প্রশ্নের উত্তরদানের সাধ্য আমার নাই। তাই প্রাসঙ্গিক সংশয় জাগাইয়া দিয়া এই আলোচনার শেষ করিলাম'।^{৩০৫} এই মন্তব্যে সমালোচক প্রমথনাথের মৌল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত আলোচনার পথে না গিয়ে মূল রহস্যের দিকে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করেন এবং পাঠকের অন্ধকার মনে চকিতে আলোক ছেলে দিয়ে বিদায় নেন। এইভাবেই প্রমথনাথ প্রকৃত সমালোচকের ধর্ম পালন করেন।

৩০৩। রবীন্দ্র সরণী - প্রমথনাথ বিশী - দ্বিতীয়মুদ্রণ, পৃঃ ১৩৮।

৩০৪। তদেব, পৃঃ ১৩৯।

৩০৫। রবীন্দ্র সরণী - প্রমথনাথ বিশী - দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ৪১০।

প্রমথনাথ নিজে কবি বলে সমালোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে এমন সব যা হলে হতে পারতো কল্পনা করেছেন যেগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয়। যেমন - 'মনে কৌতূহল জাগে, যদি এই বালকটি ওয়ার্ডসওয়ার্থন-এর মতো প্রকৃতির অবাধ আসরের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিত তবে তাহার কাব্য কিরূপ পরিগ্রহ করিত '৭ ৩০৬

সমালোচক হিসাবে প্রমথনাথ বিশ্লেষণপন্থী নন, উন্মীলনপন্থী। তিনি খন্ড, ক্ষুদ্র, রূপের পরিবর্তে অখন্ড ও পূর্ণাঙ্গভাব-সৌন্দর্য আবিষ্কারে সমুৎসুক। প্রমথনাথের সাহিত্য সাধনার মূলকথা পূর্ণতার সাধনা। আশৈশব শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোপাসনার সময় থেকেই অবচেতনে প্রমথনাথ পূর্ণতার ভক্ত। 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসে তাঁর এই জীবন দর্শনের পরিণতি লক্ষ্যগোচর হয়। এছাড়া তার অকপট ভারতবোধও এই পূর্ণতাবোধের পরিপোষক, রবীন্দ্রনাথের ভারত চেতনা ও বিশ্বচেতনা এই ব্যাপারে প্রমথমানসে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখার মতোই তার সমালোচনার মধ্যেও অখন্ডতা ও পূর্ণতার উদ্ভাস লক্ষ্যগোচর হয়। দৃষ্টির এই সমগ্রতা আসে চিন্তার গভীরতা থেকে। তাই রবীন্দ্রকাব্যনির্ব্বর ধীরে ধীরে রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহে মিশে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণীতে পরিণতিলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্রোতধারাকে এইভাবে উৎস থেকে পরিণতি পর্যন্ত একটি অখন্ডরূপে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য শতদলটির ক্রমবিকাশ ললিত মধুর ভাষায় পরিস্ফুট করা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রমথনাথ সেই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। সমালোচনার বিষয়বস্তু থেকে রস আহরণ করে তাঁর সংবেদনশীল কবি মন নব সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। বালেন্দ্র নাথ ঠাকুরের গদ্যরচনাকে প্রমথনাথ একত্র সমালোচনার শিল্প নামে আখ্যাত করেছেন। প্রমথনাথের সাহিত্য সমালোচনাকে তেমনি সমালোচনার শিল্প বলাই যুক্তযুক্ত।

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনাকালে তিনি সর্বদাই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মূল লেখা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেন - এতে আলোচনা হয়ে ওঠে প্রামাণ্য ও মূলানুগ। আর কবির কলমে লেখা বলে তাঁর গদ্য ভাষা হয়েছে রসসিক্ত, অলঙ্কারখচিত ও কল্পনা ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ও স্নেহধন্য শিষ্য প্রমথনাথ গুরুত্বপূর্ণ শোধ করেছেন তাঁর সমালোচনা গ্রন্থে। অবশ্য সেজন্য তাঁকে অকারণ প্রশংসার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাতে হয়নি বা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা গোপন করার হীন প্রয়াস চালাতে হয়নি। বলিষ্ঠ সমালোচকের মতোই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত ভূমিকা পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছাত্র,

ভক্ত বা সুহৃদ বর্গের মধ্যে আর কেউ এত সার্থকতার সঙ্গে এমন গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন নি।

বাংলা সমালোচনার বিশাল প্রান্তরে ভাব ও যুক্তি, অনুভূতি ও বিচারবোধের যুগল ঘোড়ার রথে চেপে মহারথী প্রমথনাথের জয়যাত্রা সকলের সমীহ আদায় করে। সমালোচকের ভাষায় - "তঁাহার যুক্তি তাহার ভাবের বাহন"। ভাব ও যুক্তির এই সমন্বয়ের ফল দেখি তঁাহার উক্তিগুলির এক অপূর্ব সুকৃতি। যেমন - 'একরাত্রি একটি অপূর্ব সৃষ্টি, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি সুগীত সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হইতেছে'। . . . 'চিত্রাঙ্গদা কাব্য রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা', 'সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য অসীমের অনির্দিষ্ট আকাশে সীমার মানচিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস'। . . . 'দ্বিজেন্দ্রনাথ যেন গ্রহান্তরের উদ্ভাষক, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে নিত্য প্রক্ষিপ্ত'। এই উক্তিগুলি যেন হীরকখন্ডের ন্যায় জ্বল জ্বল করিতেছে। ইহার যে কোন একটি ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব। অনুভূতি যখন এক গভীর সত্যের কোঠায় যাইয়া পৌঁছায় তখন তাহা এমন দীপ্ত ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই ভাষা আবার কখনো কখনো মনে রাখার মতো সূত্রের আকার ধারণ করে'।^{৩০৭}

'তত্ত্বের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যকে গ্রথিত করিতে যাইয়া প্রমথনাথ যেভাবে তঁাহার সমস্ত কর্ম-চিন্তা-ভাব-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাকে ঠিক ইংরাজী Biographical criticism — এর অনুকরণ বলিতে পারি না। Herbert Read — এর The Lost Reader - - - গ্রন্থে Wordsworth এর জীবনকথা অতিসুন্দরভাবে ফুটিয়াছে, কিন্তু কাব্য ও জীবন এক অখন্ড বস্তু হইয়া উঠে নাই। Chamber - এর Coleridge - সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অর্থাৎ সেখানে Criticism - - এর চেয়ে Biography - র পরিমাণ বেশি। 'রবীন্দ্র সরণী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও চিন্তার মধ্য দিয়া যেন তঁাহার কাব্যের অর্থ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, চিন্তা, কর্ম যে এক অখন্ড উপলব্ধির প্রকাশ তাহা এই প্রথম এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে দেখানো হইল'।^{৩০৮} এই বিশ্লেষণী শক্তির উদাহরণ মেলে প্রমথনাথের গ্রন্থে - 'গীতাখ্য কাব্যত্রয়কে একটি দ্বীপ বলিয়াছি। . . . ঐ কাব্যত্রয়ের পিছনে যে বিস্তৃত ও অপেক্ষাকৃত দুর্গম Hinterland - বা অনুকূল ভূমি আছে তাহা হইতেছে 'শান্তিনিকেতন' নামে পরিচিত গ্রন্থের উপদেশবাণী। আর দ্বীপকেন্দ্রের উৎস কবির আধ্যাত্মিক প্রেরণা। এখন সহজেই অনুমেয় যে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগ, কোন একটিকে ছাড়িলে অপর

৩০৭। সমালোচক প্রমথনাথ - ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত/ কথাসাহিত্য, আশ্বিন, ১৩৭৩

পৃঃ ১৬৫১।

৩০৮। তদেব, পৃঃ ১৬৫৫।

দুটির সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। আরো অনায়াসবোধ্য যে, উপকূলভাগ যতই মনোরম হোক এই দ্বীপের প্রকৃত রহস্য ঐ উৎসের অভ্যন্তরে। কিন্তু এত সব জানিয়া শুনিয়াও যে লোকে সে চেষ্টায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে নাই তাহার প্রধান কারণ কাজটি কঠিন। শান্তিনিকেতন উপদেশাবলী তত্ত্ব নয় বা কার্যকারণ বিশ্লেষণে গ্রথিত রচনা নয়, তেমন হইলে বোঝা কঠিন হইত না, উপদেশগুলি উপলব্ধির প্রকাশ, অনেকটা উপনিষদের বাণীর ন্যায়। ভাষা যতই সরল ও সরস হোক উহার মর্মে প্রবেশ সহজ নয়। তার পরে ঐ উপলব্ধির মূলে সাধনায় নিযুক্ত যে কবিচিন্তা আছে তাহার রহস্যে প্রবেশ আরো কঠিন। আর এ দুয়ে মিলাইয়া গীতাঞ্জলির গানগুলির মর্মোদ্ধার সময়, শ্রম ও বিশেষজ্ঞতা সাপেক্ষ। কাজেই অধিকাংশ লোকে উপকূলভূমির মনোরমতা দেখিয়াই, গীতাঞ্জলির গানগুলির উপর উপর রসাস্বাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়। আর ইহারই ফলে রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের এই মনোহর দ্বীপটির অধিসন্ধি, রস ও রহস্য অদ্যাবধি প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে'। ৩০৯

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমালোচনার উদ্দেশ্য ও রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে এই প্রথম প্রকৃত বক্তব্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হল প্রমথনাথের গ্রন্থে। প্রমথনাথ তত্ত্বের সাহায্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করলেও তত্ত্ব কোথাও প্রভুত্ব করেনি। বরং তিনি তত্ত্বের পিঠে সওয়ার হয়ে তাকে বশীভূত করে কাজে লাগিয়ে সমালোচনাকে অনেক ঘাতসহ ও প্রামাণ্য করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বদেশী ও বিদেশী সমালোচকের অনুসরণযোগ্য। সমালোচকের ভাষায় - 'বইখানির যদি ইংরাজী অনুবাদ হইত তাহা হইলে বোধ হয় উরোপীয় সমালোচক একটি নূতন পথের সন্ধান পাইতেন। কারণ জীবন, তত্ত্ব ও কাব্যের সম্পর্ক লইয়া ইউরোপীয় সমালোচক বড় গোলে পড়িয়াছেন'। ৩১০ এদিক থেকে বিচার করলে প্রমথনাথের রবীন্দ্র সমালোচনা বাংলা সাহিত্য তথা বৃহত্তর সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নূতন পথের দিশারী।

রবীন্দ্র নাটকের সমালোচনা :

রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তার আগে রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে দু একটি প্রবন্ধ রচিত হলেও তাঁর সমগ্র নাটকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথনাথের রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালে। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য ও ঋতুনাট্য ছিল লেখকের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গ

৩০৯। রবীন্দ্রসঙ্গী - ২য় মুদ্রণ - পৃঃ ১৫২-৫৩।

৩১০। সমালোচক প্রমথনাথ - ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত/ কথাসাহিত্য, আশ্বিন, ১৩৭৩, পৃঃ ১৬৫৫।

ক্রমে 'ঋতুচক্র' ও 'মূল কাহিনীর রূপান্তর' নামে দুটি অধ্যায় সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে [১৩৬০] 'রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় যোগ্যতা' নামক প্রবন্ধটি যুক্ত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খৃঃ। এই খণ্ডে আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য। দ্বিতীয় সংস্করণে [১৯৫৮ খৃঃ] তত্ত্বনাট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিও আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ সংস্করণে ১৯৬৬ খৃঃ পূর্বতন দুই খণ্ডের অধ্যায়গুলো পূর্ণবিন্যাস্ত হয়েছে এবং তিনটিনতুন অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে - রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাকুরদা ও কবি, রবীন্দ্রনাথের নাটকে জনতা এবং বাঁশরী সরকার।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাই তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই নাটকেও সেই কাব্যধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্র প্রতিভা বৈচিত্র্য পিয়াসী। তাই চিরাচরিত মতের দাসত্ব করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কাব্যের অঙ্গনে নাটকের বা নাটকের চৌহদ্দীতে কাব্যের প্রবেশাধিকার নেই একথা তিনি মানতে নারাজ। বরং উভয়ের সংমিশ্রণে যে কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য সৃষ্টি করা যায় তার রসবৈচিত্র্য ও শিল্পোৎকর্ষ অনেকক্ষেত্রে অসাধারণ মহিমা লাভ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলিকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে প্রয়াসী হয়েছেন প্রমথনাথ। তবে প্রমথনাথ যেগুলিকে কাব্যনাট্য আখ্যায় ভূষিত করেছেন সেগুলির অনুরূপ সংজ্ঞার কারণ বিস্মিষ্ট হয়নি। গান্ধারীর আবেদন এবং কর্ণকুন্তী সংবাদ প্রভৃতিকে নাট্যকাব্য বলতে বাধা কোথায় বা গান্ধারীর আবেদন ও মালিনী সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণ কি প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর অনুক্ত রয়ে গেছে।

তবুও আভাসে-ইঙ্গিতে এবং সংক্ষিপ্ত কথায় লেখক কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাতে বোঝা যায় এই কাব্যনাট্যগুলিতে 'নাট্যকারের চেয়ে কবির কলম প্রবলতর, সুপ্রচুর'।^{৩১১} বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নিশ্চিত নাটকীয় পরিণতি অঙ্কনের পরিবর্তে সংযত, সংহত একটি মাত্র ঘটনাকে স্থানুপ্রায় দু চারটি চরিত্রের আবৃত্তি ভিত্তিক কথোপকথনের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের সহজাত। তারই সার্থক ফলশ্রুতি এই কাব্যনাট্যগুলি।

লেখকের মতে 'কাব্যনাট্য কাহিনী ও নাটকের মিশ্ররীতির রচনা। . . . এই মিশ্ররীতির নাট্যকারের দায়িত্ব লঘু অথচ কবির কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ প্রচুর'।^{৩১২} অধিকাংশ পূর্ণাঙ্গ নাটকেই তো কাহিনী থাকে। কাজেই কাহিনী ও নাটকের মিশ্র রীতিই বা কি আর উভয়ের সংমিশ্রণে কাব্যনাট্য আখ্যায় যৌক্তিকতা কি বোঝা দুষ্কর। তবে লেখকের বিশ্লেষণকুশলতা প্রশংসার্হ - এই কাব্যনাট্যগুলির বিষয়বস্তু

ঘটনার সমগ্রতা নয়, ঘটনার এক একটি খণ্ড; পঞ্চাঙ্গ নাটকের ইহা যেন পঞ্চম অঙ্কটি।

'এই কাব্যনাট্যগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কিছুই ঘটিতেছে না, যাহা ঘটিবার তাহা পূর্বেই ঘটিয়াছে। এখন সেইসব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ, এখন কেবল অনুতাপ ও পরিতাপ, আবেদন-নিবেদন ও আত্মসংবেদনের সুযোগ মাত্র আছে'। ৩১০

সমালোচক প্রমথনাথ যে কোন প্রতিভার পূর্ণতা নিরূপণের পক্ষপাতী। তাই তিনি শুধু বিষয়কে বিশ্লেষণ করেন না, বিষয়ীকেও বিচার করেন। আর পূর্ণতা নিরূপণের জন্য সমসাময়িককালে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকেও সাক্ষ্য গ্রহণ করে তৎকালীন লেখক-মানসের স্বরূপ নির্ধারণে যত্নবান হন।

বিসর্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি নাটকগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ একটি স্বতন্ত্রক্ষেত্রে এই আলোচনা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা লেখকের ছিল, কিন্তু তা পূর্ণ হয় নি।

তত্ত্বনাট্য পর্যায় বিভাগটি প্রমথনাথের নিজস্ব। এইরূপ নামাঙ্কনের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন - 'এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে ইহাদের কোন একটি নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি বর্ণনা সম্ভব নয়। ইহাদের কোন কোন নাটক রূপক [আংশিক রূপক], কোন কোন নাটক প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক এবং কোন নাটককে সমস্যামূলক বলা চলে সত্য কিন্তু নাটক বিশেষের প্রকৃতি মাত্র প্রকাশ পায়, সমগ্র পর্যায়ের প্রকৃতি প্রকাশ পায় না। এই অসুবিধার জন্যই সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে এমন একটি সামান্য বা সাধারণ নামের অভাব অনুভব করিতে থাকি। তত্ত্বনাট্য সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস'। ৩১৪

তত্ত্বনাট্য নামটি একদিক থেকে সার্থক। কারণ রূপক ধর্মী বা প্রতীক ধর্মী হোক সবগুলি নাটকের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কোন না কোন তত্ত্বকথাকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। অস্তুনিহিত বক্তব্যই সর্বক্ষেত্রে মুখ্য, ফলে কাহিনী সেই পরিণাম সিদ্ধির উপায় মাত্র। উক্ত গুঢ় বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তা ভঙ্গীতে রসপ্লব ও বিন্যাসে সুশৃঙ্খল। এদিক থেকে তাঁর সমালোচনা বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের ন্যায় নাট্যপ্রবাহে ও প্রমথনাথ কতকগুলি সাধারণসূত্রকে

ভিত্তিক্রমে গ্রহণ করে সমগ্র নাটকগুলির আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যেমন - 'তত্ত্বনাট্য - গুলিতে আলোচিত সমস্যাসমূহকে নিগলিত করিয়া লইলে তিনটি মূল সমস্যায় গিয়া দাঁড়ায়। সে তিনটি বিষয় এই —

- (১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক
- (২) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক
- (৩) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক '। ৩১৫

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত তত্ত্বনাট্যকে প্রমথনাথ উক্ত তিনটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে বিচার বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। এর ফলে একদিকে যেমন নাটকগুলিকে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বা নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে আলোচনায় বিভিন্নমুখী বৈচিত্র্য প্রকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে অবাস্তব অংশবর্জন করে আলোচনাকে সংযত, সংহত সুনিশ্চিত পরিণতিসমৃদ্ধ ও শিল্প সুযমা মণ্ডিত করে তোলা যায়। যেমন - 'মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সভ্যতার সংঘর্ষ বা সভ্যতার সংকট বিষয়ক নাটক। শেষের দুখানা নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও মূলভাবের বাহন হিসাবে বিশেষভাবে বিচার্য। ইহাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। মুক্তধারা ও রক্ত করবী একত্র বিচার্য, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সগোত্র। প্রথম দুখানিতে সভ্যতার সংকটের বিশেষ একটি দিক চিত্রিত, শেষের দুখানিতে সভ্যতার সংকটের সাধারণ চিত্র '। ৩১৬

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপরিচিত ছিলেন, প্রাচ্য সাহিত্যে তো বটেই। তাই তাঁর নাটকে উভয় নাটকের সংমিশ্রণ থাকাই স্বাভাবিক। মূলতঃ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ বা আদর্শবাদ প্রাধান্য পেলেও পাশ্চাত্য নাট্যধারা ও তার শিল্পাদর্শ তিনি সমাদরে গ্রহণ করেছেন তাঁর নাটকে। এই সব কারণে প্রমথনাথ শেক্সপীয়ার, দান্তে, গ্যেটে, কালিদাস প্রভৃতির চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন - 'রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আত্মস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। কাজেই তাহাকে আর বিদেশীয় বলা উচিত নয় '। ৩১৭

প্রমথনাথ সমালোচক হিসাবে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ। তাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যগত ক্রটি নির্দেশেও তিনি অকুণ্ঠিত। রাজানাটক প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য - 'কারুণ্যময় ভাষা, ঠাকুরদার সহজ প্রজ্ঞা, নাগরিকগণের সরস কথোপকথন, রবীন্দ্রসঙ্গীত বলিতে যে

৩১৫। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী, ১৯৬৬, পৃ: ১৫৩।

৩১৬। তদেব, পৃ: ১৫৭।

৩১৭। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী [১৯৬৬] পৃ: ১৭২।

অলৌকিক গীতিকবিতা বোঝায় তাহার প্রচুর প্রয়োগ, ঘটনা বিন্যাসের একপ্রকার দ্রুতি - এই সব উপায়ের দ্বারা কবি যে নাট্যবিষয়টিকে সজীব ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন সন্দেহনাই। কিন্তু নাটকের মূল গৌরব চরিত্র সৃষ্টি। প্রাণবান নরনারীই নাটকের প্রধান সম্পদ। সেই সম্পদে নাটকখানি তেমন সমৃদ্ধ নয়। একমাত্র সুদর্শনা চরিত্র ব্যতীত আর কোন মানবচরিত্র পাঠককে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না বলা যাইতে পারে। ৩১৮

নাট্যসমালোচক প্রমথনাথের উপলব্ধির গভীরতা, সৃজনশীল কল্পনাকুশলতা ও কবিজ্ঞানোচিত প্রজ্ঞার ফলে কিছু কিছু মন্তব্য অসাধারণ গভীরতা ও দ্যোতনা লাভ করেছে। যেমন - 'কবি প্রতিভার অনুভূতির শাখায় যাহা ট্রাজেডি, চিন্তার শাখায় তাহাই প্রহসন। চিন্তা ও অনুভূতির তারতম্যে কমেডি ট্রাজেডি হইয়া ওঠে'। ৩১৯ এইরূপ উদাহরণ গ্রন্থ মধ্যে অবিরল।

রবীন্দ্রনাটকের রূপান্তর ও নামান্তর, ঋতুচক্র, রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাকুরদা ও কবি, রবীন্দ্রনাথের নাটকে জনতা প্রভৃতি পরিচ্ছেদে লেখকের মৌলিক চিন্তাধারা এবং যুক্তির সঙ্গে অনুভূতির মেলবন্ধন জনিত প্রকাশকলা বিশেষভাবে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত। নূতন যুগে নূতন লেখকের হাতে পুরাতন বিষয়ের রূপান্তর ঘটাই স্বাভাবিক। এই রূপান্তরের মধ্যে লেখকধর্মের ও যুগমানসের সূক্ষ্ম পরিচয় নিহিত থাকে। প্রমথনাথ তাঁর তৃতীয় নয়নের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সেই সূক্ষ্মতর কবিধর্মকে আবিষ্কারে যত্নবান হয়েছেন। তাঁর আলোচনাগুলি একদিকে তথ্যপূর্ণ, অন্যদিকে আনন্দদায়ক। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রমানসের রহস্য উন্মোচন-প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাট্যরসের প্রবাহকে লক্ষ্য করে নিরপেক্ষ সমালোচক যেন আপন মনে কথকতা করে চলেছেন। কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষকতার সচেতনতা বা সমালোচকের পাণ্ডিত্য নেই। রসিক সমালোচক রসগ্রাহী পাঠকের হৃদয় তন্ত্রীতে তাই সহজেই আনন্দানুভূতির ঝংকার তোলেন। বহুক্ষেত্রে সমালোচক নিজে রূপস্রষ্টা শিল্পীতে পরিণত হন।

তবে তাঁর সব মন্তব্য উদাহরণের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় বা সূক্ষ্ম যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সমর্থিত নয় বলে সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন - 'আমার আশঙ্কা এই যে দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচি যতই উন্নত হোক, রবীন্দ্রনাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না। এগুলি অত্যন্ত বেশিভাবে এককের সৃষ্টি।

নাটক যৌথ শিল্প, তাহা যদি উগ্রভাবে এককের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার একঘরে হইয়া থাকার আশঙ্কাই প্রবল'।^{৩২০} রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও বলা চলে যে লেখকের আশঙ্কা খুব বেশি সমূলক নয়। কারণ, অনেক সাধারণ রঙ্গক্ষেত্রেই রবীন্দ্র নাটক অতিশয় সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। আর যুগের পরিবর্তনে, রুচির পরিবর্তনে, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়কলা প্রভৃতির বিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা ক্রমশঃ নাট্যরসপিপাসু হয়ে উঠছে এবং রবীন্দ্রনাটকেই তাদের রসপিপাসা অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে চরিতার্থ করছে। বরং রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে বলা যায় যে তিনি সাময়িকতার দাবী মিটানোর মধ্যে আত্মসমর্পণ না করে নিরবধিকাল ও বিপুল পৃথ্বীর দিকে নিবদ্ধলক্ষ্য ছিলেন বলেই যুগান্তরে ও মনান্তরে তাঁর নাটকের আবেদন অম্লান থাকবে।

প্রমথনাথ এই গ্রন্থে লিখেছেন - 'রবীন্দ্রনাট্যনাট্যে তত্ত্বও আছে, চিত্রও আছে। কিন্তু কদাচিৎ দুটি এক ও অচ্ছেদ্যরূপে দেখা দিয়াছে। এইসব রচনায় তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইবার ফলে কখনো তত্ত্ব চোখে পড়ে। কিন্তু কদাচিৎ তত্ত্ব ও চিত্র অচ্ছেদ্য শিল্পরূপে একত্র চোখে পড়ে'।^{৩২১} উদ্ধৃত অংশটিকে উদ্ধৃত করে কোন এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন - 'নাটকগুলি সম্পর্কে এই যে রায় দেওয়া হোল, প্রশ্ন হতে পারে এই রায় কোন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত? লেখক কোন বিচার না করে মনগড়া ধারনার বশবর্তী হয়ে রায় দিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচনায় একেই বলতে পারি কাজীর বিচার'।^{৩২২} সমালোচক এখানে কোন বিচার না করে মনোমত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ এনেছেন প্রমথনাথের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সমালোচনার প্রথমদিকেই তিনি বলেছেন - 'এই নাটকগুলির আলোচনায় লেখক নাটকের তত্ত্বব্যাখ্যা, চরিত্র বিচার, নাটকের পরিবেশ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই করেছেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত নাট্যগত বিচার করেন নি'।^{৩২৩} পরবর্তী মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রমথনাথ তত্ত্ব, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বিচার করেছেন। কাজেই 'কোন বিচার না করে' মন্তব্যটি অযৌক্তিক। এছাড়া প্রকৃত নাট্যগত বিচার বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? শুধু নাটকীয় দৃশ্য ও গতি-প্রকৃতি বিচার করলেই কি নাটকের সমগ্র বিচার নিষ্পন্ন হয়? তাছাড়া প্রমথনাথ তত্ত্বের উজ্জ্বল ছবিটির সঙ্গে জীবনচিত্রের অনুজ্জ্বল রূপটির কথাই

৩২০। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ - (পূর্ণাঙ্গ সং), পৃঃ-৫০৮।

৩২১। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ - (পূর্ণাঙ্গ সং), পৃঃ-৫০৮।

৩২২। রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা - আদিত্য ওহদেদার (প্রথম সং), ১৩৬৬,

পৃঃ ২৬১

৩২৩। তদেব, পৃঃ ২৬০।

উক্ত আলোচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। আদিত্যবাবু যদি যুক্তি দিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে প্রমথবাবুর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতেন তাহলে সেটি সুধী মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করতো। আর তত্ত্বের পাশাপাশি জীবনের ছবিগুলি যে অনেক নিম্প্রভ একথা প্রমথনাথের মনগড়া নয়। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে অনেকগুলি নাটকের আলোচনা এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন - 'রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে একটিও পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য হৃদয়গ্রাহী, সজীব চরিত্র চোখে পড়ে না। . . . প্রকৃতির প্রতিশোধের নরনারী সবাই যেন ছায়াময়, কেহই রক্তমাংসের জীব নহে। শারদোৎসবের লক্ষেশ্বর আংশিক সজীব বটে কিন্তু তাহার শ্রেণীরূপটাই প্রবল। ঐ চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার অসীম সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কবি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অচলায়তনের মহাপঞ্চক সম্পর্কেও ঐ কথা প্রযোজ্য। রাজাতে সুদর্শনার মধ্যে মানবচরিত্রের লক্ষণ অতিশয় প্রবল। ফলে সে মূর্তিমতী বেদনা হইয়াছে। কিন্তু রীতিমত মানুষ হয় নাই। ডাকঘর নাটকে সামাজিক মানুষ হিসাবে কে পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য? ফাল্গুনীতে তো শ্রেণীরূপের ছায়াময় শোভা। . . . ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা সম্ভব হইত, এখানে তাহা হয় নাই বলিয়াই এমন ঘটিয়াছে'। ৩২৪

প্রমথনাথের বিচার বিশ্লেষণের সঙ্গে আদিত্যবাবু একমত না হতে পারেন কিন্তু তাকে মনগড়া ও বিচারহীন সিদ্ধান্ত বা 'কাজীর বিচার' বলাটা অযৌক্তিক ও অশোভন হয়ে পড়ে।

প্রমথনাথের রবীন্দ্র সমালোচনার আরো কিছু দিক :

'রবীন্দ্রবিচিত্রা' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-গবেষক প্রমথ-মানসের বিচিত্র প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু বিখ্যাত কবিতা রবীন্দ্রনাথের হাতে খসড়া অবস্থা থেকে চূড়ান্ত অবস্থায় বা বিভিন্ন সংস্করণে কিরূপ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে বা অনেক সময় দু একটি শব্দের পরিবর্তনে কবিতাটির রসের ও মহিমার কিরূপ স্থায়ী রূপান্তর ঘটেছে তারই অতি সুস্থ ও সংশ্লেষণধর্মী আলোচনা আছে রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর প্রবন্ধটিতে। প্রমথনাথের মতে এর ফলে - 'পাঠক ও সমালোচক সকলেরই কবিতাগুলি তুলনায় পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। রসিক কেবল তুলনায় রসভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন। কিন্তু সমালোচক ইচ্ছা করিলে দুটি রূপে মিলাইয়া কবি চিন্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পারেন, দেখাইতে পারেন। খসড়া কবিতা কিভাবে পূর্ণরূপ গ্রহণ করিয়াছে, কেন তাহার রূপান্তর ঘটিল, একটি হইতে অন্যটিতে সংক্রমণে কবিচিন্তার কি রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এতদিনে তাহা বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত

হইয়াছে। . . . নেপথ্যের পরিচয় শিল্পের চূড়ান্তরূপ না হইতে পারে, কিন্তু সেটা দৃষ্টির মধ্যে থাকিলে চূড়ান্ত পরিচয়টিও পূর্ণতর হইয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস'।

লেখক এই বিশ্বাসের সমর্থনে অতঃপর যে পর্যালোচনা করেছেন তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক, ও চিন্তাকর্ষক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীটসের অনুরূপ প্রয়াসের রসাত্মক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রমথনাথ নিজে কবি বলেই রবীন্দ্র কবি-মানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন ও গুঢ়-গভীর চেতনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে 'সানাই' কাব্যের 'কর্ণধার' কবিতাটির পাঠান্তর বিশ্লেষণ করে লেখক যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা উল্লেখ্য - 'কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ! ব্যক্তি বিশেষে যাহার সূত্রপাত, নির্বিশেষে তাহার উপসংহার; তুচ্ছতায় আরম্ভ, মহাদ্যোতনায় শেষ; বিশেষ হইতে বিগত বিশেষে প্রগতি। ঝরণার মহানদীপ্রাপ্তি এবং অবশেষে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন'।^{৩২৫} রবীন্দ্রকবিতার পাঠান্তর অবলম্বনে এইভাবে রবীন্দ্র মানসিকতার কুশলী বিশ্লেষণ এবং তত্বকে রসের অভিব্যক্তনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এখানেও তিনি আলোচনার ধারাটিকে উৎসারিত করে দিয়ে রবীন্দ্রানুরাগীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন - 'তত্ত্ব বিচারের মূল্য যতই হোক রসবিচারের চেয়ে বেশি নয় - আর শেষ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারও রস বিচারের আনুষঙ্গিক, কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য রসোপলব্ধিতে সহায়তা। পাঠান্তর বিচার রস বিচারেরই অঙ্গ। আমার সাধ্যানুসারে তাহার সূত্রপাত করিলাম। এবারে যোগ্যতর ব্যক্তিদের এদিকে মনোনিবেশ করা কর্তব্য'।^{৩২৬}

'রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস' প্রবন্ধে দুই বোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় যে আয়তনে ও রসবিচারে খাঁটি উপন্যাস নয় এবং এদের মধ্যে যে কবি-প্রতিভার মূল তত্ত্বটি [সীমা-অসীম, জায়া-জননী, প্রণয়িনী-গৃহিণী] স্থানলাভ করেছে সে কথাই আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বস্তুবাদ ও ভাববাদ তথা Ideal - ও Real - এর বিরোধভাস কিভাবে মূর্ত হয়েছে - 'শেষের কবিতা' কাব্যোপন্যাসে তারই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণে ও রসাস্বাদনে তৎপর হয়েছেন লেখক 'শেষের কবিতা' প্রবন্ধে। নীরস তত্ত্বের উপলব্ধির পথে মানবিক রসের উৎসকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। 'রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র' প্রবন্ধের মৌলিকতাও কম নয়। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সন্ধানে ও কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে চিঠি-পত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান যুগে বিশেষ ভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের জীবনভাষ্য প্রণয়নে চিঠি পত্রের গুরুত্ববিষয়ে এবং রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়নে চিঠি পত্রের আবশ্যিকতা বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক জানিয়েছেন - 'নানাদিক দিয়া তাঁহার চিঠিপত্রের আলোচনা চলিতে পারে, ইহাতে কবির

৩২৫। রবীন্দ্র বিচিত্রা - তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৮, [পৃ: ২৭]

৩২৬। রবীন্দ্র বিচিত্রা - তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৮ [পৃ: ২৭]

মনের ইতিহাস আছে, ইহাতে কবির রচনার স্বকৃত টীকা আছে, ইহাতে তাঁহার ফিলজফির সচেতন ব্যাখ্যা আছে। এসব বিষয়ের আলোচনায় চিঠিপত্রগুলি অপরিহার্য। ৩২৭ 'ছিন্নপত্রের কবি' প্রবন্ধের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রবন্ধের অনুরূপ - 'এখানে আলোচ্য বিষয় এই পত্রগুলিতে প্রকাশিত কবি পুরুষের স্বরূপ। . . . লেখকের অন্তঃপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এখানে সেই চেষ্টাই করিব'। ৩২৮ রবীন্দ্র প্রতিভা উন্মেষের পটভূমিকা ও বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবের মূল খুঁজে পাওয়া যায় 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে। প্রমথনাথ সার্থক গবেষকের নিষ্ঠা ও সাধনা নিয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী হয়েছেন। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা প্রবন্ধটি তারই পরিচায়ক। লেখকের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যেসব প্রভাব পড়িয়াছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সেই সব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। কবি যেন অন্ততঃ একবারের জন্য নিজ জীবনের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ করিয়া উপাদানগুলি পাঠককে দেখাইয়া দিয়াছেন'। ৩২৯

'রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি অনাদৃত কবিতা,' 'রবীন্দ্র কাব্যপাঠের সংকেত,' 'মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বিষয় বৈচিত্র্যই প্রাধান্য লাভ করেছে, ভাবের মৌলিকতা বা চিন্তার গভীরতা এগুলিতে অনেক কম। 'রবীন্দ্র সাহিত্যে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাস' ভিন্নধর্মী আলোচনা, প্রবন্ধকারের সুদূরপ্রসারী কল্পনার ফসল - কোন যুক্তি গ্রাহ্য ও বাস্তব ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন। তবে প্রমথনাথের উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিত্রাণ ও প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ধনঞ্জয় চরিত্র যে অবাস্তব নয় - পরবর্তীকালে গান্ধীর জীবন ও কার্যকলাপে ধনঞ্জয় যে অধিকতর বাস্তব হয়ে উঠেছে সেই কথাই প্রমথনাথ এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। 'বাঁশরী সরকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী নাটকের নায়িকা বাঁশরীর যে অসাধারণ চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা প্রমথনাথের অনুভূতি ও যুক্তির, উপলব্ধি ও বিচারের চিত্তা ও রসবোধের হরগৌরী সন্মিলন। যেমন - 'বাঁশরী সরকার এই নাটকের প্রধান ব্যক্তি, কিংবা বাঁশরী সরকারই বাঁশরী নাটক। এই শড়িপরা ঘূর্ণি হাওয়াটি নাটকের হাসির দিগন্ত হইতে অশ্রু দিগবলয় পর্যন্ত হ হ শব্দে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে চিরদিনের চেনা আকাশখানা বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মর্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস সোমশঙ্কর-পূরন্দর-সুখমার ব্রতনিষ্ঠা আদর্শের শুদ্ধ পাতা উড়াইয়া ভাবী বঙ্গ সাহিত্যের বক্ষ পঙ্কজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আর তাহার চাপা অশ্রুর আভাস দিগন্তস্পর্শী পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভারে সন্নত হইয়া পড়িয়া আত্মবিসর্জনের মুখে উন্মুখ।

৩২৭। তদেব, পৃ: ৮৮।

৩২৮। তদেব, পৃ: ১৭৭।

৩২৯। রবীন্দ্র বিচিত্রা - তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৮, পৃ: ১৫০।

এই নাটকে সত্যই যদি কেউ অবাঙালী থাকে তবে তাহা বাঁশরী সরকার। বিধাতা যে প্রাচীন শিলাখণ্ডে দ্রৌপদীকে গড়িয়াছিলেন, তাহারই অবশিষ্টাংশে বাঁশরী সরকার গঠিত। সে বাঙালীও নয়, আধুনিকও নয়, সে ক্লাসিক্যাল'।^{৩৩০} কবির কলমে লেখা, অনুভূতির রসে সিক্ত এই ইঙ্গিতময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, শোভন ও সাবলীল গদ্যের দ্যোতনা অসাধারণ। সমালোচনা এখানে নব সৃষ্টির সগোত্র। খণ্ড, ক্ষুদ্র বিষয় ও চিন্তাধারাকে লেখক একটি অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ ভাবনাসূত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যকে ও অসংখ্য বৈচিত্র্যকে একটি কেন্দ্রগত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে যত্নবান হয়েছেন।

'মধুসূদন থেকে' রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি ১৪টি প্রবন্ধের সমষ্টি। এদের মধ্যে ৭টি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। অধিকাংশই পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রবন্ধগুলিতে প্রমথনাথের পরিণত মানসের সন্ধান মেলে। একদিকে চিন্তার স্বচ্ছতা ও মৌলিকতা, অন্যদিকে বিশ্লেষণের নৈপুণ্য এবং ভাষার স্বাদুতা ও সরলতা প্রাবন্ধিক প্রমথনাথের বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সমালোচনা :

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থটিও প্রমথনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রসস্নিগ্ধ বিচারশক্তির পরিচয়বাহী। কবিগুরুর ছোটগল্পের বিশেষ যুগ, বিশেষ ইতিহাস ও বিশেষ ভূগোল সম্বন্ধে প্রমথনাথের এই মৌলিক আলোচনা বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থেও প্রমথনাথ গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মানস মানচিত্রটি সুরেখ ও সুস্পষ্ট করে তুলতে, তাঁর মনোপ্রকোষ্ঠের সবগুলি কুঠুরিকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলতে কবির সমকালীন সববিধ রচনাবলী বিশেষতঃ কবিতা ও চিঠিপত্রের সহায়তা যেভাবে গ্রহণ করেছেন তা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। এই আলোচনা তাঁর লেখাকে একটা সমগ্রতা দান করেছে। লেখকের ভাষায় - 'এই পর্বে রচিত কাব্য ও ছোটগল্প মিলাইয়া পড়িলে তবেই কবির তৎকালীন মনোধর্মের সমগ্র রূপটি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র লীলাটি উপলব্ধি হইবে। ছোটগল্প আলোচনার সময়ে আমরা সেই পছাঁই অবলম্বন করিব'।^{৩৩১} শুধু কাব্যই নয়, ছোটগল্পের দিগদর্শন রচনার জন্য লেখক রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সাহায্যও অবলীলাক্রমে ও অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। বিস্তারিত অথচ যুক্তিপূর্ণ ও সংহত আলোচনার শেষে প্রবন্ধকার সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'মানবিক সত্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সত্যের মিশ্রাল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড় কলমে রচিত - ইহা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য'।^{৩৩২}

৩৩০। রবীন্দ্র বিচিত্রা - তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৮, পৃঃ ১১৬-১১৭।

৩৩১। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮২। পৃঃ ১৭।

উদাহরণস্বরূপ লেখক রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প ও তৎকালে রচিত কবিতা পাশাপাশি রেখে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনোধর্মের ভাব-ভাষার সাযুজ্য প্রমাণ করেছেন। যেমন 'একরাত্রি' গল্পটির ভাববস্তু, সমকালীন কবিতা 'পরশপাথর' ও 'আকাশের চাঁদের' সমগোত্রীয়। আবার 'ক্ষুধিত পাষণ গল্প এবং স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়'।^{৩৩৩} কিংবা 'অতিথি গল্পের তারাপদ স্পষ্টতঃ সোনার তরী কাব্যের দুইপাখী কবিতার বনের পাখী' ^{৩৩৪} 'জীবনত্র গল্পটির সঙ্গে পলাতকা কাব্যের মুক্তি কবিতাটির আন্তরিক মিল' ^{৩৩৫} 'নষ্টনীড় যেন চোখের বালির খসড়া'। ^{৩৩৬}

এই গ্রন্থে প্রমথনাথ ছোটগল্প বিচারের এক স্বতন্ত্র, মৌলিক পন্থা অনুসরণ করেছেন। তার ভাষায় 'এবারে অন্য একভাবে ছোটগল্পগুলির বিচার করিব। সব দেশের সাহিত্যেই রচনার শ্রেণীভাগ করিবার রীতি বর্তমান। কেহ বা রচনার বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণী ভাগ করেন। কেহ বা রচনার শিল্পপ্রকৃতি বা Form অনুসারে শ্রেণী ভাগ করেন। আমার মনে হয় এই দুটির কোনটিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়; বিশেষ যেখানে রচনার পরিমাণ প্রচুর এবং সমগ্রে মিলিয়া জীবনের পূর্ণতার আভাস দিতেছে, সেখানে কোন কৃত্রিম শ্রেণী নির্ণয় পন্থা অবলম্বন না করিয়া যতদূর সম্ভব জীবনের নিয়মকে অনুসরণ করা উচিত'।^{৩৩৭} এই নীতি অনুসারে কতকগুলি গল্পে [গিমি, ছুটি, অতিথি, মাস্টারমশাই, ভাইফোঁটা, বলাই প্রভৃতি] বিচিত্র প্রকৃতির বালক বালিকার কর্ম ও মানসিকতার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কতকগুলিতে [দেনা পাওনা, খাতা, সমাপ্তি, শেষের রাত্রি প্রভৃতি] বালিকা বধুর দুঃখ শ্রমের করুণ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে; কতকগুলিতে আছে দাম্পত্য জীবনের মধুর ও প্রেমময় আলোচনা [তারাপ্রসঙ্গের কীর্তি, প্রতিহিংসা, চোরাইখন]। ভ্রাতৃ সৌহার্দ্যের বিষয় চিত্রিত হয়েছে ব্যবধান, রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা, দিদি, দান প্রতিদান, পণরক্ষা প্রভৃতিতে; হৃদয়বান ভৃত্যের ছবি পাই খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার প্রভৃতি গল্পে। মোটকথা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলি অপেক্ষা ছোটগল্পের চরিত্রগুলি বিচিত্রতর ও সার্থকতর।

তবে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গল্পে ভাবালুতা বা অমনোযোগ জনিত যে দোষের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন তা তেমন যুক্তি সিদ্ধ নয়, ব্যক্তিগত রুচি ও আবেগ তাড়িত। অবশ্য

৩৩২। তদেব - পৃঃ ৩৬।

৩৩৩। তদেব - পৃঃ ৫৪।

৩৩৪। তদেব - পৃঃ ৫৫।

৩৩৫। তদেব - পৃঃ ৬৩।

৩৩৬। তদেব - পৃঃ ৫৯।

৩৩৭। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - ষষ্ঠ মুদ্রণ - ১৩৮২, পৃঃ ৬৮।

শিলাইদহে বাসকালে বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে প্রতিদিন এক একটি ছোটগল্প শুনার তাগিদে রচিত গল্পগুলি। সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ প্রভৃতি। যে কিঞ্চিত্ত প্রাণশক্তিহীন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রকাব্যের যমজ ভাই - রবীন্দ্র ছোটগল্প ; এদের ভাষার অপূর্ব কারুকার্য, পেলবতা ও স্থিতিস্থাপকতা বিস্ময়কর। প্রমথনাথের বিশ্লেষণ কুশলতাও অনবদ্য। যেমন - 'তাঁহার ক্ষুধিত পাষাণের মতো গল্পের ভাষা - তাহা যেন ঐ বাদশাহী প্রাসাদেরই একখানা শ্বেতশিলাখণ্ড, বিচিত্র কারুশক্তি, অপূর্ব লাবণ্যময়, তাহাতে মর্মরের শুভ্রতা ও শীতলতা দুই-ই বিদ্যমান। দূরকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিন্যস্ত সেই প্রাসাদের মতোই তাহা কিয়ৎ পরিমাণে যেন সাধারণের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত'। ^{৩৩৩} প্রবন্ধকারের ভাষাও অতীব প্রাঞ্জল, মনোজ্ঞ ও কাব্যিক। গদ্যের আপাতনীরস তরুতে তিনি সরস কল্পনার ফুল ফুটিয়েছেন, আর তাতে ঝলমল করেছে অসংখ্য বিচিত্র অলংকারের কারুকার্য, অথচ তার মূল প্রোথিত রয়েছে লেখকের অনুভূতি লোকে। রসিক চিত্তের স্পর্শে সে গদ্য বা বিশ্লেষণ তাই সর্বদাই সরস, সজীব ও প্রাণবন্ত। একটি রসের স্রোতধারা তাঁর সমালোচনা গ্রন্থে সদা প্রবহমান। কিন্তু সেই স্রোতধারা সর্বদাই যুক্তির তীরভূমির শাসনবদ্ধ, বিচার-কাঠামোর নিয়মানুগ ও শৃঙ্খলিত। প্রমথনাথ কবি, ভাবুক। কিন্তু তাঁর যুক্তি ও বিচারধারা তাঁর ভাবের উপযুক্ত বাহন। যুক্তি ও ভাবের, বুদ্ধি ও হৃদয়ের এই 'পার্বতীপরমেশ্বরৌ' মিলনে তাঁর ভাষা এক অনন্য সৌষ্ঠব লাভ করেছে।

প্রমথনাথ প্রচলিত কোন মতবাদের দাসত্ব করেননি। তিনি সুরসিক, সৃজনশীল সাহিত্যিক, সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী পাঠক। ফলে তাঁর মনের মুকুরে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যে বিভিন্ন মুখী অনুভূতির তরঙ্গভঙ্গ তুলেছে তাই অত্যন্ত সরসভাষায়, স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রকাশ করেছেন তিনি। এই সমালোচনার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই, কোন ধার করা তত্ত্বকথার তন্ত্রী বহনের হীনতা নাই। প্রমথনাথের সমালোচনা বিশুদ্ধ অনুভূতির প্রেরণাজাত ফলশ্রুতি। এখানেই তার মৌলিকতা।

রবীন্দ্র সমালোচনার ধারায় প্রমথনাথ :

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে প্রমথনাথ বিশীর অবদান অসামান্য। প্রধানতঃ তিনজন যুগন্ধর সাহিত্যিক মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বা তাদের সাহিত্য চিন্তা ও সমালোচনা ধারাকে মানদণ্ড করে বাংলা সমালোচনা গড়ে ওঠে। ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা তত্ত্বের বিভিন্নমুখী ধারার অনুসরণ করেই বাংলা সমালোচকগণ অগ্রসর হয়েছেন।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনকেই তাঁর সমালোচনার বিষয় করেছেন প্রমথনাথ। কিন্তু তিনি গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। লেখকের রচনাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করাই তাঁর লক্ষ্য নয়, সেই সঙ্গে লেখকের মানসপ্রকৃতি বা মনঃস্বরূপটির রহস্য উন্মোচনেও তিনি আগ্রহী। আর সেজন্য তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর রচনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমসাময়িক কালে রচিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়-চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, পরিবেশ, কর্মধারা ও চিন্তা চেতনাকেও আশ্রয় করেছেন।

আবার তিনি শুধু নীরস বিচারক বা তথ্য সর্বস্ব বিশ্লেষক নন, রসিক, রসভোক্তা ও সৌন্দর্যপিপাসু। তাই তাঁর সমালোচনা রসসিক্ত, সৌন্দর্যদীপ্ত।

প্রমথনাথ ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর নাটক, উপন্যাস, কবিতা, চরিতকথা, রম্যরচনা সর্বত্রই তাঁর ইংরাজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞানের দ্যুতি বিকীর্ণ দেখা যায়, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নব্য সমালোচনা পদ্ধতি মতে কবির কাব্য বিশ্লেষণ বা প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণে তাঁর মনঃস্বরূপ, রুচি, পঠিত গ্রন্থাদি, সমসাময়িক রচনা, চিঠিপত্র, পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গ সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রমথনাথ রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে উক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এই বিষয়ে তিনিই বোধ হয় পথিকৃৎ। ফলে বাংলা সমালোচনা এক নূতন মর্যাদা ও মাত্রা লাভ করেছে। অধিকাংশ সমালোচক পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য সমালোচনার তত্ত্ব বা রীতি পদ্ধতির বাঁধা পথে চলতে অভ্যস্ত। ফলে তাদের দৃষ্টি হয়ে পড়ে সংকীর্ণ। কিন্তু প্রমথনাথ স্বীয় উপলব্ধি, রসবোধ ও বিচারশীল মনের দ্বারা পরিচালিত বলেই কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট মতবাদের অনুবর্তী নন। অন্তরের প্রেরণাই তাঁকে সমালোচনা কর্মে প্রণোদিত করে। তথ্যসর্বস্ব লেখার যারা পক্ষপাতী, তীক্ষ্ণ যুক্তি ও বিশ্লেষণের ছুরিকা ব্যবহার করে কাব্য সাহিত্যের শব্দ ব্যবচ্ছেদের যারা পক্ষপাতী, প্রমথনাথ সে দলের নন। তিনি পণ্ডিত নন, রসিক, চোখে আড়ুল দাদা নন, সৌন্দর্যসাধক। তাঁর সমালোচনা তথ্যের কণ্টকে দুর্গম নয়, জটিল বিশ্লেষণ ও কূটতর্কের ভাবে দুর্বহন্য, আবার বস্তুহীন নিরবয়ব কোন ছায়াসত্তাও নয়। তা বুদ্ধির খোরাক জোগায় না, রসপিপাসা চরিতার্থ করে। তাই তাঁর আবেদন মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে। তা গতানুগতিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বা জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge) নয়; উপমা, রূপক, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবির কলমে রচিত ভাবের সাহিত্য (Literature of Power)। প্রমথনাথ সাধকের নিষ্ঠা ও পূজকের পবিত্রতা নিয়ে রবীন্দ্র রসসাগরে ডুব দিয়ে আহৃত মণিমুক্তাগুলি পাঠককে উপহার দিয়েছেন, নিজের রসচর্চনা ও আনন্দোপভোগে সহৃদয় পাঠককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি চালু করেন প্রমথনাথ তাঁদের সার্থক উত্তরাধিকারী রূপে উক্ত তুলনামূলক আলোচনার ধারাটিকে আরো পরিণতির পথে টেনে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি শেলী,

কীটস, কালিদাস ও গ্যোটে'র তুলনা করে ভাবনার যে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তা প্রমথনাথের চিন্তার মৌলিকতা ও অনুভূতির গভীরতার পরিচয়বাহী। এই আলোচনায় কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় নি, রূপমুগ্ধ, সৌন্দর্যপিপাসু এক সুরসিক ও সহৃদয় পাঠকের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ফলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র সমালোচনার ধারা প্রসারতা ও গভীরতা লাভ করেছে।

একদা রবীন্দ্র সমালোচনার ধারায় বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্লেষণের পথ গ্রহণ করলেও তাঁদের মানদণ্ড ছিল সমাজনীতি। পরবর্তীকালে 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থে শশাঙ্কমোহন সেন রবীন্দ্রপ্রতিভাকে বিশ্বজনীনতার উপরে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। মোহিতলাল মজুমদার 'রবি প্রদক্ষিণ'-এ রবীন্দ্র প্রতিভার মহত্বকে মেনে নিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নীতির মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে বিচার বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তিনিও এমন কোন আধুনিক রবীন্দ্র সমালোচনা রীতির প্রবর্তন করতে পারেন নি যা অনুসরণযোগ্য হতে পারে।

বরং সেদিক থেকে রবীন্দ্র সমালোচক প্রমথনাথ বিশী এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। সমালোচকের ভাষায় - 'রবীন্দ্র সমালোচনার একটি ধারা জীবনী সমৃদ্ধ আলোচনা - কাব্যরস সন্তোষের ধারা। এই ধারার প্রধান সমালোচক শ্রী প্রমথনাথ বিশী।

প্রমথনাথের রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ [১৯৩৯] এই ধারার পথিকৃৎ। . . . তাঁর পরবর্তী রবীন্দ্রচর্চা : রবীন্দ্র সরণী [১৯৬২]। . . . প্রমথনাথের সমালোচনায় মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল যুক্ত হয়েছে রসসম্বন্ধ বাচনের সঙ্গে, কখনো তা অতিরেকের স্তরে পৌঁছায় নি। তাঁর রবীন্দ্র পর্যবেক্ষণ পূর্ব পরিকল্পিত, পূর্ব নিয়ন্ত্রিত; এলোমেলোভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের বেগে অধ্যায়ের পর অধ্যায় তিনি লিখে যান নি। সমালোচনার মধ্যে সামগ্রিক ছক লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি অধ্যায় এক একটি সোপানের মতো রচিত হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়-নাম সুচিন্তিত, প্রতি অধ্যায়ের আলোচনা বক্তব্যকে বিকশিত করে পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এবং কবির জীবনের সকল তথ্য একটি মাত্র উদ্দেশ্যসাধনে তাৎপর্যবহু হয়ে উঠেছে। শিল্প সমীক্ষায় শিল্পীর আশৈশব প্রতিবেশ অনুষঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহারের এই কৌশল সাঁৎ ব্যুত এর কৌশল বলে কেউ কেউ মনে করেছেন'। ৩৩৯

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্র রচনাবলীকে কখনো জীবনদেবতাতত্ত্বে, কখনো সৌন্দর্যতত্ত্বে, কখনো বিশ্ববোধের তত্ত্বে, বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরই অনুসরণে প্রমথনাথ রবীন্দ্র প্রতিভাকে সীমা অসীমের তত্ত্বে রেখায়িত করতে চেয়েছেন এবং কাব্যরস সন্তোষের দ্বারা সেই তত্ত্বকেই সমগ্র জীবন ও কাব্যের মধ্যে খুঁজে ফিরেছেন।

পরবর্তীকালে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকায়' প্রমথনাথের উক্ত পথ

বেয়ে জীবনীসমৃদ্ধ কাব্যালোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত করেছেন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। তিনিও বিশ্লেষণের পরিবর্তে রসোপভোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার' গ্রন্থে ও ডঃ শিশির কুমার ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' গ্রন্থে ইওরোপীয় Neo Criticism — এর আদলে যে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন তার সূচনা প্রমথনাথ বিশীর গ্রন্থেই। রবীন্দ্র সরণী। প্রস্ফুট। জীবনী সুরভিত কাব্যালোচনার সাহায্যে রসাস্বাদন ও বিশ্লেষণ প্রবণতা প্রমথনাথের মতো উপরিউক্ত দুটি গ্রন্থের মৌল বৈশিষ্ট্য।

যাকে অধ্যাপকীয় সমালোচনা (Academic Criticism) বলা হয় তার সার্থক নিদর্শন মেলে রবীন্দ্রসমালোচক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, ক্ষুদিরাম দাস প্রভৃতির বিভিন্ন রবীন্দ্রচর্চায়। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বিচার বিশ্লেষণ, ঋজুতা ও স্পষ্টতা এঁদের বড় বৈশিষ্ট্য। এঁরা সকলেই রবীন্দ্র সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র সমালোচনার তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তি নির্ভর ও ভাবগভীর রসাস্বাদন পদ্ধতিকে কেউই অতিক্রম করতে পারেন নি।

(খ) বঙ্কিম-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী :

বঙ্কিম সমালোচকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রমথনাথ স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি। দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় রবীন্দ্রিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশঃ তাঁর মনন ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন - 'বুড়ো বয়সে প্রভাব হয় না - তবু হয়েছে। চল্লিশ এর দশক থেকে বঙ্কিমে পড়েছি। . . . বঙ্কিম প্রভাবের স্বীকার বোধ হয় রবীন্দ্র প্রভাব কাটাবার ঔষধরূপেই, যেমন বার্ণার্ডশ কে নিয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্কিম প্রভাবের পরিণতি নেগেটিভ নয়, পজিটিভ'। ৩৪০

১৯৬৫ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর আনন্দ বাজার পত্রিকায় কমলাকান্তের আসরে তিনি লিখেছেন - 'কিছুকাল ধরে বঙ্কিমচন্দ্র আচ্ছন্ন করে আছেন আমাকে। প্রত্যহ নূতন মাধুর্য, নূতন তাৎপর্য, নূতন শক্তির সন্ধান পাচ্ছি তাঁর রচনায়'।

প্রমথনাথ লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ নিম্নরূপ :

- (১) বঙ্কিমরচনাসম্ভার [১৩৭২] — ভূমিকা-প্রমথনাথ বিশী।
- (২) বঙ্কিমসরণী [১৩৭৩]
- (৩) সাহিত্যচিন্তা [বঙ্কিমচন্দ্র] — ১৩৭৫ — ভূমিকা-প্রমথনাথ বিশী।

- (৪) বঙ্কিমসাহিত্য বিচার - প্রমথনাথ বিশী ও বীথিকা চক্রবর্তী।
- (৫) বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জগৎ - প্রবন্ধ - বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল [১৩৮৪] — গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- (৬) বিচিত্র সংলাপ [১৯৫৮] গ্রন্থের তিনটি সংলাপ
 - (ক) বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
 - (খ) বঙ্কিমচন্দ্র ও ম্যাথু আর্নল্ড
 - (গ) বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র
- (৭) চিত্রচরিত্র [১৯৪৯] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ
- (৮) মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ [১৩৮১] গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ -
 - (ক) আজ যদি আসতেন
 - (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তা।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-সমালোচকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সমালোচক দুর্লভ যিনি প্রমথনাথের মতো একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার, ভবতোষ দত্ত, সুবোধ সেনগুপ্ত প্রভৃতি মূলতঃ প্রাবন্ধিক। তাই তাঁদের সমালোচনাতে যুক্তি নির্ভর ও তথ্যনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণের প্রবণতা বেশি।

মোহিতলাল মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি কবি-সমালোচক। তবে এঁরা বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রমথনাথের সগোত্র নন। মোহিতলাল তাঁর বঙ্কিম সমালোচনায় চিন্তার গভীরতা প্রদর্শন করলেও তা বড়ই গভীর, ফলে কিছুটা নীরস ও নিষ্প্রাণ। তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বের ভার সেখানে বেশি - উভয়ের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের অভাব বড় প্রকট।

কিন্তু প্রমথনাথ মূলতঃ কবি বলে এবং সেই সঙ্গে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে পরানুখ বলে তাঁর বঙ্কিম সমালোচনায় একটা সামগ্রিক রসমূর্তির সন্ধান মেলে। তিনি খণ্ড সৌন্দর্যকে অবহেলা করেন নি। 'বঙ্কিম সাহিত্য বিচার' গ্রন্থটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু খণ্ড, ছিন্ন সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি একটি অখণ্ড কেন্দ্রীয় সত্তা আবিষ্কার করেছেন। তাই সে সমালোচনা তথ্য-ভারাক্রান্ত, বস্তু-সর্বস্ব ও নীরস হয়ে ওঠেনি - রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর এষণা ও অনুভূতি, বোধ ও বুদ্ধি, বিচার প্রবণতা ও গভীর উপলব্ধি তাঁকে সমালোচক মণ্ডলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সরলতা, সরসতা ও সাবলীলতা পাঠকের হৃদয়কে নন্দিত করে। সৃজনশীল সাহিত্যিক বলেই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথনাথের সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়, যাকে Spingern - বলেছেন - 'Creative Criticism.'

বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একটা ইতিহাস। সব্যসাচী বঙ্কিম একদিকে যেমন সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তেমনি সমালোচনা কার্যেও

ছিলেন নিরলস সাধক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে তিনি একটা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম বরণ ও বঙ্কিম বিরোধের টানা পোড়েনে বাংলা সমালোচনার শক্তি ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।

একদল বঙ্কিম সমালোচকের বিশ্বাস ছিল যে নীতি ও আদর্শই বঙ্কিম সাহিত্যের মূলভিত্তি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো তাঁরা বঙ্কিম সমালোচনায় বঙ্কিমেরই ভাষা ও ভঙ্গী অনুসরণ করতেন। আধুনিক কালের মতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা লেখক ও তাঁর সাহিত্যের অনুপূজক পর্যবেক্ষণ তখন ছিল দুর্লভ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পূর্ণচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি ঘোষ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি ছিলেন এই শ্রেণীর বঙ্কিম সমালোচক। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আলোচনায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় মেলে। এঁদের সকলেই বঙ্কিম উপন্যাসের কোন একটিকে বা একটি-দুটি চরিত্রকেই তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কলমেই বঙ্কিম সমালোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাজসিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণচরিত্র নামক তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়, রসের উৎস আবিষ্কার ও শিল্প কৌশলের রহস্য মোচনে ব্রতী হয়েছেন। এ তুলিতে সমালোচনা সৃজনশীল নূতন শিল্পকর্মে উদ্দীপ্ত হয়েছে। অনুভূতির গভীরতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, ধীশক্তি ও রসবোধের সমন্বয়ে প্রবন্ধগুলি অসাধারণ মূল্য ও মর্যাদা লাভ করেছে।

রবীন্দ্র পরবর্তী বঙ্কিম সমালোচকগণের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মননশীলতা ও ভাবগভীরতা, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও আলঙ্কারিক ভাষা সম্পদের যথার্থ সমন্বয়ে তাঁর বঙ্কিম সমালোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তবে চিন্তা ও বাক্যের জটিলতা, সুদীর্ঘ সমাস বাহুল্য ও তৎসম শব্দের গাঢ়ীর্ঘ তাঁর বক্তব্যকে অনেক ক্ষেত্রে দূরত্ব করে তোলে। সমালোচক হিসেবে তিনি মূলতঃ রসভোক্তা নন, ব্যাখ্যা দাতা।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্কিম সমালোচনায় অনেকটা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সগোত্র। তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে তিনটি যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে নাট্যগুণের বিকাশ আবিষ্কৃত হয়েছে। যুগরূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম সমালোচনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে। মোহিতলালের 'বঙ্কিম বরণ' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' তারই নিদর্শন। আদর্শবাদী, মহৎ সাহিত্যিক বঙ্কিমকে মোহিতলাল গুরুপদে বরণ করেছিলেন। তিনি বঙ্কিমব্যক্তিত্বের রহস্য উন্মোচন প্রয়াসী ছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি এক প্রবল পৌরুষদীপ্ত যুগনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সমালোচনা Hero - worship - এ পর্যবসিত হয়। আনন্দরসের স্রোতে অবগাহনের পরিবর্তে বা সৌন্দর্য সজ্ঞানের পরিবর্তে মোহিতলাল বঙ্কিমসাহিত্যে জাতির চিন্তা শুদ্ধির মন্ত্র সন্ধান করেছেন। ফলে তাঁর বঙ্কিম বরণ অনেক সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিছুটা একদেশদর্শী ও

সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' গ্রন্থে মোহিতলাল বঙ্কিম অধেষিত মানবজীবনের দুর্জয় রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। কাব্যিক ভাষা ও ভাব গভীরতার সঙ্গে সমালোচকের সূক্ষ্ম বিচার বোধ সমন্বিত হয়ে এই গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন যে সরলতা সংক্ষিপ্তি ও সংহতির সাধনা করেছেন তার অনুসরণ-প্রয়াস না থাকাতে এই আলোচনা হৃদয় হয়ে ওঠেনি। বস্তুবোয় স্বজ্ঞতা ও প্রাঞ্জলতার অভাবও বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে উপন্যাসগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মধ্যেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে সেই সঙ্গে জীবনশিল্পী ও জীবনজিজ্ঞাসু বঙ্কিমের একটি সামগ্রিক রেখাচিত্র অঙ্কনের প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।

ভবতোষ দত্ত 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে সমসাময়িক যুগের ও আধুনিক যুগের পটভূমিকায় রেখে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। সামাজিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণকে এই গ্রন্থে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

হরপ্রসাদ মিত্রের 'বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ'-এ বঙ্কিম চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের সামগ্রিক চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে বঙ্কিমের চিন্তা-সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা আছে। তবে ভাবনায়ক বঙ্কিমই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। বিশুদ্ধ শিল্পী বঙ্কিম গৌণ হয়ে পড়েছে।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির প্রেক্ষাপটে বঙ্কিম সমালোচনার ধারায় প্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা ও অবদান আলোচ্য। 'বঙ্কিমসরণী' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন 'বঙ্কিমসরণী তত্ত্ব প্রণোদিত গ্রন্থ নয়, বঙ্কিম সাহিত্য পাঠে লেখকের আনন্দের প্রকাশমাত্র। অর্থাৎ বইখানা লেখকের নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির ফল। তবে সাহিত্যিক অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত হলেও তার আবেদন সার্বজনীন হতে বাধা নেই'।^{৩৪১}

যথার্থ নিভরযোগ্য বঙ্কিম-জীবনী অলিখিত। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে জীবনীর বিরোধী ছিলেন। এবং রচনার মধ্যেই জীবনী সন্ধানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রমথনাথও বঙ্কিমরচনাবলীর মধ্যে বঙ্কিম জীবন ও ব্যক্তিত্বের সন্ধান করেছেন - 'প্রত্যেক সাহিত্যিক সংসারের পথে পদাবলী গোঁথে চলে যান, সেগুলি অনুসরণ করলে লেখকদের গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য বুঝতে পারা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পদাবলী জানানরই নাম বঙ্কিম সরণী'।^{৩৪২} বঙ্কিম মানস, বঙ্কিম উপন্যাস ও বঙ্কিম প্রবন্ধ এই ত্রয়ীকে একসূত্রে স্থাপন করে বঙ্কিম সরণী পরিক্রমায় ব্রতী হয়েছেন প্রমথনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই তিনি

৩৪১। বঙ্কিমসরণী-প্রমথনাথবিশী-দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪, ভূমিকা।

৩৪২। তদেব-পৃঃ ৩-৪।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ছায়াক্রম লক্ষ্য করেছেন - 'প্রবন্ধগুলি হিমাদ্রির চিরহিমানী, উপন্যাসগুলি তারই বিগলিত মূর্তি'।^{৩৪৩} বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একাধারে সৌন্দর্য পিপাসু ও জীবন জিজ্ঞাসু। উভয় মানসিকতার স্বরূপটি প্রমথনাথ আশ্চর্য কুশলতায় বিশ্লেষণ করেছেন। অতি সংক্ষেপে অথচ স্বচ্ছ চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন তিনি বঙ্কিম জীবনদর্শনকে। চিন্তার ব্যাপকতা ও উপলব্ধির গভীরতা সংযুক্ত হলেই এই দুঃসাহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়। প্রমথনাথ সেই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন।

লেখক বঙ্কিম প্রতিভার কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্যকে ব্যাঞ্জনায, ইঙ্গিতে, অপক্লপভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তিনি বিস্তারিতভাবে কোন কিছুই আলোচনা করেন নি। শুধু সংক্ষেপে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্রগুলি ধরিয়ে দিয়ে পাঠকের কৌতুহল ও বিস্ময়কে উসকে দিয়েছেন, পাঠকের ভাবনার ক্ষেত্রে প্রসারিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন - 'তঁার উপন্যাসের গঠন অত্যন্ত সুপিন্ধ ও সুপরিকল্পিত। কলমকণ্ঠে যথেষ্ট আবৃত্ত এবং কলম ক্রান্তিতে যথেষ্ট শেষ তাঁর দুচক্ষের বিষ ছিল। এরিস্টটল কথিত আদি-অন্ত্য ও মধ্য সামঞ্জস্য বিধান করে উপন্যাস গঠন করতে তাঁর সমকক্ষ নাই। ঘটনায় ও Topography - বা ভূ সংস্থানে মিলিয়ে কাহিনী গড়ে তুলতেও তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য। তাছাড়া প্রত্যেকখানি উপন্যাসের একটি করে সুনির্দিষ্ট pattern - বা ছাঁচ আছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বারুণী পুঙ্করিণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, 'চন্দ্রশেখর' গঙ্গানদীর সমান্তরালে মুক্তাহারের ন্যায় বিন্যস্ত, কলিকাতা, বেদগ্রাম, মুঙ্গের ও পাটনা চারিটি মুক্তা। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর ঘটনাস্থান যথাক্রমে শালবন ও তিস্তা নদী। . . . ঘটনায় ও ভূসংস্থানে মিলিয়ে pattern - বা ছাঁচ সৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ কপালকুণ্ডলা কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নাট্যকার ও স্থপতির যুগলকীর্তি'।^{৩৪৪}

সমগ্র অনুচ্ছেদটির মূল বক্তব্যের চুম্বক শেষবাক্যে অর্ধধন, সংহত প্রবাদোপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে ব্যক্ত করা প্রমথনাথের সমালোচক সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্যকে তিনি বিশ্লেষণী যুক্তিও কাব্যিক ভাষায়, সংক্ষিপ্ত ও সরল বাক্যে রূপদান করেছেন - 'নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ বা প্রথম মিলন সংকেটের মুহূর্তে। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক নায়িকাদের অনেকেরই প্রথম সাক্ষাৎ বা প্রথম মিলন সংকেটের মুহূর্তে। জগৎসিংহের সঙ্গে আয়েষার প্রথম সাক্ষাৎ জগৎসিংহের রোগশয্যায়, কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ কুন্দনন্দিনীর মাতার মৃত্যুশয্যায়, রোহিনীর সঙ্গে গোবিন্দলালের প্রথম মিলন রোহিনীর মূর্খার ক্ষণে, এমন উদাহরণ আরও আছে। ঘটনার কচ্ছপগতির ধীর পদসঞ্চার শশকের দ্রুত লক্ষ্যনে এক মুহূর্তে ওলট পালট হয়ে

৩৪৩। তদেব - পৃঃ ১০।

৩৪৪। বঙ্কিমসরণী - প্রমথনাথ বিশী - দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৩।

যায়। তারপর সঙ্কট মুহূর্ত জনিত করুণা এসে ঘটনার ভূমিকা গ্রহণ করে'। ৩৪৫

প্রমথনাথের এই সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতধর্মী সমালোচনা কর্মের মূলে বঙ্কিমপ্রীতি। তিনি এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ও সেরা শিষ্য। বঙ্কিমের মৌল বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি - 'শিল্পজগতে বেশি বললেই যে বেশি প্রকাশ হয় তা নয়। অল্প দু'চারটি ইঙ্গিত দিয়ে কর্তব্য সমাপন করলে পাঠকের হৃদয়ের শূন্য আসরে তারা নৃত্য করবার অবকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পের এই রহস্য অবগত ছিলেন। তাঁর উপন্যাসসমূহ কতকগুলি ইঙ্গিতের সমষ্টিমাত্র, সেইজন্য এত সংক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধ সমস্তই ইঙ্গিতধর্মী ও সূত্রাত্মক'। ৩৪৬

প্রমথনাথ বঙ্কিমসমালোচনায় এই সূত্রাত্মক রীতিকেই অনুসরণ করেছেন অনেকাংশে। যেমন ইন্দিরার সমালোচনায় তিনি বলেছেন - 'ইন্দিরা পরিপূর্ণ দাম্পত্যরসের কাব্য। দাম্পত্যরসের একটি চিত্র সুভাষিনীদের পরিবার, আর একটি ইন্দিরাদের পরিবার, একটিতে দাম্পত্যরসের মাধুর্য, অপরটিতে দাম্পত্যরসের রোমান্স। বাঙালীর সংস্কারজীর্ণ গৃহকোণে যে এই রোমান্সটুকু ছিল তাকে আবিষ্কার করে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জীবনের সীমানা ও মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। কবির গুণু স্তম্ভ নন, আবিষ্কারকও, একদেহে বিশ্বামিত্র ও কলম্বাস'। ৩৪৭

রবীন্দ্রসমালোচক প্রমথনাথ ও বঙ্কিম সমালোচক প্রমথনাথে কিছু পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রমথনাথ রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের সচেতন প্রয়োগে বক্তব্যকে হৃদয়, ভাবময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। কিন্তু বঙ্কিম সমালোচনায় তিনি অলঙ্কার-কারুকার্য ও ভাবাবেগকে বহুলাংশে বর্জন করেছেন। আরো বেশি যুক্তিনিষ্ঠ, সরল ও নিরাবেগ হওয়ার সাধনা করেছেন। এখানে তিনি বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই আয়ত্ত্ব ও অনুশীলন করতে সচেষ্ট - 'এখন রাশ টানছি - চেপ্টা করছি, কম কথায় কতখানি বলা যায়'। ৩৪৮

অবশ্য একথা ঠিক যে আবাল্য রবীন্দ্র ভাব পরিমণ্ডলে পরিপুষ্ট প্রমথমানস ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমী রচনামূল্যকে সম্পূর্ণভাবে বরণ করে নিতে পারে নি। তাছাড়া তিনি নিজে ছিলেন কবি। তাই সংযমসমৃদ্ধ বাকমূর্তির মধ্যেও অনুভূতি কোমলতা, ভাবগভীরতা ও সৌন্দর্যচেতনা ফুটে উঠেছে - যুক্তি বিচারের দুই তীরের বন্ধনীতে সৃজনশীল কল্পনার রসধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বঙ্কিম সমালোচক প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যে এক নূতন

৩৪৫। বঙ্কিমসরণী - প্রমথনাথ বিশী - দ্বিতীয় সং, ১৩৮৪, পৃ: ৪৬।

৩৪৬। তদেব - পৃ: ৫১।

৩৪৭। তদেব - পৃ: ২৪৯।

৩৪৮। অর্ঘদত্ত - পূর্ণপুরস্কার-শঙ্করী প্রসাদ বসু - কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃ: ১৪০৯।

পথের সন্ধানী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই সাহিত্য-মহারথীর চিন্তা-চেতনা ও রীতি-প্রকরণের মধ্যে সেতুবন্ধন প্রয়াসী ছিলেন তিনি। বঙ্কিমরীতির সাধনায় সর্বাঙ্গিক সিদ্ধিলাভ না করলেও বঙ্কিম ও রবীন্দ্র রীতির সমন্বয়ে প্রমথনাথ যে একটি নিজস্ব পথের সন্ধান পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র সরণী ও বঙ্কিমসরণীতে পরিক্রমা করতে করতে তিনি প্রমথ-সরণীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভাব ও যুক্তির রসায়ন ঘটিয়ে অল্পকথায় কত বেশি বক্তব্য নিবেদন করা যায় তার সাধনায় প্রমথনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম। যেমন - 'মিতভাষণে অমিত প্রকাশ যদি শিল্পের প্রধান লক্ষণ হয় তবে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি' ৩৪৯ 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান সাধারণ লক্ষণ শরৎ ঝরু এবং বিদ্যুৎবৎ ক্ষিপ্রগতি' ৩৫০ 'দগুত্রে [কমলাকান্তের দগুত্রে] এ পর্যন্ত যা লিখেছেন তার সার, আবার যা লিখবেন তার পূর্বাভাস। ও বইটা যেন তাঁর মনের Index - বা সূচীপত্র' ৩৫১ 'কমলাকান্তের রচনা আইডিয়ার El Dorado; - - পথে ঘাটে মণিমাণিক্যের টুকরা ছড়ানো, সে সব বাঁচিয়ে পথ চলা দুষ্কর' ৩৫২ 'প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লিখিত উপন্যাসসমূহের চেয়ে বঙ্কিমী উপন্যাস অনেক বেশি জটিল, গ্রন্থির পরে গ্রন্থি, গ্রন্থির আর শেষ নাই - অথচ সংযত বাক ও ঘটনা ঘনিষ্ঠ। তুলনায় পরবর্তীদের রচনা বস্তুতা বহুল ও অনেক পরিমাণে ভাবালুতাদুষ্ট' ৩৫৩

মন্তব্যগুলির প্রতিটিই এত অর্থঘন, ভাবগর্ভ, ইঙ্গিতধর্মী ও চিন্তাশুদ্ধ যে তাদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া প্রমথনাথের অন্য কোন দোসর নেই।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন - 'বঙ্কিমসরণী রচনার প্রত্যক্ষ কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখকের প্রভূত ঋণের সুদের সামান্য অংশ পরিশোধ, আসল পরিশোধনীয় নয়'। এ থেকে বোঝা যায় প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু এ জন্য তিনি বঙ্কিমের অহেতুক স্তাবকতা করেন নি। গুণপণা ব্যাখ্যা করেছেন, প্রশংসা জানিয়েছেন, কিন্তু যথার্থ নিরপেক্ষ সমালোচকের মতো প্রয়োজনে তাঁর দোষ-ত্রুটি নির্ধারণেও কুণ্ঠিত হননি। তবে সে নিন্দার ভাষাও সংযমসমুজ্জ্বল ও সৌন্দর্য শিল্পমণ্ডিত। যেমন বিষবৃক্ষ উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন - 'সবচেয়ে বড় দোষ মনে হয়

৩৪৯। বঙ্কিমসরণী-পৃঃ ১০২।

৩৫০। তদেব-পৃঃ

৩৫১। তদেব-পৃঃ ১৮।

৩৫২। বঙ্কিমসরণী পৃঃ ১২৮।

৩৫৩। বঙ্কিমসাহিত্যবিচার-প্রমথনাথবিশী, ১৩৭৭। পৃঃ ২৫।

কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে হীরাকে দর্শন। মাতাকে স্বপ্নে দর্শন ব্যাখ্যার যোগ্য। কিন্তু যে হীরাকে আগে কখনো সে দেখেনি তাকে কি স্বপ্নে দেখা সম্ভব . . . স্বপ্নকে সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দোষী মনে করি না। তবে স্বপ্নও একটা নিয়মের অধীন। অভিজ্ঞতা বহির্ভূত বস্তু স্বপ্নে দর্শন সম্ভব কিনা এক্ষেত্রে সেটাই বিবেচ্য'। ৩৫৪

সমালোচক প্রমথনাথের বড় গুণ এই যে তাঁর আলোচনা কখনো নীরস তথ্য কণ্টকিত, তত্ত্ব বা দর্শনের গোলকর্ষাধীন বিভ্রান্ত বা দুরাহ শব্দের ও দুর্বহ অলঙ্কারের ভারে ন্যূনতম নয়; তা সহৃদয় মনের গভীর উপলব্ধিতে সুস্থিত, রসিক মনের আনন্দরস ধারায় অভিষিক্ত।

'বঙ্কিম সাহিত্য বিচার' গ্রন্থখানি একটু ভিন্নধর্মী। এখানে বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধপুস্তকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার সঙ্গে মূল থেকে মূল্যবান অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেগুলি একাধারে প্রকাশকলা, সৌন্দর্যবোধ ও জীবনচেতনা ভাস্বর - 'এসব মন্তব্য গৌণ হলেও আদৌ অবাস্তব বা অপ্রাসঙ্গিক নয়, কেননা এগুলি বক্ষ্যমান গল্পটি তথা সাধারণভাবে মানবজীবন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে করতে চলতে থাকে। এই গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের গুঢ়, গভীর সৌন্দর্যময় মন্তব্যসমূহের সংগ্রহ।

মানবজীবন সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে এমন শত শত মন্তব্য ছড়ানো বঙ্কিমসাহিত্যে। সেই সঙ্গে আছে শিল্পকলা হিসাবে মহার্ঘ্য অংশ বিশেষ। শিল্পী-মনীষীর রচনাতে এমন হওয়াই স্বাভাবিক'। ৩৫৫

প্রমথনাথের ধারণা বাঙালীর চিন্তা লোকের পূর্ণতা সাধনে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের সম্মিলিত সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্র সাধনায় বাঙালী যতখানি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, বঙ্কিম সাধনায় ততখানি নয়। কাজেই উভয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তিনি বঙ্কিম সাধনায় রত। তাঁর মতে বঙ্কিমচর্চা ও বঙ্কিমচিন্তা আমাদের আত্মচিন্তা বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠবে। "বঙ্কিমচন্দ্রের 'র্যাশনালিজম' ও রবীন্দ্রনাথের 'রোমান্টিসিজম'-এ দুয়ের মিলিত ধারার তীরে, গড়ে তুলতে হবে বাঙালীর চিন্তালোক ও সৌন্দর্যলোক। রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রভাবে আমরা একপেশে হয়ে পড়েছি, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারার মতো চাপিয়ে দিয়ে নৌকাখানায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা আবশ্যিক। এই গ্রন্থ সংকলনের সেটাও একটা প্রধান উদ্দেশ্য - বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝে যাতে আমরা নিজেদের বুঝবার সুযোগ পাই"। ৩৫৬

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে গেলে বঙ্কিম প্রবন্ধ বুঝতে হবে, আর বঙ্কিম প্রবন্ধ বুঝতে গেলে

৩৫৪। বঙ্কিমসরণী - পৃ: ৮৬-৮৭।

৩৫৫। বঙ্কিমসাহিত্য বিচার - পৃ: [ভূমিকা]

৩৫৬। তদেব - পৃ: [ভূমিকা]

তার সাহিত্যতত্ত্ব বুঝতে হবে। বঙ্কিমের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী কোন বঙ্কিম সমালোচক আর করেন নি। লেখকের মতে - "বঙ্কিমচন্দ্র নানা প্রসঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে যে সব চিন্তা করেছেন - 'নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' তারই ঘনীভূত রূপ। বস্তুতঃ একে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তার সার বা ঘনীভূততম রূপ বলা যেতে পারে। চিন্তা এখানে তত্ত্বাবস্থা অতিক্রম করে সূত্রে পরিণত। কথিত প্রবন্ধের বারোটি সূত্রের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের স্থায়ী আশ্রয়"। ৩৫৭

প্রসঙ্গক্রমে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও রীতি-প্রকরণের একটি মনোজ্ঞ, তথ্যপূর্ণ, তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন - 'বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সাহিত্য সমালোচনা একাধারে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের কাছে নিছক সাহিত্য। . . . নীতিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সামান্য মাত্রাগত প্রভেদ থাকলেও দুইজনের রীতিভিন্ন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিমাণে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক সচেতন, রবীন্দ্রনাথ সে পরিমাণে নন, রবীন্দ্রনাথে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরোক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রে সর্বদা প্রত্যক্ষ। আর তাঁর সমালোচনার একটি প্রধান লক্ষণ জীবনী ও সমালোচনার সহযোগিতায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা। এ পথ রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর তথ্য অসহিষ্ণু মন পদ্যপত্রে জলকণাকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেনা'। ৩৫৮ একাধারে রবীন্দ্রভক্ত ও বঙ্কিম শিষ্য প্রমথনাথ ব্যতিরেকে এমন সহজ, সরল অথচ গভীরার্থক তুলনামূলক আলোচনা ও প্রত্যয় দীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তি-নিষ্ঠা ও অনুভূতির যুক্তবেগী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রমথনাথও এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্ররচনা ও বঙ্কিম রচনার তিনি একনিষ্ঠ পাঠক। রবীন্দ্র-প্রতিভা-সমুদ্রে শুচিস্নাত প্রমথনাথ বঙ্কিমসরগীতে মানসপ্রমগ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

একাধারে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ বলেই তাঁর পক্ষে 'বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক স্বর্ণ' প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব হয়। এবং এই কারণেই উভয় লেখকের প্রকাশকলা ও রীতিবৈচিত্র্য নিয়ে এমন অনায়াস অথচ বিদগ্ধ আলোচনা করা সম্ভব হয়। যেমন - "রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কারভূষিত বাক্যগুলি লতায়িত, লতার নমনীয়তা ও কোমলতা তাদের বৈশিষ্ট্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যগুলি তরবারির দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি নয় - সেই সঙ্গে আছে তরবারির তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা, প্রয়োজনকালে এই তরবারি ছোরার আকারের মতো হ্রস্ব। এগুলিকে এপিগ্রাম বলা চলে, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র' এরকম এপিগ্রাম বহুলতা রবীন্দ্রনাথে বিরল"। ৩৫৯

৩৫৭। সাহিত্য চিন্তা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সম্পাদিত, ১৩৭৫, পৃঃ ৬

৩৫৮। তদেব - পৃঃ ২৫।

৩৫৯। বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল - প্রমথনাথ বিশী - ১৩৮৪, পৃঃ ৫

প্রমথনাথের সববিধ রচনার মধ্যেই অনুরূপ অর্থঘন, সংক্ষিপ্ত, প্রদীপ্ত এপিগ্রামের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ভারতপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। প্রমথনাথের জীবনদর্শনও ভারত প্রেমের মূলসূরে বাঁধা। সেই কারণে তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব 'বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর চিন্তায়, রবীন্দ্রসাহিত্যে তো বটেই, উপনিষদের স্থায়ী আসন করে দেবার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। . . . গীতা সম্বন্ধে তদধিক কাজ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। গীতা চিরকাল ভারতের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের ধ্রুবতারা। কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গীতার গৌরবময় আসন করে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র'। ৩৩০

শুধু রবীন্দ্র সরণী বা বঙ্কিমসরণী গ্রন্থে নয়, চিত্র-চরিত্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে এবং কমলাকান্তের আসরের বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রমথনাথের বঙ্গপ্রীতি ও ভারতপ্রেমের গভীরতার পরিচয় মেলে। এদিক থেকেও তিনি রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক যুক্তি বিচার পদ্ধতি ও সরল, সংক্ষিপ্ত, অর্থগৌরব সমৃদ্ধ বাক্যবিন্যাস ও রীতি-প্রকরণ প্রমথনাথ তাঁর প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করলেও বহুক্ষেত্রেই তিনি রবীন্দ্রিক রচনাইশৈলী, প্রকাশভঙ্গী ও ভাবানুভূতির গাঢ়তাকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। 'বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রমথনাথও মিতবাক। কিন্তু বঙ্কিমের নৈয়ায়িক গদ্য নয় প্রমথনাথের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাকে প্রমথনাথ সমালোচনায় কাজে লাগান, সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার বর্সুষমা'। ৩৩১ আসলে কবি প্রমথনাথের পক্ষে, রবীন্দ্র ভাবশিষ্য প্রমথনাথের পক্ষে এছাড়া গতাস্তর ছিল না। যেমন - 'রাজসিংহের যথার্থ উপমাশূল আকবর বাদশাহের পরিত্যক্ত নগরী ফতেপুর শিকরীর প্রাসাদদুর্গ। অলঙ্করণ বিরলতাই তার অলঙ্কার। বিপুলতাই তার গৌরব, দৃঢ়নিবদ্ধ ইমারত, প্রাকার ও গম্বুজগুলি পেশী বহুল অনুশীলিতদেহ মন্দের ন্যায় আশ্চর্যপ্রত্যয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ। আর ঐ বিরাট বুলন্দ দরওয়াজা সগর্বে আকাশটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাহ্যক্ষেপটে অনন্তকালকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেন আহ্বান করেছে। রাজসিংহ এইরকম একটি ভাষাময় প্রাসাদদুর্গ। রাজসিংহ ভাষায় গঠিত ফতেপুর শিকরি'। ৩৩২

এই প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ কবিজনোচিত ও রবীন্দ্রানুসারী। কিন্তু এর সূত্রাঙ্ক, সংহত বাক্যাংশ বঙ্কিম ঐতিহ্যানুসারী। দৃষ্টির স্বচ্ছতায় ও উপলব্ধির গভীরতায় এর ভাষা এক অপূর্ব স্বাদু, সাবলীল, দ্রুতিগুণসম্পন্ন সাহিত্যিক গদ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র সরণী অথবা বঙ্কিমসরণীর মত অদ্বিতীয় সমালোচনা গ্রন্থের প্রাণবন্ত এক গভীর উপলব্ধি। আর যে

৩৩০। বঙ্কিমসরণী - ১৩৮৪, পৃঃ ১৩৪।

৩৩১। প্রমথনাথবিশী : চিত্রচরিত্র - বিজিতকুমার দত্ত, কথাসাহিত্য ১৩৯২, জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১০৭৬।

৩৩২। বঙ্কিমসরণী - প্রমথনাথবিশী - পৃঃ ২৭২।

গদ্যে সেই উপলব্ধি বিধৃত তা এক সাহিত্যপ্রসঙ্গের গদ্য' । ***

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের দুই বৃহৎ বনস্পতি । হিমালয় সদৃশ তাঁদের ব্যক্তিত্ব । তাঁদের ছত্রছায়াতলে জন্ম নিয়েছে ক্ষুদ্র মাঝারি বহু সাহিত্যিক পাদপ । উভয়ের প্রতিভার চৌম্বকশক্তিকে অস্বীকার করার স্পর্ধা কোন বাঙালী সাহিত্যিকের নেই । প্রমথ প্রতিভার ধারা রবীন্দ্র ও বঙ্কিম নামক দুই গিরিসঙ্কটের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত, উভয় প্রতিভার হিমালয়পূঞ্জের গলিত ধারায় পরিপুষ্ট । বাংলা সাহিত্য কলোসাসের মতো রবীন্দ্র বঙ্কিম দুটি বিশাল ও সুদৃঢ় চরণের উপর দণ্ডায়মান । প্রমথনাথ শ্রদ্ধানত মস্তকে ও বিশ্বয়বিস্ফারিত নয়নে তার মাঝখান দিয়ে পথ করে চলেছেন । একাধারে এমন বঙ্কিমশিষ্য ও রবীন্দ্রভক্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল । বঙ্কিম ঐতিহ্যে প্রোথিত প্রমথপ্রতিভা রবীন্দ্র আকাশে মুক্ত, আলোকিত । বঙ্কিমসমালোচনায় এই দ্বৈত সত্ত্বার সমন্বয় ঘটেছে ।

সাহিত্যবোধে (Critical Sensibility) উদ্দীপ্ত হওয়া এবং সেই বোধ অপরের মধ্যে সঞ্চার করার ক্ষমতাই হচ্ছে যথার্থ সমালোচকের মৌল বৈশিষ্ট্য । প্রমথনাথের মধ্যে সেই সমালোচনী প্রতিভা ছিল । আর সেই প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছে তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর অধ্যাপনাজাত ব্যাখ্যানের অভ্যাস এবং কবির গভীর উপলব্ধি ও সরস প্রকাশভঙ্গী । সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি, ঔপন্যাসিকের কাহিনী সৃষ্টির ক্ষমতা, নাট্যকারের নিরাসক্তি, সমভাবে ভাবিত ব্যক্তির সহৃদয়তা এবং সর্বোপরি কবির অনুভূতি গভীরতা, দৃষ্টির অখণ্ডতা ও সরস প্রকাশভঙ্গীর সুষ্ঠু সমন্বয়ে রূপকার ও টীকাকারের অদ্বৈত সম্মিলনে বঙ্কিম সমালোচনার তথ্য বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথনাথ বিশী চির অম্লান ।

(৪) রসরচনা : বিষয়ীমুখ্য, ভাবাত্মক, কল্পনাসুরভিত ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শসংযুক্ত সরস রচনা সাধারণতঃ রসরচনা আখ্যা দেওয়া হয় । প্রমথনাথের এই ধরনের রচনা সংকলনের মধ্যে 'বিচিত্র উপল' অন্যতম । গ্রন্থটি প্রমথ-প্রতিভার মনন-স্বাতন্ত্র্য ও অনুভূতিগভীরতার পরিচয়বাহী । বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অসাধারণ । আর প্রকাশ ভঙ্গীটিও অনন্যসাধারণ । আপাতশুদ্ধ উপল খণ্ডগুলির নীচে অন্তর্লীন আছে রসের ফসুধারা । আপাতসরল বাক্যগুলির মধ্যে আছে গভীর তাৎপর্য । লেখকের প্রতিভার প্রিজমে কখনও উদ্ভাসিত হচ্ছে কৌতুকহাস্য, কখনও ব্যঙ্গ, আবার কখনও বেদনার অশ্রু । এগুলি প্র. না. বি ও প্রমথ বিশীর জোড় কলমে রচিত, সুন্দর ছোটগল্পের মতো সুখপাঠ্য । প্রতিভার গৃহিনীপনা থাকলে যে অতি তুচ্ছ বস্তুও কতখানি উপাদেয় হয়ে উঠতে পারে এবং অতি অকিঞ্চিৎকর বাস্তব উপাদান যে সাহিত্য রসের উৎস হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ মেলে এই গ্রন্থের, ঘড়ি, ডেলি প্যাসেঞ্জার, ফুলকলি, বার্তাকু, দেওয়াল পঙ্খিকা, টেলিফোন, নৃতন জুতা, সোনাপাণ্ডি,

রেল স্টেশন প্রভৃতি রচনাগুলিতে ।

প্রতিটি রচনা যেন এক একটি উপলব্ধ । প্রতিটির সৌন্দর্য অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র, আবার প্রতিটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ । কিন্তু প্রত্যেকটিকেই সাদরে সঞ্চয় করার লোভ ছাড়তে পারে না কোন দৃষ্টিমান ব্যক্তি । এছাড়া প্রতিটি উপল যেন অতল গভীর, দিগন্ত বিসারী, চির আনন্দবেদনায় উদ্বেলিত সমুদ্রোপম প্রমথপ্রতিভার প্রতীকী সত্তা ।

'বাংলা সাহিত্যের নর নারী' গ্রন্থটিও অভিনবত্বের দাবী রাখে । এটি 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থের পরিপূরক । ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন - 'ইতিপূর্বে ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মনীষীদের চিত্র চরিত্র লিখিয়াছি । তাঁহারা ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ । জীবলোক হইতে অপসারণের পরে স্মৃতিরূপে মাত্র তাঁহারা বিরাজিত । সেই স্মৃতিকে পুনরায় রক্তমাংসের সংস্কারে ভূষিত করাই ছিল চিত্র চরিত্র লেখকের উদ্দেশ্য । এবারে অন্য এক প্রকার চিত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছি । ইহারা বাঙলার মনীষী নয়, বাঙলার মনীষীদের সৃষ্টি । সাধারণ অর্থে ইহারা রক্তমাংসের জীব না হইয়াও রক্তমাংসের জীবের চেয়ে অধিকতর সত্য, যে সব মনীষীর ইহারা সৃষ্টি তাঁহাদের চেয়েও ইহাদের আয়ু দীর্ঘতর, ইহাদের অনেকেই অমর, মৃত্যুশীল মানুষের অমরতার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক । . . . বাঙালি লেখকের সৃষ্ট কতকগুলি বিশিষ্ট [সবগুলি সম্ভব নয়] নরনারীর ইতিহাস রচনাই বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য' । ৩৩৪

জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের সাধনায় বাঙালি লেখকগণ অসংখ্য, বিচিত্র নরনারী সৃষ্টি করেছেন । চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা থেকে আধুনিক কালের রাজশেখর বসুর গজলিকার শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী পর্যন্ত মোট ৩৭ টি চরিত্রের হৃদস্পন্দনটি যথাযথ অনুভব করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই সংক্ষেপে, তুলির স্বল্পরেখার টানে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রমথনাথ । লেখক দেখিয়েছেন যে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভাঁড়ু দস্ত এবং আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচার মধ্যে ভেদ যৎসামান্য, কারণ উভয়েই বাঙালার মাটিতে এবং একটি মানসিকতা থেকে গঠিত ।

এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন - 'এক হিসাবে বর্তমান পর্যায় চিত্র চরিত্র হইতে ভিন্ন ধর্মী রচনা । চিত্র চরিত্রে ছিল রক্তমাংসের জীবকে ভাবলোকে উদ্ভাষন, আর এখন করিতে চাই ভাবলোকের জীবকে রক্তমাংসের সংসারে নিম্নায়ন । এ অনেকটা স্বর্গ হইতে বিদায়ের অনুরূপ । ভাবস্বর্গের জীবকে বাস্তব সংসারে নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখিতে চাই কি প্রতিক্রিয়া ঘটে । বর্তমান পর্যায়ের ভাব হইতে রূপে আসা আর পূর্বতন পর্যায়ের রূপ হইতে ভাবে যাওয়া, এই দুইয়ে মিলিয়া ভাব হতে রূপে যাতায়াতের চক্রাবর্ত সম্পূর্ণ হইবে । এইরূপে বাঙলার মনীষার বাস্তব রূপ ও ভাবরূপ দুইকেই হয়তো জানিতে পারা যাইবে । বাঙালির

ভাবলোকের এই অধিবাসীগণ বাঙলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়তো এমন সংবাদ দিতে পারিবে রাজনীতির শুদ্ধ দলিলে যাহার আভাসটুকুও মর্মান্বিত হয় না'। ৩৩৫

এই গ্রন্থে প্রমথনাথের অধিকাংশ গ্রন্থের মতোই বাংলা সাহিত্যপ্রীতি ও বাঙালী প্রীতি আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালী সাহিত্যিকদের মানসিকতা বা চিন্তা-চেতনা-কল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের আঁকা বিভিন্ন চরিত্রে। তাছাড়া বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিকদের মানসসত্ত্বানের মাধ্যমে সেই সেই যুগের হৃদস্পন্দনটিও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। আবার ভিন্ন যুগের ভিন্ন কলমে আঁকা প্রায় অভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ মেলে - 'মানুষের বংশলতিকার মতো কাল্পনিক নরনারীরও বংশলতিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে হীরা, রুষ্কিনী ও কিরণময়ীকে একই ভাবগোষ্ঠীর মেয়ে বলা যাইতে পারে। আবার ভাঁড়ুদত্ত ও হীরামালিনী একই বংশের লোক, দেবযানী ও বাঁশরী সরকার দেহান্তরে সমান রক্তধারা বহন করিতেছে। নৃতাত্ত্বিক যেখানে বাস্তব রক্তধারায় ঐক্য সন্ধান করে, সাহিত্য সমালোচককে সেখানে কাল্পনিক রক্তধারায় ঐক্য সন্ধান করিতে হয়। আর একবার রক্তের ঐক্য খুঁজিয়া পাইলে জাতিগত চরিত্রের রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে'। ৩৩৬ যেমন - এই গ্রন্থে চিত্রিত ভাঁড়ু দত্ত ও ঠকচাচা চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে একটা মানসিক সাযুজ্যলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সৃষ্ট বলে একটি বাহ্যপ্রভেদ থাকলেও মানসলোকে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। কারণ সুনীতির মানদণ্ডে তারা দুজনেই যতখানি খাটো, সুবাক্যের মানদণ্ডে ঠিক ততখানি বড়।

প্রমথনাথ সৃজনশীল কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন বলেই প্রতিটি চরিত্রের অন্তর্লোকের রহস্যকে এমন সুন্দর ভাবে অনুভব ও প্রকাশ করতে পেরেছেন। অনেক সময় তিনি মূল স্রষ্টার অভাবিত বিষয়কে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যা পাঠকের কাছে হৃদয় ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে। সুস্থ অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তিনি এইভাবে চরিত্রগুলির নবতর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। কাল্পনিক চরিত্র প্রমথনাথের কল্পনাকুশলতা, প্রকাশভঙ্গী ও পরিবেশন নৈপুণ্যে সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভাবলোক থেকে যেন বস্তুলোকে নেমে এসেছে। যেমন — ভজ্জহরি চরিত্র গ্রন্থে লেখকের মন্তব্য স্মরণীয় — 'প্রফুল্ল নাটকের সবগুলি নর নারীই গভীর অভিজ্ঞতার সন্ধান, কিন্তু তার মধ্যে স্রষ্টার বিশেষ একটু স্নেহ ভজ্জহরির প্রতি — এখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মমতা মিশিয়াছে। ঐ রকম আর একটি চরিত্র আমার চোখে পড়িয়াছে — বৈকুণ্ঠের খাতার তিনকড়ি . . . ভজ্জহরি ও তিনকড়ি কালোর উপরে শাদার টান, নরকের দেওয়ালের ফাটল, মনুষ্যত্বের অস্বীকৃতির মধ্যে অর্ধব্যক্ত স্বীকৃতি, শয়তানের মুখে সংশয়ের ছায়া। উহারা নিজেরা হয়তো সাধুসজ্জন নয়, কিন্তু

৩৩৫। বাংলা সাহিত্যের নরনারী - প্রমথনাথ বিদ্যায়ী, ১৩৬০, পৃঃ ১৩।

৩৩৬। তদেব - - প্রমথনাথ বিদ্যায়ী, ১৩৬০, পৃঃ ৫১।

অভাবিত আচরণের দ্বারা শেষ পর্যন্ত সাধুত্বের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইতে বাধা দেয়। . . .
 দুঃখের আঘাতে কেহ সিনিক হয়, কেহ হিউমারিস্ট হয়, ভজ্জহরি সিনিক নয়, হিউমারিস্ট।
 দুঃখের আলখান্ধাটা উন্টাইলেই দেখা যায় যেন সেটা বিদুষকের চাপকান। দুঃখের মর্মজ
 ছাড়া কে কবে হাস্যরসিক হইয়াছে। হাস্যরস ও করুণরস অদৃষ্টের যমজসন্তান, একটু নিরিখ
 করিয়া দেখিলেই দুজনের মুখের আদল ধরা পড়িবে'। ^{৩৩৭} আসলে প্রমথনাথ শুধু মৌলিক
 সাহিত্যের স্রষ্টামাত্র নন, মৌলিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারক। এগুলির মধ্যে
 পাণ্ডিত্যের চেয়ে রস সাহিত্যিকের সৃজনশীল হাতের স্পর্শই বেশী পাওয়া যায়। লেখকের
 অধ্যয়নপুষ্ট চিন্তা, মৌলিক কল্পনা, স্নিগ্ধ কৌতুক ও স্বাভাবিক রসবোধের সমন্বয়ে প্রায়
 প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠেছে রম্য ও উপভোগ্য। রচনাগুলি হুস্বায়ত, কিন্তু তাদের বক্তব্য
 গভীর। লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও অন্তঃসন্ধানী। সাহিত্যিকের মেজাজ, সমাজচেতকের সন্ধানী
 চক্ষু ও শক্তিশালী গদ্য শিল্পীর হাত সমন্বিত হয়ে উক্ত চরিত্রগুলিকে করে তুলেছে অনবদ্য।
 সাহিত্যের চরিত্র চিত্রশালায় 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' নামক এই এলবামটি চিরকাল
 অম্লান হয়ে থাকবে বলেই মনে হয়।

'বিচিত্র সংলাপ' গ্রন্থখানি প্রমথনাথের সৃজনধর্মী কল্পনা-কুশলতার আর এক অসাধারণ
 পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গ্রন্থ নজিরহীন। একে ঠিক কোন ধরনের রচনা বলা
 যায় সে বিষয়ে লেখকেরই কোন নিশ্চিত ধারণা ছিল না। ভূমিকায় তিনি বলেছেন - 'এ
 রচনাগুলির শ্রেণী নির্ণয় সহজ নয়। এগুলি নাটক নয়, গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়, ইতিহাস বা দর্শন
 নয়, আবার রম্যরচনাও নিশ্চয় নয়, হয়তো সব মিলাইয়া একটা কিছু, তাই অন্য নামের
 অভাবে বিচিত্র সংলাপ। অবশ্য 'শারদীয় এসিয়া' [১৩৬০] পত্রিকায় প্রকাশিত [পৃঃ ৯৭]
 রামচন্দ্র ও জাবালির বিচিত্র সংলাপকে রস রচনা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম সং [১৩৬৫]
 মোট ২৫ টি সংলাপ ছিল। কিন্তু ২য় সং [১৩৭১] আরো ১৮ টি সংলাপ যুক্ত হয়।
 ১৩৭৯, 'শারদীয় কথা সাহিত্য' পত্রিকায় 'শকুনি ও মেনকা' নামে একটি সংলাপ প্রকাশিত
 হলেও পুস্তকে এটি স্থান পায় নি। এই গ্রন্থের শেষ সংলাপ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' পূর্বেই
 কথাসাহিত্য পত্রিকায় [কার্তিক ১৩৬৮, পৃঃ ১২১] প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত
 আয়তনের চেয়ে গ্রন্থে প্রকাশিত আয়তন অনেক ছোট। পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি
 কবিতাংশ ছিল, গ্রন্থে তা বর্জিত।

এই কাল্পনিক রসরচনাজাতীয় সংলাপগুলির মধ্যে অনেক সমালোচক ইংরাজী সাহিত্যের
 W. S. LANDOR এর Imaginary Conversations — গ্রন্থের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু
 বাহ্যিক রূপাদর্শ বা আঙ্গিক সাদৃশ্য ছাড়া এই দুয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পাওয়া যায়
 না। বরং Landor এর সংলাপগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই দীর্ঘায়িত। যেমন "Queen

Elizabeth and Cecil " সংলাপে এলিজাবেথের একটি সংলাপ প্রায় দুই পৃষ্ঠার কাছাকাছি । অথবা Boccaccio and Petrarce - - - তে বোকাচিও র একটি সংলাপ প্রায় তিন পৃষ্ঠার কাছাকাছি । এইরূপ সুদীর্ঘ সংলাপ উক্ত গ্রন্থে বহু লক্ষ্যগোচর হয় । এতে রচনাগুলির নাট্যমিতি ক্ষুদ্র হয়, তত্ত্বকথা ও একঘেয়ে বক্তব্যের ক্রান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় । ফলে সংলাপের আকর্ষণ ও মাধুর্য হ্রাস পায় । কিন্তু প্রমথনাথের সংলাপে এই দোষ বা ক্রান্তিকর একঘেয়েমি অলক্ষ্য । বরং সংলাপগুলি অসাধারণ ভাবগভীরতা ও ভাষাসম্পদে স্বল্প । কোথাও প্রেম, কোথাও কৌতুক, কোথাও বুদ্ধির দীপ্তি, কোথাও উপলব্ধির গভীরতা হৃদয়কে আন্দোলিত করে । সংক্ষিপ্ত, সংহত, অর্থঘন ও কাব্যসুরভিত সংলাপ প্রবাদের চারিত্র্যধর্মে সমৃদ্ধ । যেমন-

দুর্যোধন - আমি যুদ্ধকে ধর্ম মনে করি ।

শ্রীকৃষ্ণ - আমি বৃথা যুদ্ধকে অধর্ম মনে করি ।

দুর্যোধন - বৃথা কি বৃথা নয় তার বিচার করবে কে ?

শ্রীকৃষ্ণ - শুভবুদ্ধি ।

দুর্যোধন - দুপক্ষের শুভবুদ্ধিতে যদি না মেলে ।

শ্রীকৃষ্ণ - মিলতেই হবে । শুভবুদ্ধিতে মেলায় ।

দুর্যোধন - বাসুদেব, ক্ষুরধার তোমার বুদ্ধি ভারতবিদিত, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধার রসনায় নয়, অসিতে । তর্কে তোমার কাছে পরাস্ত হলাম ।

শ্রীকৃষ্ণ - তোমার স্বীকৃতি কি বর্তমান আলোচনা অবসানের ঘণ্টাধ্বনি ?

দুর্যোধন - বাসুদেবের বুদ্ধি যে ভারতবিদিত, একথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন ।

লেখকের অনুসরণে বলা যায় - 'এইগুলি আর কিছু নয়, আইডিয়া বা ভাবের বাহন ।' এই উক্তিটিই গ্রন্থটির যথার্থ পরিচয় বহন করে । পঁচিশটি সংলাপ রচনায় পঞ্চাশটি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সর্বকালীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দ্বৈত কথোপকথনের যে শব্দচিত্র আঁকা হয়েছে তা বিশেষ সরস ও সজীব হয়ে উঠেছে । তত্ত্বকথার সামান্য স্পর্শ থাকলেও মূলতঃ এগুলি রসরচনা । সুভাষিত, সুতীক্ষ্ণ, সারগর্ভ ও সরস সংলাপগুলি বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ ।

প্রমথনাথ একাধারে নাট্যকার, কবি ও কথাসাহিত্যিক । তাই নাটকীয় এবং কবিত্বপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে প্রাচীন ও আধুনিক অর্ধশত মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সুন্দর ভাবে অল্পকথায় রেখায়িত হয়েছে - ' যেসব বিখ্যাত ঐতিহাসিক বা সাহিত্যের চরিত্রকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কথা বলিয়েছেন - তাদের সংলাপের মধ্যে যে চরিত্রপ্রকৃতি ব্যক্ত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সত্য চরিত্র, এবং অতগুলি বিখ্যাত চরিত্রের মর্মে প্রবেশ করে প্রাণপাখীর সন্ধান

পাওয়া বিরল সাহিত্যিক অন্তর্যামিতের প্রমাণ'। ৩৬৯

সংলাপগুলিকে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়। কিন্তু আসল কথা অন্তর্দর্শনের সাহায্যে চরিত্রের মৌল স্বরূপের ইঙ্গিত দান - 'এখানে কথার ফুলঝুরি আছে, বাক্যের তরবারি আছে, কিন্তু এর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য হচ্ছে অন্তর্দর্শন'। ৩৭০

এই গ্রন্থের সংলাপগুলি যেন প্রমথনাথের সাহিত্য রচনা ও জীবন দর্শনের সূত্র বা সংকেত, যার ভাষ্য পাওয়া যাবে তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে। যেমন - 'সেখানে পিস্তুলীকৃত মানুষ আছে, ব্যক্তি নেই' [নেপোলিয়ন ও হিটলার]। এই কথার মধ্যে প্রমথনাথের চরিত্রপ্রীতির মূলসূত্র পাওয়া যায় - সাহিত্যে বা রাজনীতিতে সর্বদাই তিনি পিশুর পরিবর্তে মূর্তি, দলের পরিবর্তে ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধা করতেন। এই ধরনের বহু সূত্রের সন্ধান মেলে এই গ্রন্থে। সমালোচকের মন্তব্য তাই অনস্বীকার্য - 'এখানে চরিত্র ও ঘটনার প্রাধান্য নেই, কথকতাই বড় কথা। সংলাপ হয়েছে দৃষ্টিকোণ। চরিত্র এসেছে কথকতায় সহায়তা করবার জন্য... অর্থাৎ এই সংলাপ হল প্রমথ সাহিত্যের সরণি'। ৩৭১

(৫) বিবিধ : প্রমথনাথ মূলতঃ রোমান্টিক কবি হলেও নিছক কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। কল্পনা ও বাস্তবের এক আশ্চর্য সমাহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রতিভায়। সমকালীন যুগ ও জীবন সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁর আন্তরসত্তার যথাযথ পরিচয় অজানা থাকায় অনেকে তাঁকে বাঙালী বিদ্রোহী বলে মনে করেন। আসলে তিনি বাঙালী প্রেমিক। বাঙালী তথা বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প কলা প্রভৃতির সর্বাত্মক উন্নতি কামনা করতেন বলেই তিনি বাঙালীর দোষ-ত্রুটিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তার গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকথার সশ্রদ্ধ ভাষ্যরচনা করেছেন। এই পর্যায়ের কয়েকটি প্রবন্ধপুস্তক [বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, বাঙালীর জীবন সন্ধ্যা, বাংলার লেখক, বাংলার কবি] তারই সাক্ষ্য বহন করে। লেখকের ব্যক্তি মানসের গতি-প্রকৃতি, চিন্তা-চেতনা, সমসাময়িক যুগ জীবন, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা এই সব প্রবন্ধগ্রন্থের মূল উপজীব্য। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি অজস্র রচনার মধ্যে যে প্রমথ-প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে তার পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনের সম্যক পরিচয় নিহিত আছে এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে। ফলে এগুলির মূল্য বাংলা সাহিত্যে

৩৬৯। অর্যদত্ত - পূর্ণপুরস্কার - শঙ্করী প্রসাদ বসু - কথাসাহিত্য। শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ

১৪১২।

৩৭০। আশ্চর্য জীবন আশ্চর্য পৃথিবী - প্রবোধচন্দ্র ঘোষ - কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ

১৪৭১।

৩৭১। তদেব, পৃঃ ১৪৭১।

অসীম। মনীষী, জীবনজিজ্ঞাসু, যুগসচেতন, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠ মানস-মানচিত্র অঙ্কিত আছে এই প্রবন্ধগুলিতে।

প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক দলাদলি, সৃজনশীল অবসরজীবনের অভাব প্রভৃতি বর্তমান বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যকে পশ্চাদমুখী করে তুলেছে। সাহিত্যে সংকীর্ণতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত রেশারেশি জন্ম নিচ্ছে। ফলে আমরা শাঁস ফেলে ক্রমশঃ আঁঠির দিকে অধিকতর আগ্রহান্বিত হচ্ছি। লেখকের সিদ্ধান্ত আমাদের ভাবনার খোরাক যোগায়, হৃদয়বান মনীষীর মনন স্বাতন্ত্র্য আমাদের নূতন করে চিন্তা করতে শেখায়। যেমন - 'কোন বইখানায় কতগুলো তত্ত্ব, কতগুলো বাস্তব বা অবাস্তব ইজম আছে, তা দিয়ে বইখানার বিচার চলতে পারে না। বইখানার পেছনে যে লেখক আছেন তাঁর মনের উদারতা, শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এইগুলিই হচ্ছে গ্রন্থের আসল পটভূমি। লেখকের মনের গুণ লেখায় সঞ্চারিত হবেই। আজকার দিনে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বই লেখকের মনের দীনতার ছাপ বহন করছে'। ৩৭২

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের দুর্বোধ্যতা নেই অথচ সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে। ভাষার জটিলতার পরিবর্তে একটি স্বাদু মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও সরসতা আছে।

আধুনিক কবিতার নীরস, জটিল ও দুর্বোধ্য সত্তাকে সমালোচনা করেছেন তিনি। 'পাঠকে কেন আধুনিক কবিতা পড়বে। যে রচনায় মনের খাদ্য মেলে সাধারণে তাহাই গ্রহণ করে। আধুনিক কবিরা পাঠকের সেই মনের খাদ্য জোগাইতে পারিতেছেন কি? অনুভূতি ও উপলব্ধির উদার রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা উদ্ভট কল্পনার, অকারণ পাণ্ডিত্যের, ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর গলি ঘূঁজিতে কি প্রবেশ করেন নাই? সেই সংকীর্ণ, অন্ধকার, অপঘাতবদ্ধ পথে স্বভাবতই সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর'। ৩৭৩ আধুনিক কবিরা হয়তো এর বিপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেন, কিন্তু প্রমথনাথ যে দ্বিধাহীনভাবে পাঠকের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমালোচকের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় - 'গোটা ১৯ শতকের বাংলা সাহিত্যকে একালে আমরা প্রমথনাথের চোখ দিয়াই আবিষ্কার করিলাম। ঐ যুগের সকল কথা, সকল ভাব, সকল চিন্তা; ঐ যুগের প্রতিভা ও প্রত্যয় এবং সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগে তাহার বিচিত্র প্রকাশ সমস্তই যেন প্রমথনাথ প্রথম এক অখন্ড বস্তু হিসাবে আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়ান্নে'। ৩৭৪

৩৭২। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য - প্রমথনাথবিশী, ১৩৬৭, পৃঃ ৭।

৩৭৩। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য - প্রমথনাথবিশী, ১৩৬৭, পৃঃ ১১৪-১৫।

৩৭৪। সমালোচক প্রমথনাথ - ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত - কথাসাহিত্য, আশ্বিন, ১৩৭৩, পৃঃ ১৬৫৮।

'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', 'বাঙালীর জীবন সন্ধ্যা' প্রভৃতি পাঠ করলেই বোঝা যায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রমথনাথের যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ও অধিকার ছিল তেমনি বাঙালীর অধঃপতনে তাঁর ছিল গভীর সমবেদনা। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যের' [১৯৪৫] ভূমিকায় তিনি লিখেছেন - 'বাঙালীর অহেতুক আত্মগরিমায় আঘাত করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে বাঙালী আহত হইলে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইবে। আর তাহা না হইলে বৃথিতে হইবে যে আঘাত বোধ করিবার শক্তি ও তাহার চলিয়া গিয়াছে, তাহার অবস্থা একেবারে চিকিৎসার অতীত।'

'বাংলার লেখক', 'বাংলার কবি' প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রতিভাধর ব্যক্তিদের কয়েকজন সম্পর্কে বিশ্লেষণী অথচ সৃজনশীল সমালোচনা স্থান পেয়েছে। বাঙালীকে চিন্তে হলে, বাঙলাদেশকে জানতে হলে তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য। আর সাহিত্যকে বুঝতে হলে সাহিত্যিকদের মানসভূমি ও স্বরূপ উপলব্ধি প্রয়োজন। বাঙালীপ্রেমিক প্রমথনাথ তাই বিস্মৃতপ্রায়, স্বম্বালোচিত এবং অবহেলিত কিছু সাহিত্যিকের যথার্থ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। লেখকের রচনাকৌশলে মৌলিকতার ছাপ বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। বিস্তারিত বিশ্লেষণের পথে না গিয়ে শুধু লেখক বা কবিদের রচনা বৈশিষ্ট্যের ও স্বরূপ সন্ধানের ইঙ্গিতটুকু দিয়ে তিনি লেখনী সংবরণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত লেখক ও কবিদের প্রত্যেকের রচনাশৈলী, বাগবৈদম্ব্য, চরিত্রচিত্রণ-দক্ষতা ও নিসর্গ বর্ণনা-কৌশল স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ। প্রমথনাথ অনবদ্যভাষায় ও শিল্পকুশলতায় তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বাঙালী সাহিত্যরসিকদের কাছে কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হয়েছেন। তৎকালীন দেশকালপাত্র যেখানে উক্ত লেখকদের রচনায় ছায়াপাত করেছে, কিংবা তাঁদের রচনায় যেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে সেই সব ক্ষেত্রে আলোকপাত পরেই লক্ষ্য নেপথ্যে সরে গেছেন। এইভাবে পাঠকের মনে সাহিত্যানুসন্ধিৎসা ও রসপিপাসা জাগ্রত করাই প্রবন্ধকার প্রমথনাথের উদ্দেশ্য।

১৯৪৯ খৃঃ থেকে ১৯৬৯ খৃঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কমলাকান্তের আসরে' 'কমলাকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে প্রমথনাথ প্রতি সপ্তাহে দুটি করে বিচিত্র বিষয়ে অজ্ঞপ্ত লিখেছেন। এদের অধিকাংশই সাময়িক বিষয়কে অবলম্বন করে লঘুরসের বা বাঙ্গলকৌতুকের ছিটে দিয়ে রচিত হলেও কিছু কিছু রচনা সাময়িক স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর কারণ লেখকের সৃজনশীল কল্পনার ঐশ্বর্য ও ভাষাসম্পদ বহুক্ষেত্রে সাময়িক ও তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেই অসামান্য রসধারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সাহিত্যিক গদ্যের স্পর্শে অতি সাধারণ বিষয়বস্তুও অসাধারণ শিল্পশ্রী লাভ করেছে। এই সময়কার বিভিন্ন রচনা 'নানারকম', 'কমলাকান্তের আসর', 'কমলাকান্তের জন্মনা', 'বিচিত্র উপল' প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান লাভ

করেছে। এদের অধিকাংশের মধ্যেই বিচিত্রমুখী ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রমথ-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থসম্পাদক প্রমথনাথ বিশী : প্রবন্ধকার প্রমথনাথের সৃজনশীল বহুমুখী প্রতিভার আর এক পরিচয় মেলে গ্রন্থের সম্পাদনায়। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের মনে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ও সাহিত্যরসপিপাসা জাগ্রত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী। এই ব্রত পালনে তিনি চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন - (১) মৌলিক সাহিত্য সৃজন করা (২) অধ্যাপনাসূত্রে ছাত্রছাত্রীদের মনে সাহিত্যবোধ ও ঔৎসুক্য জাগ্রত করা। (৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বা স্বল্পখ্যাত অথচ শক্তিশালী লেখকের রচনা ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে সমালোচনা করা। (৪) টীকাভাষাযোগে, ভূমিকা সহ বিভিন্ন লেখকের মূল রচনাবলীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় সাধন করা। প্রথম তিনটি বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব সীমাহীন। কিন্তু চতুর্থ ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান নগণ্য নয়।

প্রমথনাথ সম্পাদিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ তালিকা নিম্নে লিপিবদ্ধ হল :—

১।	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	১৯৫৭
২।	কাব্যবিতান [যুগ্মসম্পাদক - তারাপদ মুখোপাধ্যায়]	১৯৫৭
৩।	ভূদেব রচনাসম্ভার	১৯৫৭
৪।	বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার	১৯৫৭
৫।	রমেশ রচনাসম্ভার	১৯৫৭
৬।	মাইকেল রচনাসম্ভার	১৯৫৯
৭।	সাহিত্য সম্পূট [সহযোগী সম্পাদক-বিজিত কুমার দত্ত]	১৯৬০
৮।	বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক [সহঃ সম্পাদক-বিজিত কুমার দত্ত]	১৯৬১
৯।	বিহারীলাল রচনাসম্ভার	১৯৬২
১০।	কান্তকবি রচনাসম্ভার	১৯৬২
১১।	গিরিশ রচনাসম্ভার	১৯৬৩
১২।	বঙ্কিম রচনাসম্ভার	১৯৬৫
১৩।	দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার	১৯৬৫
১৪।	ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার	১৩৭৪
১৫।	সাহিত্যচিন্তা [বঙ্কিমচন্দ্র]	১৩৭৫
১৬।	দীনবন্ধু রচনাসম্ভার	১৩৭৮
১৭।	হেমচন্দ্র রচনাসম্ভার	১৩৭৮
১৮।	গল্পবিতান [সহযোগী সম্পাদক - প্রণয় কুণ্ডু]	
১৯।	পলাশীর যুদ্ধ	
২০।	কমলাকান্তের দপ্তর	

২১। নীলদর্পণ

২২। স্বর্ণলতা

এই তালিকা থেকেই উপলব্ধ হবে যে নিজের বিভিন্নমুখী সৃষ্টিশীল লেখনীকে সচল ও সক্রিয় রেখে এবং চাকুরী বজায় রেখেও কতখানি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। দু'একটি বাদে ভূমিকাগুলির অধিকাংশই স্বল্পায়তন। কিন্তু তার মাধ্যমেই সম্পাদক প্রমথনাথ সার্থক ভাবে লেখক ও পাঠকের মধ্যে মানসিক যোগসূত্রটি নিবিড়তর করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই গ্রন্থগুলির মাধ্যমে পাঠক যেন লেখকদের নূতন করে আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সবিশেষ কৌতূহল বোধ করেছেন। তৎকালে উক্ত গ্রন্থাবলীর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। এখনও কিছু সম্পাদিত গ্রন্থ সমান জনপ্রিয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর একক সম্পাদনায় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হলেও, দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁর কোন কোন প্রিয় ছাত্র যোগ্যতার সঙ্গে এই কার্যে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। তবে সেগুলির অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক।

কাব্যবিতান, সাহিত্যসম্পূট, গল্পবিতান, পলাশীর যুদ্ধ, কমলাকান্তের দপ্তর, নীলদর্পণ, স্বর্ণলতা, প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তখন পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং তৎসাময়িক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই যে এদের ভূমিকা লিখিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিভাবান লেখকের হাতে সাময়িক প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই কালোত্তীর্ণ রসাস্বাদনে পরিণতি লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভারের ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রচলিত চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে নবতর ও গভীরতর মূল্যায়নে যত্নবান হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় পরিচয় যে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, পৌরুষের প্রতিমূর্তি, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, কুশলী ও অধ্যবসায়ী কর্মী। তাই ভাববাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদই ছিল তার সমসাময়িক প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধের একমাত্র হাতিয়ার। প্রমথনাথ অসামান্য দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে স্বল্পকথায় বিদ্যাসাগরের উক্ত স্বরূপটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন - 'বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর আন্তিক, নাস্তিক কিছুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একান্ত ভাবে practical — বিদ্যাসাগর বিদ্যার সাগর নন, দয়ার সাগর নন, তিনি কর্মী পুরুষ। কর্ম তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, কার্যকরী বুদ্ধি, তাঁহার চোখে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, তাঁহার সাহিত্য তাঁহার কর্মের রূপান্তর, তাঁহার করুণা কর্মের পাষণ্ড পূর্ণ নিগতি নিবারণী, এমন লোকের কাছে বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন মনে না হইয়াই পারে না। এমন লোকের কাছে মিলের কার্যদায়িনী শক্তি স্বরূপ তর্কবিদ্যা বেদান্তের প্রতিষেধক মনে না হইয়াই পারে না'। ৩৭৫

বিদ্যাসাগর বিশুদ্ধ কর্মের প্রেরণায় সচেতন উদ্দেশ্যসিদ্ধির তাগিদে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু কখন অজ্ঞান কর্মীর কলমে শিল্পীর করস্পর্শ লেগেছে, সচেতন উদ্দেশ্য নিরুদ্দেশ অনুভূতি প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে, বাংলা গদ্যের ভিত্তি সুগঠিত হয়েছে, ছন্দযতি ও অর্থযতির দোলায় শিল্পসুখমা ফুটে উঠেছে - তা বোধ হয় বিদ্যাসাগর নিজেও জানতে পারেননি। 'বঙ্কিমচন্দ্রে পৌছবার আগে ভাষার এমন বিচিত্র গতিছন্দ আর পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ছন্দে নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ ধ্বনিত। সেই ছন্দই নানাকলমে বিচিত্রতর হইয়া আজ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে। পদ্যে মধুসূদন যাহা করিয়াছেন, গদ্যে তাহা করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যছন্দের মধুসূদন'। ৩৭৬ ভূমিকার শেষাংশে সম্পাদক তাঁর মহতী উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেছেন - বর্তমানে বাঙালী সমাজের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছে যে বাঙালী বিদ্যাসাগর বিস্মৃত জাতি, বিদ্যাসাগরকে মনে করাইয়া দিতে সাহায্য করিবে ভরসাতেই বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার প্রকাশের আয়োজন'। ৩৭৭

বাঙালীর চিন্তা-চেতনা ও বাংলা গদ্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক বিদ্যাসাগরের প্রতি বর্তমান কালের প্রতিটি বাঙালীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাঁর সম্পর্কে সম্যক ও সত্যনিষ্ঠ ধারণা থাকা উচিত - এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই প্রমথনাথের এই সম্পাদকীয় কৃত্য।

দীনবন্ধু রচনাসম্ভারের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত। তার কারণ প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকৃত দীনবন্ধু বিষয়ক সমালোচনাত্মিক পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত বলে মনে করেন। তবে দুত্রকটি ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সামান্য বিরোধিতা করেছেন বা বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজসংস্কার নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও কাব্যাংশে তা উৎকৃষ্ট - 'তাহার কারণ এই যে গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে'। প্রমথনাথ এর বিরোধিতা করে জানিয়েছেন 'নবীন মাধব ও সৈরিন্দ্ৰী যে ভাষায় কথা বলেছেন সে ভাষা কি নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক? এমন হওয়ার কারণ সহানুভূতি যতই প্রবল হউক অভিজ্ঞতার অভাবে পূরণ করতে পারে না। নীলদর্পণের প্রথম দ্রুটি এই'। ৩৭৮ এছাড়া দীনবন্ধু কমেডি রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও সার্থক ট্রাজেডি রচনায় সফল হন নি। তাই 'নীলদর্পণের বেদনা Tragic নয় Pathetic'। ৩৭৯

সমাজ সংস্কার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়াতে দীনবন্ধুর পক্ষে উচ্চতম শিল্পতীর্থে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়নি। শিল্পের দাবী মিটিয়েও অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি সমাজের উপকার করতে

৩৭৬। বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার - ১৩৮২, ষষ্ঠ সংপূঃ।

৩৭৭। তদেব - পৃঃ ১

৩৭৮। দীনবন্ধু রচনাসম্ভার ১৩৭৮, পৃঃ।

৩৭৯। তদেব, পৃঃ।

পেরেছেন। দীনবন্ধু তা পারেন নি। তবুও সর্বজনীন সমবেদনা ও মানব প্রেমে সমৃদ্ধ দীনবন্ধু যে বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে যথার্থ দীনের বন্ধু ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রমথনাথ তাঁর প্রতি সেই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায়।

'হেমচন্দ্র রচনাসম্ভারে' হেমচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান - 'হেমচন্দ্রও তাঁর প্রতিভার ইঙ্গিত বুঝতে ভুল করেছিলেন। আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে তার বিশেষ পরিচয় নেই, বৃত্তসংহারে তো একেবারেই নেই। হেমচন্দ্রকে যথার্থভাবে পেতে হলে যেতে হবে কবিতাবলীতে, তবে সব কবিতাতে নয়। এমন কি ভরত সঙ্গীতেও নয়। সামাজিক ও সাময়িক ব্যঙ্গকবিতাগুলিতে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। অর্থাৎ কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের উত্তর পুরুষ নন, ইশ্বর গুপ্তের ধারাবাহী'। ৩৩০

'রমেশ রচনাসম্ভার' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথনাথ রমেশচন্দ্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান সমালোচনা করেছেন এবং পরিশেষে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে একটি তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন - 'বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের তিনজন major বা মহৎ ঔপন্যাসিক। রমেশচন্দ্রকে এই দলভুক্ত বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস সংসার ও সমাজের সাহিত্যিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। আবার সংসার ও সমাজকে সমস্যামূলক উপন্যাস বলিয়া ধরিলে গোরা ও ঘরে বাইরে তাহাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর, অনেক গভীর। বঙ্গবিজেতা অপরিণত রচনা। মাধবীকঙ্কণ নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ হইলেও ভাবাঙ্কতাদোষে দুষ্ট। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত জীবন সন্ধ্যা ও জীবনপ্রভাতের উপরেই তাহার সাহিত্যিক খ্যাতি নির্ভর করিবে'। ৩৩১

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি প্রতিভাকে প্রমথনাথ নাট্যপ্রতিভার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দান করেছেন। তাঁর আর্থগাথা ও আষাঢ়ে কাব্যদ্বয়ের আলোচনায় প্রমথনাথ অপূর্ব বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন - 'আর্থগাথায় যেমন বিত্তজ্ঞ গীতিমাধুর্যের নিছলক প্রকাশ, এখানে [আষাঢ়ে] তেমনি প্রকাশ নিদারুণ ব্যঙ্গ রসের। একটি ব্যক্তিমনের প্রকাশ, অপরটি সামাজিক মনের। অনেক সময়ে এ দুইগুণ একই মানসে থাকে, অনেক সময়ে থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা নহে, স্বাভাবিক অধিকারে ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গীতিমাধুর্য ও ব্যঙ্গরস দুটিই তাঁহার প্রতিভার

মৌলিক গুণ। মূলে দুইটিই ছিল এবং দুটি দুই উৎসমুখে নির্গত হইয়াছে'।^{৩৮২} সম্পাদক এখানে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার মৌল স্বরূপটি সযত্নে ও সম্যকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্পপরিসরে এই রচনাসম্ভারের ভূমিকাতেই প্রমথনাথের বিচার ক্ষমতা, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও কাব্যধর্মী গদ্যের পরিচয় সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন - 'আষাঢ়ে কাব্যে দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথমবার নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহার চালচলন, ভাব, ভাষা সমস্তই নূতন ও দ্বিজেন্দ্রীয়। ইহার গতিবিধিতে পাঙ্কীর তাল। নিরেট জোয়ান বেহারাগুলি নিছক গদ্য, কিন্তু তাহারা যখন তালে তালে পা মিলাইয়া সুর তুলিয়া চলিতে শুরু করে তখন একপ্রকার অনির্বচনীয়তা ধ্বনিত হয়। সেইটুকুই পদ্য। সেইটুকুতেই কবিত্ব। সেইটুকুতেই কবির শিল্পের জাদু। ফলতঃ ইতিপূর্বে আর কোন কবি গদ্যকে দিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে পদ্যের পাল্কি বহন করাইতে পারেন নাই'।^{৩৮৩}

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্যসম্পূট' নামক গদ্যসঙ্কলন গ্রন্থের ভূমিকাতে রসিক, মননশীল, যুগসচেতন ও সাহিত্য প্রেমিক প্রমথনাথের পরিচয় মেলে। চিত্র চরিত্র গ্রন্থে লেখক যেমন ঊনবিংশ শতকের মানস-মানচিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন এখানেও তাঁর উদ্দেশ্য তদনুরূপ - 'বর্তমান গ্রন্থে যে সব প্রবন্ধ সংকলিত হইল, তাহার পাঠে বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস'।^{৩৮৪} দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের রচনাবিশেষ সংকলিত করে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ক্রমবিকাশ, সমাজ-মানসের বিবর্তন ও গদ্যের রূপান্তর সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির সর্বত্র সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর স্পষ্টলক্ষ্য।

'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ সংকলন। ১৮০১ খৃঃ থেকে ১৯৪১ খৃঃ পর্যন্ত একশ চল্লিশ বছরের গদ্যসাহিত্য ও গদ্যরীতির বিচিত্র ক্রমবিকাশ ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। ২২০ পৃষ্ঠার অসাধারণ মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ৮১ জন লেখকের দুই শতাধিক রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে এই বিপুলকায় গ্রন্থে। এছাড়া আছে আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন, বিচিত্র সাময়িক বিষয়াশ্রিত বেনামা লেখকের কয়েকটি রচনা। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারাটি প্রমথনাথ গবেষকের নিষ্ঠা ও মনোযোগী পাঠকের কৌতূহল নিয়ে বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। ছোট বড় সকলেরই ব্যক্তিত্বের ও রচনারীতির মৌলিকত্বের স্বরূপটি সবিস্তারে ও সোদাহরণে আলোচনা করেছেন তিনি। বাংলা গদ্যের ধারাকে

৩৮২। দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার ১৩৭৮, ভূমিকা পৃঃ ॥

৩৮৩। তদেব, পৃঃ

৩৮৪। সাহিত্যসম্পূট - ১৩৭২, পৃঃ ৩১।

সম্পাদক কয়েকটি যুগের বন্ধনীতে স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। যেমন -

- ১। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ (১৮০০ - ১৮১৮)
- ২। সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের যুগ (১৮১৮ - ৪৭)
- ৩। বিদ্যাসাগরের যুগ (১৮৪৭ - ৬৫)
- ৪। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ (১৮৬৫ - ১৯৯৪)
- ৫। রবীন্দ্রনাথের যুগ (১৮৯৪ - ১৯৪১)

প্রতিটি যুগের বাংলা গদ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও হৃদয়স্পন্দনটি ধরিয়ে দিতে যত্নবান হয়েছেন প্রমথনাথ। তাঁর পাণ্ডিত্য, অন্তদৃষ্টি ও বিশ্লেষণকুশলতা এবং সর্বোপরি গভীর রসবোধ তাকে সার্থকতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

'কাব্য বিতান' গ্রন্থটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত মোট ১৬০ জন কবির কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। বাংলা কবিতার সর্বত্রই যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লিরিক সুরের প্রবাহ বহমান তা প্রমাণ করাই সম্পাদকের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থকে বাংলা কাব্যপ্রবাহের একখানি ক্ষীণ মানচিত্র বলে যে দাবী করেছেন সম্পাদক তা সর্বথা যুক্তিপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক কবিদের প্রতি অন্যত্র লেখকের যে অনীহা প্রকাশিত হয়েছে এখানে তার ব্যতিক্রম দেখি - 'একথা কেহ যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্রোত্তর বা আধুনিক কবিগণের কাব্যে কোন গুণ দেখিতে পাই নাই, কেবলই দোষ দেখিয়াছি। আদৌ তাহা নয়। পূর্বতন কাব্যসংস্কারকে ভাঙিয়া নূতন রীতি গড়িবার প্রচেষ্টা, ছন্দে, ভাষায় ও যতি স্থাপনে নূতন পরীক্ষা, বিষয়ে বৈচিত্র্য সাধন, ভাষায় অতিক্ষীতি দূর করিয়া দৃঢ়-স্পিনদ্ধ সংহতি সাধনের প্রয়াস, জ্ঞানের নূতন দিগন্ত হইতে অভিনব উপকরণ আহরণ করিয়া রসবস্তুতে পরিণত করিবার আগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা ইহারা নবীনতর কবিগণের সৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্মিলিত কীর্তির জন্য ইহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আর স্বকীয় কীর্তির জন্য অনেকেই বাংলাকাব্যেও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছেন'। ৩৬৫

'ভূদেব রচনা সম্ভারে' সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রমথনাথ অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে ভূদেবের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর দ্বারা ভূদেবের প্রতিভাকে যেমন স্বচ্ছতর রূপে প্রকাশ করা হয়েছে তেমনি সম্পাদকের মনীষা, রসবোধ, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। যেমন - 'ভূদেব আদর্শনিষ্ঠ, Idealist, বিদ্যাসাগর কমনিষ্ঠ, Practical - একজনের প্রশ্ন Why? অপরজনের জিজ্ঞাসা How? ভূদেব মানুষের মতো মানুষ, কিন্তু বিদ্যাসাগর নব্যমানুষ (Modern man)।' কিংবা — 'ভূদেব খনি হইতে সোনা তুলিয়াছেন,

বঙ্কিম সেই সোনাতে রচনা করিয়াছেন অপূর্ব মূর্তি। ভূদেব শ্রমিক, বঙ্কিম শিল্পী, দুয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণতা'। ৩৮৬

এই সব উদাহরণ থেকেই প্রমাণিত হয় যে প্রমথনাথ একদিকে যেমন অল্পকথায় বহুকথা বলার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন অন্যদিকে লেখকের প্রতিভা ও জীবনচেতনার রহস্যের প্রতি পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত করার সচেতন প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে তার ভাষা বহুক্ষেত্রে ইঙ্গিতময় ও ব্যক্তনাবাহী হয়ে উঠেছে। এককথায় বলা চলে যে বহুমুখী প্রমথ-প্রতিভা গ্রন্থ সম্পাদক হিসাবে রচনা-প্রাচুর্য, বিষয়-বৈচিত্র্য, বিশ্লেষণ-কুশলতা ও প্রকাশকলার বিচারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রমথনাথ বিশীর প্রতিভার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

(১) হাস্যরসিক প্রমথনাথ বিশী :

বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় প্রমথনাথ বিশী এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের প্রতি তার আকর্ষণ প্রবলতর হলেও সর্বপ্রকার হাস্যরসের ধারাতেই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার। করুণামিশ্রিত হাস্যরস, ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরস, বাগবৈদম্ব্য ও বুদ্ধিদীপ্ত হাসি এবং অমলিন কৌতুকহাসির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির বহিঃপ্রকাশ বেশী দেখা যায় প্রমথনাথের বিভিন্ন মুখী ও বিচিত্রস্বাদী রচনাবলীতে। সমকালীন যুগজীবন ও সমাজ প্রবাহের মধ্যে এর যথার্থ কারণ নিহিত আছে। নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে কর্মব্যস্ত, সমস্যাসঙ্কুল আধুনিক মানুষ সর্বদাই জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত ও ক্ষত বিধ্বস্ত। মানুষ তাই বর্তমান যুগে কিছুটা গোমড়ামুখো, গম্ভীর ও হাস্যবিমুখ। মানুষের মনে ও মুখে আনন্দ ও হাসির বড় অভাব। প্রমথনাথের ভাষায় - 'প্রবাহিত নদীতেই ফেনা দেখা যায় - হাসি তো জীবন স্রোতের ফেনা। আজ জীবনস্রোত শুষ্কপ্রায় - হাসি কেমন করিয়া সম্ভব। . . . বর্তমানযুগে হাসি জমিয়া গ্লেব হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যুগ Humour - এর যুগ নয় - এ যুগটা Wit এর অনুকূল। আমরা যদি এযুগে Humour - এর সন্ধান করি, নিরাশ হইব। যদি Wit এর সন্ধান করি, প্রচুর পাইব। যে যুগের যে নৈবেদ্য।

. . . Humour - এর মূলে করুণা, Wit এর মূলে বুদ্ধি, একটির আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, অপরটির আবেদন পাঠকের মস্তিষ্কে, একটি হাসিতে হাসিতে কঁাদায়, অপরটি হাসিতে হাসিতে ভাষায়। . . . এ যুগে প্রাণখোলা হাসি নাই বলিয়া যদি মন উজ্জ্বল করা হাসিকেও প্রত্যাখ্যান করি তবে নিবুদ্ধিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে'। ৩৬৭ আধুনিক যুগের হাসির মূল উপাদান 'Wit' ও 'Satire'। কৃত্রিমতাকে ব্যঙ্গ করে অকৃত্রিমতাকে পরিস্ফুট করে তোলা সার্থক স্যাটায়ারের কাজ। এর লক্ষ্য মানুষ, উপলক্ষ্য সমাজজীবন। মানুষের আত্মজ্ঞপিতাকে ব্যঙ্গ-বাণে আহত করে তার সংশোধন ঘটানোই এই ধরনের হাস্যরসিকের ব্রত। এ ব্রত সার্থক হয় তখনই যখন আহত হয়েও আহত ব্যক্তির মুখে একটি সরস হাসি চকচকিয়ে ওঠে। প্র. না. বি. বাগবৈদম্ব্যপূর্ণ ও প্রেবাত্মক হাস্যরসের সুযোগ্য স্রষ্টা। সমাজ ও মানুষকে লক্ষ্য করে তাঁর শানিত বাক্যবাণ ব্যঙ্গ রসে সিস্ত হয়ে মিছরির ছুরির মত একযোগে মানুষকে আহত ও আনন্দিত করে।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে প্রধানতঃ সৃষ্টির যুগ। কিন্তু বর্তমান যুগ মূলতঃ সমালোচনার যুগ। স্যাটায়াঁর সমালোচনার সগোত্র। আমরা বর্তমানে যে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার যুগে বাস করছি তার সাহিত্যিক পরিণাম স্যাটায়াঁর। আর বাংলাদেশের প্রাণধর্ম অনুসারে তা হয়ে উঠেছে রোমান্টিক স্যাটায়াঁর। প্রমথ বিশীর নাটকে, ছোটগল্পে প্রবন্ধে প্রচুর শ্লেষের সন্ধান মেলে। কিন্তু এই শ্লেষ দুর্বল কল্পনা বিলাসে পর্যবসিত হয় নি। এর মধ্যে একটি শক্তিশালী মানসিকতা, পরিশীলিত চিন্তা ও মার্জিত ভাষাসম্পদ তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে : - ' প্রমথবাবু ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক, কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গে পক্ষপাতিত্ব নাই এবং ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শোধান ও শাস্তির কোন অহেতুক সদিচ্ছাও তাঁহার নাই। . . . তাঁহার প্রতিভা পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্য সমুচ্ছল, সেজন্য তাঁহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণধার তরবারির মত চোখ ঝলসানো দীপ্তি বিকিরণ করিয়াছে। তাঁহার রসিকতার মধ্যে এমন একটি সুসংস্কৃত ও সুমার্জিত ভাব আছে যে তাহাতে আহত হইলেও না হাসিয়া পারা যায় না। ' ৩৮৮

সুধী সমালোচক সুবোধ ঘোষ প্রমথনাথকে 'বিদগ্ধ রসিক মনস্বী' আখ্যা দিয়েছেন। শ্লেষ ও মনস্বিতার এক অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যগোচর হয় প্রমথসাহিত্যে। আর এই শ্লেষ ধ্বংসমুখী নয়, সৃজনশীল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রমথনাথও সুন্দরকে সাকার করে তুলতে বিকারের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হেনেছেন। শাস্ত্রের ভক্তি যেমন আসলে ভক্তি আশ্রয়ী ভাবনার প্রকাশ, তাঁর শ্লেষও একটি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। পেশী বহুল সৌষ্ঠব ও কায়িক বলিষ্ঠতার সঙ্গে একটি অন্তঃশীলা বিবেকবোধ ও মানসিক চেতনা ওতোপ্রোত হয়ে আছে। 'বর্তমানের বাংলা সাহিত্যে মনস্বিতার এই শাস্ত্র ধারার পরিচয় সন্ধান করতে গিয়ে সবার আগে যাঁর কথা মনে পড়বে, তাঁর নাম বর্তমান বাংলার শিক্ষিত সাধারণ সকলেরই কাছে একটি পরিচিত নাম শ্রী প্রমথনাথ বিশী। বলা বাহুল্য প্রমথনাথের মনস্বিতার উজ্জ্বল প্রদীপটি বিশেষ কোন একটি প্রকোষ্ঠের সম্পদ নয়। তাঁর প্রতিভার রশ্মি সাহিত্যের সকল ঘর আলোকিত করেছে . . . দেখে খুশি হয়েছি তাঁর লেখনীর শক্তির সামান্য আঘাতে মতবাদের ঔদ্ধত্য, মিথ্যা কাব্যিকতা ও কপট আধুনিকতার স্পর্ধা কিভাবে মুষড়ে পড়ে ও আর্তনাদ করে। যে শ্লেষ অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা তিনি তারই মহৎ অধিকার লাভ করে সাহিত্যের একটি মহৎ রূপনা সম্ভব করেছেন '। ৩৮৯

আপাতদৃষ্টিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপবাণে সজ্জিত প্রমথনাথকে নির্মম বলে মনে হয়। কিন্তু

তাঁর এই আপাত নির্মমতার অন্তরালে আছে যুক্তিনিষ্ঠ একটি মন। তাঁর আঘাত সমাজহিতব্রতী সেই মনেরই অভিমানস্কন্ধ প্রকাশমাত্র। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অন্যায় ও অসংহতি আজ ক্রমবর্ধমান বন্ধিমের মানসশিষ্য কমলাকান্তরূপী প্রমথনাথের কশাঘাত তারই বিরুদ্ধে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রমথনাথ বিদুষকের মুখোশ পরলেও তিনি বিদুষকের পোষাকে ভবিষ্যদ্বক্তা। এই জন্যই তার ব্যঙ্গ-রস চটুল কৌতুক নয়, গভীর অন্তর্জালার রূপান্তর। অনেকক্ষেত্রে বন্ধিমের কমলাকান্তের স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমকেই মূর্ত হতে দেখি প্রমথনাথের কমলাকান্তের মধ্যে। বন্ধিমচন্দ্রের কমলাকান্তের হাসি অনেকক্ষেত্রেই কামার বিকল্প - 'তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়া ছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না' [কমলাকান্তের বিদায়]। প্রমথনাথের কমলাকান্তও ব্যথিত অন্তরে বলেছেন - 'চোখের জল অন্তরের তাপে বাষ্প হইয়া পুঞ্জ, পুঞ্জ উঠিতেছে। দূর হইতে হঠাৎ তাহাকে হাসি বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়'। [দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।১১।৫৬ - কমলাকান্তের আসর]। 'প্রমথনাথের পরিহাস তাঁর মুখোশ, বিজ্ঞতা তাঁর বর্ম। অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই আছে অসহায়, সঙ্গকামী, বিপন্নবিস্ময়ে ভরা একটি রোমান্টিক মন'।^{৩৯০}

বাগবৈদগ্ধ্য ও শ্লেষে দক্ষ হলেও নিছক কৌতুকহাস্য বা করুণামিশ্র, নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্যরসও প্রমথ সাহিত্যে বিরল নয়। বহু ছোটগল্পের মধ্যে তার পরিচয় মেলে। কমলাকান্তের আসরেও এর পরিচয় অবিরল নয়। যেমন - 'বাঙালীর নিমন্ত্রণের ভোজ্যপাত্র হইতে লুচি, পোলাও, সন্দেশ, রসগোল্লা, দধি, পায়ের প্রভৃতি রথী মহারথীগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। একমাত্র তুমিই সকলদিক রক্ষা করিয়া মান সম্মান বজায় রাখিয়াছ। হে রাধাবল্লভী তোমাকে নমস্কার করি'।^{৩৯১}

প্রমথনাথের হাস্যরসসৃজন কৌশলের মধ্যে একটি হল নামকরণের বিশেষত্ব। উদ্ভট, বিরোধাত্মক, অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত নামকরণের দ্বারাই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌতুকরসের অবতারণা করে থাকেন। বিসদৃশ ও কৌতুকর নামকরণের প্রতি পাঠক সহজেই আকৃষ্ট হয়। যেমন, -নাটক -ঋণং কৃত্বা, ঘৃতাং পিবেৎ, মৌচাকে টিল, পরিহাসবিজলপিতম্, কর্ণমর্দন; গল্প -শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, একখানা তক্তপোষ ও চারজন মানুষ, চোখে আঙুল দাদা, ভারতীয় ব্যাঘ্র ও ভারতীয় নৃত্য, বাঘদত্তা, ভেজিটেবল বোমা, ন. ন. লৌ. ব. লিঃ, পক্ষীরাজ গাথা। আধুনিক সাহিত্যিকরা প্রাণখুলে হাসতে বা হাসাতে অক্ষম। তাই তাঁরা হাসির কথা বলেন মুখ গোমড়া করে। এদিক থেকে প্রমথনাথ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি বনেদী বাঙালী মনের

৩৯০। কথাসাহিত্য - ১৩৭৩ - প্রবোধচন্দ্র ঘোষ - পৃঃ ১৪৬৪।

৩৯১। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩।১২।৬৪, - কমলাকান্তের আসর।

উত্তরাধিকারী। তাই সেকেলে সাহিত্যিকদের মতো তাঁর কাজের কথাতেও হাসি মেশানো থাকে - 'সব অবস্থাতেই তাঁর মেজাজ হল বৈঠকী আলাপের। মিষ্টকথা, ইষ্টকথা, শিষ্টকথা - সব তিনি বলেন হাসির ছিটে দিয়ে। বাঁকা কথা, চোখা কথাতেও বাদ পড়ে না এটা'।^{৩৯২} প্রমথনাথের মতো বাকপটু ও রসিকবক্তা বিরল। তিনি রসরচনায় তাই সিদ্ধহস্ত ও সিদ্ধবাক। প্রমথনাথের মুখ ও তাঁর কলমের মুখ উভয়ই সর্বদা হাস্যমুখর। হাসি ছিল তার জীবন ও লেখনীর সঙ্গে ওতোপ্রোত। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন - 'সংসারে হাসির বড় দরকার। . . . জীবনের আহাৰ্য্যে হাসির লবণটুকু না পড়িলে সবই কেমন যেন স্বাদহীন হইয়া যায়। পরিমিত শুভ্রহাসি জীবনভোজের শুভ্র সৈন্ধব লবণ'।^{৩৯৩} প্রমথনাথের হাসির মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। তা কখনও ভাবায়, কখনও মাতায়। শ্লেষ ও বাগবৈদম্ব্য ভাবায়, কৌতুক মাতায়। পরিহাস বিজলপিতম নাটকের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পেশার শিক্ষিত মানুষরা [সাংবাদিক, সমালোচক, ডাক্তার, সম্পাদক, মেয়র, রাজনীতিক] তাঁদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও দুর্বলতার জন্য লেখকের বিদ্রূপ - বাণে বিদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষণে প্রকটিত হয়েছেন। আবার ঋণ কৃত্তা বা ঘৃতং শিবং নাটকের বহুক্ষেত্রে প্রেমের ভুলভ্রান্তি, মিথ্যাসন্দেহ, অসঙ্গতি, আতিশয্য প্রভৃতি নিয়ে নির্ভেজাল কৌতুক করেছেন। কিন্তু তাঁর মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন রসচি, পরিশীলিত নগর মনস্কতা ও সূক্ষ্ম বাগবৈদম্ব্য দীনবন্ধু অমৃতলাল প্রভৃতি হাস্যরসিকদের তুলনায় তাঁকে মহত্তর করে তুলেছে। বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মেজাজও মানসিকতার সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অপেক্ষা প্রমথনাথের ব্যঙ্গের আঘাত আপাতদৃষ্টিতে তীব্রতর ও কঠোরতর মনে হয়। প্রমথ চৌধুরীর মত তিনি ছিলেন মননশীল রসিক। তবে শব্দ ও কথার মারপ্যাচে তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো জটিল ও বুদ্ধিজীবিনির্ভর হয়ে পড়েন নি। তাঁর বাগবৈদম্ব্য অবশ্য সর্বদাই ছিল দীপ্তোজ্জ্বল, চাঁচাছোলা ও মার্জিত - 'যে Dry wit - তাঁর কথায় সেই dry wit তাঁর রচনায়। এই dry wit - এর উৎস তাঁর মননে এবং সে মনন কল্পনাশ্রয়ী'।^{৩৯৪}

আবার সরস কৌতুকহাস্যের উৎস অব্যাহত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', 'পুরানো সেই দিনের কথা' প্রভৃতি স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে এবং অধিকাংশ উপন্যাসে। যেমন - 'সাঁওতাল ছেলেরা ডিম বেচিতে আসিত। খান দুই পুরানো ধুতি দিয়া ডিমগুলি সংগৃহীত হইল। খুব সম্ভব নিজেদের ধুতি দিই নাই - রোদে মেলিয়া দেওয়া বহু ধুতি ছিল, তারই খান দুই দিয়া ফেলিলাম।

৩৯২। কথাসাহিত্য - ১৩৭৩, পৃ: ১৩৩৮ - নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

৩৯৩। বিচিত্র উল্ল - প্রমথনাথ বিশ্বী - পৃ: ৭।

৩৯৪। কথাসাহিত্য, আশ্বিন, ১৩৮৯ পৃ: ১৪০৫ - রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

তারপরে সমস্যা, ডিমগুলি খাওয়া যায় কি প্রকারে . . . মাঠের মধ্যে গর্ত করিয়া ডিমকেকটি পুতিয়া রাখিলাম । ঘরে আনিবার উপায় নাই, কাপ্তেনের সর্বভেদী দৃষ্টি আছে । সারারাত্রি ডিমের চিন্তায় ঘুম হইল না, কোন কুকুটমাতাও বোধ করি ডিমের জন্য এমন দৃষ্টিভায়ে রাত্রি কাটায় না ' । ৩৯৫

প্রমথনাথের চেহারায় কোন লালিত্য বা মাধুর্য ছিল না, বরং কাকর্ষ্য ও গাষ্ট্রীয় ছিল । কিন্তু তাঁর মনটি ছিল সরস ও সজীব - এ যেন টিনের কৌটায় প্যাককরা ঘনীভূত মধু । তবে তাঁর প্রথম জীবনের কোন কোন রচনায় মধুর চেয়ে হল বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে । যেমন ১৩৪১, শ্রাবণ সংখ্যা, 'শনিবারের চিঠি' তে 'মনজুয়ান' নামক ব্যঙ্গকাব্যে মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলের উপরই কিঞ্চিৎ শ্লেষকটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে -

কাব্য লিখেছিল বটে কবি মাইকেল
আজো কেহ অর্থতার নারিল করিতে,
রবির কবিতাগুলো যেন সাইকেল
অভ্যাস ব্যতীত কেহ না পারে চড়িতে ।

নবীনের কাব্যগ্রন্থ যেন বাইবেল
দেখিলে সম্মুখে মাথা না চায় নড়িতে,
হেমচন্দ্র লিখেছিল বৃত্তের সংহার

আজো তাহা করে কত ছাত্রের সংহার । [৭ম সর্গ]

পরে অবশ্য এই অযৌক্তিক ব্যঙ্গের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন । এটাকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরলে বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরসের ধারায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতির যুগ অতিক্রান্ত । পরে অমৃতলাল বসু, রাজশেখর বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণ ব্যঙ্গরচনায় আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন - ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহতী প্রতিভার উদয় হয়েছে । আরো পরবর্তীকালে সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী ব্যঙ্গ শিল্পীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন । কিন্তু তুলনামূলকভাবে প্রমথনাথের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তাঁর ব্যঙ্গে আঘাতের তীব্রতা থাকলেও না হেসে পারা যায় না । তাছাড়া তাঁর ব্যঙ্গের ভাষা অত্যন্ত পরিণীলিত এবং রুচি বিশেষ মার্জিত । তাই তিনি কখনো নির্দয়, দুর্মুখ, চোখে আঙুল দাদার ভূমিকা গ্রহণ করেন নি । সৃজনশীল মননকল্পনা ও মানবপ্রেমের অকৃত্রিমতা তাঁকে সার্থক হাস্যরসিক রূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছে ।

অবশ্য সর্বত্র লঘু হাস্য পরিহাস প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পোৎকর্ষের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। যেমন 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে বর্ণিত কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরির ব্যাপারে দাদা নীতির প্রতি বক্র কটাক্ষ উপন্যাসটির সংহতি ও রস-পরিণতির পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। কিংবা 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্টে' অলবেঙ্গল লোন অফিসের বিভিন্ন চরিত্রের মুখরোচক, চটুল, পরিহাসপূর্ণ আলোচনা কাহিনীর পক্ষে মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। 'মহামতি রামফাসুড়ে' উপন্যাসের শেষে ২২ ছত্রের রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি কথাসাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে ছিদাম বহুরূপী, বোবা আশ্বর, পুটি, বাণীবিজয়, বেঙা চৌকিদার প্রভৃতি চরিত্রগুলির মাধ্যমে উদ্ভূত কৌতুকরস উপভোগ্য হলেও কাহিনীর অবাধ গতি, সংহতি ও রসগাঢ়তার অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রমথনাথ সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকারের হাস্যরস পরিবেশন করেই কর্তব্যশেষ করেন নি। হাস্যরসের একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তিনি অতৃতীয় লেখক। কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডে, 'টুলি' কবিতায় প্রমথনাথ হাসির স্বরূপ সঙ্কানে ব্রতী হয়েছেন। এইভাবে হাসির দার্শনিক বিশ্লেষণ ও নান্দনিক তাৎপর্য আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যে একান্ত বিরল।

বুদ্ধিভিত্তিক ব্যঙ্গ-হাস্যের অনুরক্ত হলেও প্রমথনাথ জানতেন যে কৌতুক হাস্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। টুলি কবিতায় সেই নির্মল, শুভ্র, সংযত কৌতুকহাস্যের সর্বাঙ্গিক প্রভাবের কথা এবং বিশ্বচরাচরের মধ্যে সেই হাসির অনাবিল প্রভাব সম্পর্কে গভীর অথচ সহজ, সরল ব্যাখ্যা করেছেন। এ যেন হাসির বিশ্বরূপদর্শন। হাস্যরসিক শিল্পী, সাহিত্যিক ঈশ্বরের হাস্যস্বরূপের অগ্রদূত। হাসির উৎস অব্যাহত করে সে এই জগৎ সংসারের দুঃখ বেদনাময় অন্ধকারকে করে তোলে আলোকোদ্ভাসিত। হাসির শ্মিত আভাষ অসুন্দর হয়ে ওঠে সুন্দর, দুঃখ পরিণত হয় আনন্দে। লবণ ছাড়া যেমন ব্যঞ্জন স্বাদহীন, হাসিকে বাদ দিলে তেমনি জগৎ অপূর্ণ, সংসার শান্তিহীন। প্রমথনাথ হাসিকে নিছক মুখভঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন নি, তিনি হাসিকে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ঈশ্বরের করুণা ও একান্ত ঈঙ্গিত বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর হাসি কৃত্রিম নয়, স্বভাবজ। তাঁর সম্ভবিধ রচনার মধ্যেই দেখা যায় স্বভাবসুন্দর হাসির স্বতঃস্ফূর্ত উৎস —

ঝরণা যেমন

আপনার রসধারা করে বিতরণ

হাসির মল্লিকাপুষ্পে, এ লোক তেমনি। (টুলি)

নিষ্পাপ সারল্য ও দৈববিভূতি না থাকলে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য ফুটে উঠতে পারে না।

হাস্যরসিক তাই ঈশ্বরের দূত —



বিশ্বমহাকাব্য প্রভু রচে দিনরাত
সে রচে নিয়ত টীকা, চির মল্লিনাথ,
মল্লিকার শুভ্র হাস্যে। তার সহযোগে

দুর্জয় এ কাব্যলাগে মানুষের ভোগে। (টুলি)

কিংবা - ভারী নৌকা লঘু হয় নদীতে ভাসিলে,

দুঃখ হান্ধা হয়ে যায় বারেক হাসিলে। (টুলি)

প্রমথনাথের নাটকে ডাক্তার, উকিল, সম্পাদক প্রভৃতির প্রতি যে বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে তাতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হলেও তাদের রোগী, মকেল বা পাঠকদের মুখে যে শ্মিতহাসি ও মনে খুশীর জোয়ার দেখা যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হাসির মনের স্বাস্থ্যবর্ধক। কিন্তু বর্তমানে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা উচ্চহাসির উচ্চকিত প্রকাশ বা কৌতুক হাস্যের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার প্রায় অদৃশ্য। এখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা চাপা হাসির প্রাধান্য। ফলে হাসির অস্ত্র এখন শানিত ও তীক্ষ্ণতর। কৃত্রিম সভ্যতার নাগপাশ, স্বার্থপর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং সমাজের নানাবিধ জটিলতা বা যুগ যন্ত্রণা হাসির ফোয়ারাকে ক্রমশঃ শুকিয়ে ফেলছে। ফলে যুগের দাবীতেই প্রমথনাথের লেখনীতে বাগবৈদম্ব্য ও ব্যঙ্গের আধিক্য আত্মপ্রকাশ করে। নগর সভ্যতা বা নাগরিক মনস্কতার এটি একটি অনিবার্য ফলশ্রুতি। প্রমথনাথের এই শ্লেষাত্মক ও বাগবৈদম্ব্যপূর্ণ হাস্যরসের আবেদন মূলতঃ এক শ্রেণীর শিক্ষিত, মার্জিত, বুদ্ধিজীবী পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে তুলনামূলক বিচারে তাঁর কৌতুক ও কারুণ্যসিক্ত হাস্যরসের ধারা প্রায় সকলের জন্যই অব্যাহত। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর অবদান তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

(২) ছদ্মনামের আড়ালে প্রমথনাথ বিশী :

বিভিন্ন কারণে, সাহিত্যে ছদ্মনাম গৃহীত হয়ে থাকে। অনেক উদীয়মান ও যশোলিপ্ত সাহিত্যিক পাঠকসমাজে প্রথম আবির্ভাবেই জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ছদ্মনাম গ্রহণ করে থাকেন। নামের গোপনতা বা বৈচিত্র্যের আকর্ষণে পাঠক সহজেই কৌতুহলী হয়ে ওঠে, রহস্যের গন্ধ পায়। ভাবে সাহিত্য সরোবরের কোন বিখ্যাত রুই কাতলা বোধ হয় নামের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে।

অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিক তাঁর পৈত্রিক নামটিকে শোভন ও সুন্দরতর করার জন্য ছদ্মনাম গ্রহণ করে থাকেন। যেমন নাট্যকার মলিয়ার নামটি বেশ মোলায়েম। কিন্তু এটি তাঁর ছদ্মনাম, আসল নামটি বেশ দুরূহা ও নীরস। (জেন ব্যাপটিস্ট পকলিন)।

অনেক সময় কোন পত্রিকা সম্পাদনার সময়ে সম্পাদককেই একাধিক বিষয়ে একাধিক লেখা দিয়ে পত্রিকা পূর্ণ করতে হয়। তখন তিনি একাধিক ছদ্মনাম গ্রহণ করে

নিজেকে পাঠকদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন।

আবার নির্ভুর সম্পাদকের মন গলানোর জন্য পুরুষ লেখক অনেকসময় মহিলার ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে নারীর মূল্য প্রবন্ধ রচনা করেন।

সমালোচনার অঙ্কুশে অন্যকে কঠোর আঘাত হানার প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে ছদ্মনাম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্য 'উপযুক্ত ভাইপোস্য' বা 'উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন; সরকারী রোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটকে 'কস্যাচিং পথিকস্য' এবং তার অনুবাদে মধুসূদন 'by a Native' - - ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

রচনায় বৈচিত্র্য আনতে অনেকক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও নামকরণে নূতনত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে কবিতা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন, হালখাতা লিখতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনাম এবং রম্যরচনা ও প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে চার্লস ল্যান্স 'এলিয়া' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

আবার বহুক্ষেত্রে ছদ্মনামের আড়ালে লেখকের আসল নাম হরিয়ে যায়। যেমন- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [আসল নাম প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], গোর্কি [আসল নাম - আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ], মার্ক টোয়েন [আসল নাম - স্যামুয়েল এল ফ্রেমেনস]।

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের ব্যবহার চলে আসছে বিগত একশত সত্তর বছর ধরে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [প্রমথনাথ শর্মা], কালীপ্রসন্ন সিংহ [হতোম প্যাঁচা], প্যারীচাঁদ মিত্র [টেকচাঁদ ঠাকুর] প্রভৃতি ছদ্মনামে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাঁচুঠাকুর' প্রভৃতি একাধিক ছদ্মনামে খ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলা সাহিত্যে বহু খ্যাত, অখ্যাত লেখক বহু ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। প্রমথনাথ বিদ্যুৎ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে ১৪ টি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি ছদ্মনাম গ্রহণই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এই সঙ্গে এই ছদ্মনামের একটি তালিকা সম্মিবেশিত হলো।

	সাল	পত্রিকা	রচনা	ছদ্মনাম
১।	চৈত্র, ১৩২৮	প্রভাত	হারা	নীহারিকা
	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯	বিশ্বভারতী	রাজধানী	নীহারিকা
২।	১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১	পনিবারের চিঠি (সাপ্তাহিক)	নবকথামালার গল্প	শ্রী বিষ্ণু শর্মা

৩।	শৌখ, ১৩৩৮	শনিবারের চিঠি (মাসিক)	নাটক	প্র. না. বি.
	৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪৪	দৈনিক যুগান্তর	' এক কলম ' শুভে বাসাস্বক	প্র. না. বি.
	— ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৫।		রচনা ও রম্যরচনা	
৪।	শৌখ, ১৩৩৯	শনিবারের চিঠি (মাসিক)	মনজুদান	ডক্ট টমসন
৫।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪০	শনিবারের চিঠি	' এককলম ' শুভে প্রবন্ধ	শ্রী অমিত রায়
	জ্যৈষ্ঠা, ১৩৪১ বৈশাখ, ১৩৪১	শনিবারের চিঠি	রম্যরচনা	শ্রী অমিত রায়
	শ্রাবণ, ১৩৪৪ মাঘ, ১৩৪৫	বঙ্গপ্রী	' চিত্র চরিত্র ' শুভে	শ্রী অমিত রায়
			মধুসূদন বিষয়ে প্রবন্ধ	
৬।	মাঘ, ১৩৪১	শনিবারের চিঠি	পুরাতন পত্রিকা [কবিতা]	কস্যাচিং
৭।	১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৯	— দৈনিক আনন্দবাজার	' কমলাকান্তের আসর ' কমলাকান্ত শর্মা	
	১৭ই নভেম্বর, ১৯৬৯	পত্রিকা	শুভে বিবিধ রচনা	
৮।	১৩৩৮ - ৫৯	কথাসাহিত্য	৩টি ভৌতিক ছোট গল্প	তিথ্যতীবাবা
	সাল	পত্রিকা	রচনা	ছদ্মনাম
৯।	মাঘ, ১৩৫৮	কথাসাহিত্য	' প্র. না. বির পাতা ' শুভে প্রবন্ধ	শ্রী মর্কট
১০।	চৈত্র, ১৩৬৪	ওকতারা	অমানুষ বিবেক (কবিতা)	হাতুড়ী
১১।	মাঘ, ১৩৬৫ —	কথাসাহিত্য	' মূর্খের দপ্তর ' শুভে	শ্রী মূর্খোত্তম
	অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬		বাসাস্বক প্রবন্ধ	
১২।	২৪ নভেম্বর, ১৯৬৯ —	দৈনিক আনন্দবাজার	' পরিহাস বিজ্ঞপ্তিতম ' মাধব	
	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১	পত্রিকা	শুভে বিবিধ রচনা	
১৩।	আষাঢ়, ১৩৮৫—	কথাসাহিত্য	কলকাতার বাঁশিওয়ালা	রামকহল শর্মা
			[মিনি মহাকাব্য]	

১৪। — 'সমুচিত শিক্ষা' গল্প সংকলন ভূমিকা শ্রী নীলকণ্ঠ শর্মা
উপরিউক্ত ছদ্মনামগুলি গ্রহণের কারণ ও পটভূমিকা বিশেষ আলোচনা সাপেক্ষ।
এখানে এই বিষয়ে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হলো।

১। **নীহারিকা** - নীহারিকা বা শিশিরের সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। প্রতিভার উন্মেষলগ্নে তাই এই নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবির খরতাপে এই প্রতিভা সকলের সামনে প্রতিভাতনাও হতে পারে। এই ছদ্মনামটির মধ্যে প্রমথনাথের রোমান্টিক কবিপ্রতিভার ইঙ্গিত মেলে। ছায়া ও রাজধানী কবিতা দুটিও তাঁর রোমান্টিক কবি কল্পনার ধারক ও বাহক। নীহারিকার মধ্যে ভাবী প্রতিভা সমুদ্রের আভাস মেলে। ছদ্মনামটি বিন্দুতে সিদ্ধ দর্শনের ব্যাঙ্গনা সমৃদ্ধ।

২। **শ্রী বিষ্ণু শর্মা** - সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নীতিমূলক গল্পরচনায় পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মার কৃতিত্ব অসাধারণ। বিপথগামী মুখ রাজকুমারদের মনে স্বপ্নসময়ে

যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সন্তানদের দুর্নীতিসর্বস্ব জীবন ধারা দর্শনে পীড়িতচিত্ত প্রমথনাথ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আচার্য বিষ্ণু শর্মার ছদ্মনামে সরসগল্পের মাধ্যমে ও ছোট ছোট নীতিকথার সাহায্যে বাঙালীকে নৈতিক শক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং এইভাবে চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যের আধুনিকীকরণ দ্বারা এক নবতর সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন শারদীয় পত্রপত্রিকায় 'কথামালার নবায়ণ' বিভাগে এই প্রচেষ্টারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্যগোচর হয়। সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে বিষ্ণু শর্মা ছদ্মনামধারী প্রমথনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। প্র. না. বি. - নামের আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে চিহ্নিত হওয়ার প্রচেষ্টা মনে হয় জর্জ বার্নার্ড শ এর জি. বি. এস ছদ্মনাম গ্রহণের অনুসরণে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য প্রমথনাথের পূর্বেই এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন র. ল. ব. [রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়] র. না. ঠা. [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছদ্মনামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বহুগান, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন] প্রভৃতি। আশাপূর্ণা দেবী প্র. না. বি. ছদ্মনামটিকে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। যেমন (ক) প্রকৃষ্ট নাম বিশারদ (খ) প্রচ্ছন্ন নামে বিখ্যাত এবং (গ) প্রত্যক্ষ নামে বিদ্যেবী। [কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ-১৩৫৯]। প্রমথনাথ বেশী ব্যঙ্গাত্মক নাটক ও ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্র. না. বি. ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। কিছু কিছু প্রবন্ধেও এই নাম মেলে। তবে সৃজনধর্মী সাহিত্য যথা কবিতা, উপন্যাস, রসরচনা বা রসাত্মক সমালোচনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্র. না. বি. ছদ্মনামটি ব্যবহৃত হয় নি। হাস্যরসিক প্রমথনাথ বাঙালী জাতিকে হাসাবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কারণ লোককে কঁাদানো খুব সহজ, কিন্তু হাসানো খুবই কঠিন। জগতের সর্বত্র, বিশেষতঃ আমাদের জীবনে হাসি বড় দুর্লভ। আর এই হাসি পরিবেশনের জন্য লেখক নিজে প্র. না. বি. নামক মুখোশের আড়ালে আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপে পটু হলেও যথার্থ হাস্যরসিকের মতো মানুষের যেখানে দুর্বলতা ও অসঙ্গতি দেখেছেন তার উপর স্বচ্ছ পরিহাসের আলো ফেলে যথার্থ রূপটি প্রস্ফুট করে তুলেছেন। তাঁর প্রকাশের ধরণটা লঘু হলেও দৃষ্টি গভীর।

৪। স্কট টমসন - বায়রণের 'ডন জুয়ান' কাব্যের অনুসরণে প্রমথনাথ এই বিদেশী ছদ্মনামের আড়ালে 'মনজুয়ান' নামক অষ্টসর্গযুক্ত একটি ব্যঙ্গ-কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রমথনাথ চিরকাল প্রচলিত মতের বিরোধী ছিলেন। ফ্যাসনের বিরোধিতা করা তাঁর কাব্যনিয়তি। কিছু কিছু সাহিত্যিক ও সমালোচক লেখক ও পাঠকদের মন জুগিয়ে চলতে অভ্যস্ত। তাই তাঁদের ব্যঙ্গ করে তিনি মনজুয়ান লিখেছিলেন। এই ছদ্মনামে প্রমথনাথ আধুনিক গদ্য কবিতার তথ্যসর্বস্ব, ভাবগভীরতাবর্জিত, নীরস, নির্জীব সন্তাটিকে

ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। পরিকল্পনা মতো লেখাটি সমাপ্ত না হওয়ায় পুস্তকাকারে এই কাব্যটি প্রকাশিত হয় নি। রোমান্টিক কবি প্রমথনাথের কলমে এই ব্যঙ্গকাব্য যেন কিছুটা বেমানান। এ যেন জোর করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা। পরবর্তীকালে এই অপরিণত রচনাটি সম্পর্কে নিজেই স্ফোচ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন— 'শনিবারের চিঠিতে মনজুয়ান বলে এক স্যাটায়ায় কাব্য লিখেছিলাম। গ্রন্থাকারে ছাপা হয় নি। ভাগ্যে হয় নি। হলে সর্বনাশ। ছত্রে ছত্রে তার লাইবেল'।^{৩৯৬} পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতি চিত্রণে'ও 'স্টট টমসনের' উল্লেখ আছে।

৫। শ্রী অমিত রায়—রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার নায়ক অমিত রায়ের সংলাপগুলি ছিল শানিত, উজ্জ্বল ও মসৃণ। কর্ম বিমুখ ও বাকপটু এই যুবকটি কথার মারপ্যাচে বুদ্ধির বাহাদুরী দেখায়। সে নিজেকে রবীন্দ্র বিদ্বেষী বলে জাহির করলেও মনে মনে ছিল রবীন্দ্র ভক্ত। প্রমথনাথ এই ছদ্মনাম গ্রহণের মাধ্যমে অসাধারণ বাগবৈদগ্ধ্য, কুশলী শব্দপ্রয়োগ নৈপুণ্য ও অন্তর্লীন রবীন্দ্রভক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাগবৈদগ্ধ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের রসায়ন ঘটিয়ে প্রমথনাথ অমিত রায়ের মতোই ফ্যাসানের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও স্টাইলের প্রতি অনুরক্তি দেখিয়েছেন। এইভাবে রবীন্দ্রশিষ্য প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়কের নাম গ্রহণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

৬। কস্যাচিৎ—সজনীকান্ত দাসকে কেন্দ্র করে ১৩৪১ সালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার অফিস যখন সরগরম ছিল তখন সেখানে নিয়মিত উপস্থিত হতেন বিভিন্ন বিখ্যাত সাহিত্যিক। প্রমথনাথ ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁদের সকলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কলমের দ্বারা একটি আঁচড়ে কৌতুকের ছটায় উদ্ভাসিত করে নিপুণ হাতে একটি বড় কবিতা রচনা করেছিলেন প্রমথনাথ। 'পুরাতন পঞ্জিকা' নামক এই কবিতায় 'কস্যাচিৎ' ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে সকলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই ছিল কৌতুকপ্রিয়, সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও রসিক প্রমথনাথের প্রধান উদ্দেশ্য। 'প্রমথবাবু সে সময় বঙ্গশ্রী আসরের কয়েকজনকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন - সম্পূর্ণ বেনামী। কবিতাটির নাম ছিল পুরাতন পঞ্জিকা। . . . এর মধ্যমণি সজনীকান্ত। তারপর কিরণকুমার রায়, নিখিলচন্দ্র দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল প্রভৃতি অনেকের চরিত্র। এই চরিত্র চিত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যায়। স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনেকেরই বেশ ফুটে উঠেছে'।^{৩৯৭} যেমন -

৩৯৬। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃ: ১৩৭৩।

৩৯৭। স্মৃতিচিত্রণ - পরিমল গোস্বামী।

গাই নন তবু তিনি ভাগলপুরের
 শালকর নন, তবু হৃদয়পুরের
 কে শালীবাহন রাজ ? উদ্ভিদ নহেন,
 বটানিক আখ্যা তবু স্বনামে বহেন,
 বৃন্দাবনে ছিল জোর নাম ডাক তাঁর
 বীজানু বিজয়ী তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ।
 হাসিতে মধুটি যার কবিতায় হল
 কাব্য আগাছার গাছে যিনি বনফুল ।
 সাহিত্যিক সমিপাতগ্রস্ত ওগো দাদা
 তব ব্যবহার লাগি রচিনু এ ধাঁধা,
 নামটি সাথেই দিনু খুঁজে দেখ ভাই
 এক ছেড়ে দুইবার হয়েছে বলাই ।

৭। কমলাকান্ত শর্মা - বঙ্কিমভক্ত প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তাটিকে গ্রহণ করে আনন্দবাজার পত্রিকার আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । কৌতুকে, কৌতুহলে, দেশপ্রেমে, শোষিতদের প্রতি দরদে, কবিকল্পনায় ও বাগবৈদগ্ধ্য এই সব রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরী । যদিও বঙ্কিমের কমলাকান্তে যে চিরায়ত দার্শনিক সন্তা ও কবিসন্তার সম্মিলন লক্ষ্যগোচর হয় এখানে তা অনুপস্থিত । সাময়িক এবং দৈনিক পত্রিকার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিছক সংবাদ পরিবেশনে পরিণত হয়েছে । কোথাও কোথাও অবশ্য কিছু পরিণত মনের ছাপ, স্থায়ী চিন্তা, গভীর কল্পনা ও ভাবঘন সুরের রেশ প্রতিফলিত হয়েছে । তিনি যে স্বদেশ প্রেমিক তথা ভারত প্রেমিক ছিলেন এবং মূলত একজন বড়দরের কবি-সাহিত্যিক ছিলেন তার বহুল পরিচয় মেলে এই আসরের পাতায় পাতায় । যেমন - 'কমলাকান্ত ধনী নয়, মানী নয়, জ্ঞানী নয়, এমনকি ধার্মিকও নয় । কোন গৌরবই তাহার নাই । তাহার একমাত্র গৌরব সে ভারতবাসী । [বৃহস্পতিবার ৪ঠা মে, ১৯৫০ আনন্দবাজার পত্রিকা, কমলাকান্তের আসর]

২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমলাকান্ত' - শিরোনামে একটি সুন্দর কবিতা আছে —

কবিকে বলা হয় স্রষ্টা
 তুমি সৃষ্টি করেছ আমার দেশ
 নিমের শাখা নুয়ে পড়া
 আমার গাঁয়ের পথটি

কাঁকন বাজা দীঘির ঘাট,
শর্ষে ক্ষেত্রের মৌমাছির দল !
এ সব দেখেও দেখিনি ।
আজ আর দেখবার উপায় নেই;
তাই দেখছি তারা স্বপ্নের মতো সত্য,
কাব্যের মতো সুন্দর ।
স্বার্থের মতো শাস্ত ।
এ সবই তোমার সৃষ্টি ।
নৈরাশ্যের কণ্ঠ থেকে
জয়ধ্বনি শুনে নাও
অক্ষয় হয়ে থাক তোমার কাব্য ।
সেখানে আমার যে দেশ
রচিত হল
কারো সাধ্য নাই তাকে স্পর্শ করে ।
কারো সাধ্য নাই তাকে খণ্ডিত করে,
তোমার কাব্যের মতোই সে অক্ষয় !
উদ্ধাস্তকে দিয়েছো বাসা
নির্বাককে দিয়েছো ভাষা
নির্জিতকে দিয়েছো ভালোবাসা ।
তাদেরই কণ্ঠে তোমার
জয়ধ্বনি শুনে নাও ।
অক্ষয় হোক তোমার কাব্য,

কে আমাকে করে দেশছাড়া । [৭।৫।৫০-আনন্দবাজার পত্রিকা]

এই কবিতার মধ্যে কমলাকান্তরূপী প্রমথনাথের রবীন্দ্রপ্রীতি ও ভারতপ্রীতি একান্ত ।
এই ভারত একাধারে বস্তু ও ভাবের সমন্বিত মূর্তি । প্রমথনাথ যথার্থই বলেছেন
'কমলাকান্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়, সে একটি আইডিয়া । বঙ্কিমচন্দ্র এই আইডিয়ার
স্রষ্টা, তারপরে কালে কালে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর এই আইডিয়া ভর করেছে ।'
[১৯।৮।৬৫ - আনন্দবাজার পত্রিকা]

৮। *তিস্বতী বাবা* - তিস্বতের সাধু সন্ত লামার দল বিবিধ অলৌকিক ক্ষমতার
অধিকারী । সম্ভবতঃ এই কারণেই কয়েকটি অলৌকিক রসের গল্পরচনার জন্য প্রমথনাথ
এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন ।

৯। *শ্রীমকট* - এই ছদ্মনামটির সঙ্গে প্রমথনাথের ক্রোধ ও ক্ষোভ বিজড়িত । এর

নেপথ্যকাহিনীটি নিম্নরূপ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকুরী প্রার্থী ছিলেন একই সঙ্গে প্রমথনাথ ও মোহিতলাল। বাংলাবিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মোহিতলাল চিঠি দিয়ে প্রমথবাবুর বিরুদ্ধে বিমোদগার করেন এই বলে যে সাহিত্যে প্রমথনাথ শুধু মর্কটের মত দাঁত খিঁচিয়ে লোক হাসানো ছাড়া আর কিছু পারে না। পরে শ্রীকুমার বাবু ঐ চিঠিটি প্রমথনাথকে দেখান। এ ছাড়া বঙ্গবাসী কলেজের ক্লাশে ছাত্রদের কাছে মোহিতলাল প্রমথনাথকে অত্যন্ত অশোভনভাবে মর্কট বলে উপহাস করেছিলেন। প্রমথনাথ ছাত্রদের কাছ থেকে তা শুনবার পর এবং উক্ত চিঠিটি পড়বার পর সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং শ্রীমর্কট ছদ্মনামে মোহিতলালের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন ও দীর্ঘ বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

১০। হাতুড়ী - কঠোর লৌহনির্মিত হাতুড়ী প্রয়োজনে যে কোন জিনিস ভেঙে শুড়িয়ে দিতে সমর্থ। সমাজের মধ্যে তখন এত অসাম্য, দুর্নীতি, অনাচার ও মনুষ্যত্বের অভাব দেখা দিয়েছিল যে প্রমথনাথ তার বিরুদ্ধে হাতুড়ী ছদ্মনামে শক্ত হাতে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'অমানুষ বিবেক' কবিতাটির বক্তব্য বিষয় উক্ত মন্তব্যের সমর্থক। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারা যাতে দেহে মনে শক্ত হয় এবং দৃঢ়চিত্তে অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি ছোটদের পত্রিকা শুকতারায় এই ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন।

১১। শ্রীমূর্খোত্তম - বিনয়বশতঃ ও কৌশলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ নিজে বিজ্ঞতম হওয়া সত্ত্বেও মূর্খোত্তম ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

১২। মাধব্য - মাধব্য ছিলেন শকুন্তলা নাটকের রাজা দুহ্মন্তের বিদুষক। বিদুষক আসলে সুস্বন্দর্শী বিবেক। তার চোখ এড়ানো সহজ নয়। সে শুধু হাস্যরসের দীপ্তিতে জীবনকে উদ্ভাসিত করে না, মানুষের শুভবোধকে জাগ্রত করে। এযুগের জনগণ যদি প্রমথনাথ নির্দেশিত হাস্যরস নিষিক্ত পথের রেখা অনুসরণ করে চলে তবে তাদের সামগ্রিক কল্যাণ হবে। তাই প্রমথনাথ মাধব্য ছদ্মনামে 'পরিহাস বিজ্ঞিতম' নামক আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আসলে সে কমলাকান্তের আসনেই অধিষ্ঠিত। তবে মাধব্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে আর কমলাকান্ত জাতীয়তাবাদের পক্ষে। লক্ষণীয় যে, গুরুগড়ীর আলোচনার ক্ষেত্রে লেখক শুধু 'মাধব্য' এবং হাস্যপরিহাসমুখর আলোচনার ক্ষেত্রে 'পরিহাস বিজ্ঞিতম - মাধব্য' কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। মাধব্য নামে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনাও করেছেন লেখক। অনেক লেখায় মধ্যবিস্ত, বুদ্ধিজীবী বাঙালীর প্রশংসাও আছে।

কালিদাসের মাধবের মতো প্রমথনাথ জীবনকে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই

তিনি জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। জীবনের প্রতি তাঁর অনাসক্ত কৌতুকহাস্যের হিল্লোলে প্রকাশ পায় যে তিনি জীবনশিল্পী। একাধারে তিনি শিল্পী ও দার্শনিক। প্রমথনাথের মাধব্যের মধ্যে একটি কবিমানস ও শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩। **রামকহল শর্মা** - রামকহল শর্মা হিন্দী ভাষী কোন ব্যক্তির নাম। কলকাতায় ভিন্নভাষাভাষী মানুষের প্রাচুর্য ক্রমবর্ধমান। হিন্দী ক্রমশঃ অন্যভাষার উপর কৌশলে প্রভাব বিস্তারের ফন্দী করছে। এছাড়া বাংলাকাব্য যেভাবে দ্রুত গদ্য কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে পদ্যছন্দে কবিতা রচনার জন্য হিন্দী ভাষীদের উপরেই হয়তো নির্ভর করতে হবে। এইরূপ দুঃখ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই প্রমথনাথ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় এবং সমিল ও স্বচ্ছন্দ কাব্যরচনার মাধ্যমে গদ্যকবিতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। তবে অসুস্থতা বশতঃ এই কাব্যটি সমাপ্ত হয় নি।

১৪। **শ্রী নীলকণ্ঠ শর্মা** - সমুচিত শিক্ষা নামক গল্প সংকলনে প্রমথনাথ আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক অব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নীলকণ্ঠ শর্মা ছদ্মনামে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যঙ্গ-গল্প রচনায় তাঁর স্বীয় অধিকারের কথা পরোক্ষে পাঠকদের গোচরে আনতে চেয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আজীবন শিক্ষক ছিলেন - বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কাজেই শিক্ষা সংক্রান্ত ক্রটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার তিনি উপযুক্ত অধিকারী। নীলকণ্ঠ যেমন সমস্ত গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করেছেন, প্রমথনাথও তেমনি শিক্ষা ও সমাজ সংক্রান্ত সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতিকে অব্যাহত করে বাঙালীর জীবনের সর্বস্তরে শুভবোধ ও উন্নতির প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন।

(৩) **প্রমথনাথ বিশী : ব্যক্তি ও যুগজীবন।**

প্রতিটি সাহিত্যিক স্বতন্ত্রব্যক্তিত্বের অধিকারী। কোন সাহিত্যিকই তাঁর যুগকে অস্বীকার করতে পারেন না। ব্যক্তি ও যুগজীবনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি; অতীত ও বর্তমান সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা; জীবনযাপনের নিত্য নূতন আয়োজন ও রূপান্তর; বিচিত্র, বিষমের সংঘর্ষ ও সমন্বয়; গ্রাম ও শহর, বিজ্ঞান ভিত্তিক সভ্যতা ও প্রকৃতির উদার আতিথ্য; বুদ্ধি ও অনুভূতি, চিন্তা ও চেতনা, প্রচলিত ভাব ও ভাষা; পুণিগত বিদ্যা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা যে কোন সাহিত্যিককে কমবেশী প্রভাবিত করে থাকে।

অবশ্য একথা ঠিক যে প্রতিভার তারতম্য ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের ফলে কোন সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন যুগস্রষ্টা ও যুগদ্বন্দ্ব, আবার কোন সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন যুগের সৃষ্টি। বাংলাসাহিত্যে যুগদ্বন্দ্ব সাহিত্যিক বলতে আমরা মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও

রবীন্দ্রনাথকেই বুঝি। তাঁরা প্রতিভাবে সাহিত্যের প্রচলিত ধারাকে নূতনখাতে প্রবাহিত করেছেন এবং ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে সেই মহান ভাবনায়কদের যুগ হয়েছে বিগত, এখন বহু স্বল্প শক্তিসম্পন্ন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। এটাই বর্তমান কালের যুগধর্ম। কিন্তু এই সাহিত্যিকগণ সকলে প্রতিভার মহত্বে উচ্চাসনের অধিকারী না হলেও অনেকেই যে বিশিষ্ট ও শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আধুনিক কথাটি অত্যন্ত আপেক্ষিক। কারণ এককালে যা আধুনিক ছিল আজ তা অতীতের কুক্ষিগত। আবার আজ যা আধুনিক আগামীকাল তা অতীত অভিধায় চিহ্নিত হবে। কিংবা আজ যা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আগামী দিনে তাই হয়ে উঠবে আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন - 'আধুনিকতা কাল নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে।' আসলে প্রতি যুগের নিজস্ব ভাব-ভাবনা, ভাষা সম্পদ ও রীতি প্রকরণ থাকে যাকে এড়ানো সমসাময়িক কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। প্রমথনাথের সাহিত্যেও সমকালীন যুগজীবন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবল সমসাময়িক যুগের দাবী মেটানোর মধ্যে যে সাহিত্য সীমাবদ্ধ থাকে তা কখনো চিরকালীন রসপিপাসা নিবৃত্ত করতে বা অমরত্ব অর্জন করতে পারে না। প্রমথনাথ আধুনিক হলেও মূলতঃ আনন্তিক। সমকাল স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই তাঁর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হলেও তিনি প্রতিভাবে তাকে চিরকালের সম্পদ করে তুলেছেন।

প্রমথনাথের ছাত্রজীবনেই বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনে চরম অবক্ষয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। বিদেশী শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গে এদেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যন্ত্র সভ্যতার তীব্র আলোড়ন দেখা দিয়েছে। পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তুলেছে। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, মদ্যস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাংলা তথা ভারতের চারিদিকে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতালাভের পরেও সমাজের অবক্ষয় রুদ্ধ হয় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে চলেছে চরম নৈরাজ্য। চোরাকারবার, কালোবাজারী, ঘুষ ও অন্যান্য দুর্নীতি সমাজকে আট্টেপুটে বেঁধে ফেলেছে। ছিন্নমূল উচ্ছাস্তর দল পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভাসমান ঝড়কুটোর মতো চলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। তাঁদের দুর্দশা সীমাহীন। হিন্দী ভাষার আধিপত্য কায়ম করার জন্য বাংলা ইংরাজী প্রভৃতির গুরুত্বহ্রাস করা হয়েছে। কেরানীর চাকুরীতে নিবদ্ধলক্ষ্য বাঙালী স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পিছু হটেছে, অন্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগে বাংলাদেশে জাঁকিয়ে বসেছে।

রাজনৈতিক কৌন্দলের প্রভাবে সাহিত্যে শিল্পে দলাদলি ও গোষ্ঠীবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। গণসাহিত্যের নামে সংকীর্ণ মতবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে। যুগজীবনের এই সব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে প্রমথনাথের বহুবর্ণবিশিষ্ট সাহিত্য-মুকুরে।

যুদ্ধের বাজারে একদল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি কিভাবে রাতারাতি ধনী হয়েছে, কিভাবে স্বাধীনতা যোদ্ধার মিথ্যা প্রশংসাপত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত পারমিট জোগাড় করেছে এবং চরমতম দুর্নীতির শ্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'পারমিট' নাটকে। সমাজের সর্বত্র ঘুয়ের ফলাও কারবার চিত্রিত হয়েছে 'ন - ন - লৌ - ব - লিঃ' ছোটগল্পে এবং 'ঘুঘু লই কেন?' রম্যরচনায়।

ব্রহ্মার হাসি, গভীর, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, শৃঙ্গালের মনুষ্যত্ব বর্জন প্রভৃতি গল্পে লেখক মনুষ্যত্বের বিকৃতি প্রদর্শন করে যে সুতীর কশাঘাত হেনেছেন তাতে তাঁর যুগসচেতন মানসিকতা ও মানবপ্রেমের পরিচয় বিধৃত আছে। বাঙালীর মৎসপ্ৰীতি ও ছাত্রপড়ানোর মত উজ্জ্বল বৃত্তির যন্ত্রণা চিত্রিত হয়েছে 'গভীর ইলিশ', 'টিউশন' প্রভৃতি গল্পে। এছাড়া 'একগজ মার্কিন ও এক চামচ চিনি', 'গদাধর পণ্ডিত', পূজাসংখ্যা, মোটর গাড়ী, ঘোগ, অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ, ইয়াসিন শর্মা এন্ড কোং, কৃষ্ণনারায়ণ সংবাদ, তিমিস্রিল, চোখে আব্দুল দাদা, ব্রাকমেল প্রভৃতি অসংখ্য ছোটগল্পে তৎকালীন সমাজ জীবনের বিচিত্র আলেখ্য চিত্রিত হতে দেখা যায়। নানাবিধ রুচিবিকৃতি ও অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সমাজকে, জাতিকে ক্রমশঃ অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জ্ঞানীশুণীদের চেয়ে চিত্রতারকাদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এখন ক্রমবর্ধমান; 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' গল্প তারই পরিচায়ক।

পরিহাস বিজ্ঞিতম নাটকে সাংবাদিক, অধ্যাপক, ডাক্তার, মেয়র, সম্পাদক প্রভৃতির যে হাস্যকর ছবিটি আঁকা হয়েছে তা যুগজীবনের মূল শ্রোতের অন্তর্ভুক্ত। মৌচাকে ঢিল নাটকে রাজনৈতিক নেতাদের বাকসর্বস্বতাকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কাব্য গ্রন্থাবলী ২য় খন্ডের অন্তর্ভুক্ত ত্রিশঙ্কু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির ও কুরু এবং 'কুরুক্ষেত্রের পরে' কবিতাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় লিখিত। 'বিয়াল্লিশের কথা' কবিতাটি সুপ্রসিদ্ধ বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত। বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে মনে হয় এটি একমাত্র কবিতা।

উপন্যাসের মধ্যে সমকালীন যুগের প্রতিফলন অনিবার্য। 'বঙ্গভঙ্গ', 'পনেরোই আগষ্ট' স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মানুষের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় অবলম্বনে রচিত হয়েছে। 'নীলমণির স্বর্গে' যন্ত্র - সভ্যতার প্রসারে মানুষের কোমল অনুভূতিরাজির সঙ্কোচনজনিত সমস্যার কথা চিত্রিত হয়েছে। 'পূর্ণাবতার' পৌরাণিক উপন্যাস হলেও আধুনিক সামাজিক বৈষম্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শিক্ষার প্রসারে, জীবিকার তাগিদে, যুগের প্রয়োজনে মানুষ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে পড়ছে। ফলে এ যুগের সাহিত্যে অনিবার্যভাবে বাগবৈদম্ব্যপূর্ণ হাস্যরস (Wit) - ও ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের (Satire) প্রাধান্য প্রকট হয়ে উঠছে। প্রমথনাথের সাহিত্যের বহুতর তার সন্ধান মেলে। হৃদয়ানুভূতির স্থান যে এ যুগে ক্রমশঃ যুক্তি, বুদ্ধি, বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি অধিকার করে নিচ্ছে তার প্রমাণ মেলে প্রমথনাথ বিশীর নাটক, ছোটগল্প ও বহু প্রবন্ধে বা রম্যরচনায়। করুণাঘন হাস্যরসের স্থলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপপূর্ণ হাস্যরস অশনিভরা বিদ্যুতের মতো চিস্তকে আলোকোজ্জ্বলিত করে তোলে - এটা প্রমথনাথের সমকালীন যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাজেই প্রমথনাথ যে যুগসচেতন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপন স্বাধসিদ্ধির তাগিদে দেশসেবার নামাবলী গায়ে যেসব বুদ্ধিগামি রাজনীতে করে থাকে তাদের চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন তিনি 'আমায় দেগো মন্ত্রীগিরি' প্রবন্ধে [নানারকম - পৃঃ ১৬৭]

কিন্তু অপরের সমালোচনার মধ্যেই প্রমথনাথের ব্যঙ্গ রচনা নিঃশেষিত হয় নি। তিনি আত্মসমালোচনাও করেছেন। শিক্ষক হয়েও শিক্ষা ও শিক্ষকের অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে তাঁর মতো এমন নিরপেক্ষ সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে দুলভ - 'দেশশুদ্ধ লোকের ময়লা কাপড় কাচার ভার আমাদের উপর - আমরা আধ্যাত্মিক ধোপা'। ৩৯৮ বর্তমানের সমাজ যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, তার উন্নতি যে কেউ চায় না সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই - 'জাতি গঠন কেউ চায় না - সকলেই চায় নিজের নিজের স্বার্থ। গভর্ণমেন্ট চায় মন্ত্রীত্ব বজায় রাখতে, লীডাররা চায় নিজের দল বজায় রাখতে, সাংবাদিক চায় কাগজের গ্রাহক সংখ্যা ঠিক রাখতে, দেশের লোকে চায় - কি চায় জানি না, বোধ করি বিনা হাস্যমায় জীবনযাপন করতে। কারো উপরে কোন ভার নেই, কারো কোন দায়িত্ব নেই - সব ভার এই মাস্টারদের উপর'। ৩৯৯

বাঙালী জাতি যে ক্রমশঃ হুজুগের বন্যায় ভেসে প্রাচীন গৌরবের আসন থেকে চ্যুত হয়ে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে যুগসচেতন ও স্বজাতি প্রেমিক প্রমথনাথ তা ব্যথিতচিত্তে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই যুগযন্ত্রণা - কাতর চিন্তের প্রতিভাস মেলে 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', 'নানারকম', 'কমলাকান্তের আসর' প্রভৃতি গ্রন্থে।

রাজনীতির ঘোলা আবর্তে কত সরলপ্রাণ, তরলমতি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হচ্ছে তা আজকের যুগের সকলেরই পরিজ্ঞাত। প্রমথনাথ এই বিষয়ে কতখানি সচেতন ও সংবেদনশীল ছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে 'রাজনৈতিক ভূত' প্রবন্ধে [নানারকম পৃঃ ১৫৫] এবং কমলাকান্তের আসরের বিভিন্ন প্রবন্ধে। যেমন - 'ইচ্ছা করে গৃহশীর্ষ

হইতে তারস্বরে ঘোষণা করি, অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, অনভিজ্ঞতা ও আদর্শবাদকে exploit করা সব Exploitation - এর চরম, ওর চেয়ে জঘন্য সামাজিক মনোবৃত্তি আর সম্ভব নয়। ইচ্ছা হয় চীৎকার করিয়া বলি ছাত্র সমাজকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদের দলীয় রাজনীতির মধ্যে তাহাদের টানিয়া আনিও না, এমনকি শিক্ষার মান উন্নতির জন্যও শিক্ষার্থী সমাজে ধর্মঘট ঘটাইও না, যে ডালে সকলের আশ্রয় সেই ডালে করাত চালনা হইতে ক্ষান্ত হও। কিন্তু বলি - ই বা কাহাকে আর শুনিবেই - বা কে ?^{৪০০}

কমলাকান্তের আসরের প্রায় প্রতিটি রচনায় সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতিকে রঙ্গ ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উদ্বাস্তুদের সমস্যা, হিন্দু কোড বিল, জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ে বিতর্ক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নানাবিধ সমস্যা, সাহিত্যিক-শিল্পী-সংঘ তৈরীর সমস্যা, ত্রিভাষা-ফরমুলা সমস্যা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা, সমকালীন নাটক ও নাটমঞ্চের সমস্যা, জাতীয় সংহতি, ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের পরিবর্তন ও বিবিধ সমস্যা, পণপ্রথা, পরিভাষা সমস্যা, সাহিত্যে শিল্পে শ্রীলতা-অশ্রীলতা - প্রভৃতি বিবিধ, বিচিত্র সমকালীন যুগজীবনের কথা প্রমথনাথের হৃদয়তন্ত্রীতে যে অনুরণন সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় মেলে কমলাকান্তের আসরের ও অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে।

চিত্রচরিত্র গ্রন্থে প্রমথনাথ যেমন ১৯ শতকের বিভিন্ন মনীষী সম্পর্কে সুস্বন্দর্শী মূল্যায়ণ করেছেন, তেমনি তাঁর সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতাদের মৃত্যু বা স্মৃতিচারণা উপলক্ষে তিনি যে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় আর কারো কলমে দেখা যায় না। কমলাকান্তের আসরে, দৈনিক আনন্দবাজারে এই ধরনের বহু আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন - হৃদয়ভূষণ বিভূতিভূষণ [মৃত্যু উপলক্ষে ৫।১১।৫০ তাং], শ [বার্ণাড শ র মৃত্যুতে ১২।১১।৫০ তাং], আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন [৫।১২।৫৫ তাং], কবি সুনির্মল বসু [১১।৩।৫৭ তাং], পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৫।১।৫৯ তাং], পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী [৯।৪।৫৯ তাং], কবি নজরুল ইসলাম [২৮।১।৬০], বিধানচন্দ্রের মৃত্যু [৫।৭।৬২ তাং], দাদাঠাকুর [২৫।৪।৬৩], নেহেরু ও আমরা [মৃত্যু উপলক্ষে ৪।৬।৬৪], শশিভূষণ দাশগুপ্ত [মৃত্যুতে ২৩।৭।৬৪], কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় [মৃত্যুতে ২৫।৩।৬৫], সতীনাথ ভাদুড়ী [মৃত্যুতে ১।৪।৬৫], রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় [২৪।৫।৬৫], জগদানন্দ রায় [২৩।৯।৬৯], শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [মৃত্যুতে ১২।১০।৭০], নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [১৬।১১।৭০], কুমুদরঞ্জন মল্লিক [মৃত্যুতে ২১।১২।৭০],

মোহিতচন্দ্র সেন [১১।১।৭১] প্রভৃতি প্রমথনাথের আলোচনাপরিধির ব্যাপকতা ও জ্ঞানের গভীরতার পরিচয়বাহী। লেখকের জীবনদর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা যে কতখানি গভীর ও সুস্থ ছিল তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও রম্যরচনায়। ডেলি প্যাসেঞ্জারের বস্তুনিষ্ঠ স্বরূপ বর্ণনায় লেখকের অসাধারণ জীবনভিজ্ঞতা ও যুগসচেতনতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে - 'এই যে লোকটি চলিয়াছে, কোন রকমে পা দুটো টানিয়া, প্রতিপদক্ষেপে পথের সঙ্গে যাহার লড়াই, পিঠ বাঁকা, ঘাড় ঝুকিয়া পড়িয়াছে, এক হাতে দুটা ফুলকপি ধোলানো, আর এক হাতে একটা ঔষধের শিশি, পকেটে গোঁজা একটা বালির কৌটা, পাঠক এই লোকটাকে তুমি চেন কি? বছবার বছদিন দেখিয়াছ তাই না চেনাই সম্ভব! আর একটু কাছে গেলে দেখিতে পাইবে, গায়ের কোটটি জীর্ণ, হাতের সূতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, গলার কাছে তেলে ও ঘামে মলিন। ধূতিতে তাহার সেলাই এর উপরে আবার সেলাই, জুতাজোড়া এমন ছিন্ন যে সুদক্ষ মুচিরও অসাধ্য। আরো একটু কাছে যাও তাহার মুখের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ রেখাঙ্করে ডায়ারির আঁকজোক কাটিয়া রাখিয়াছে ওই মুখমন্ডলে। একদিকে তাহার অটল ধৈর্য্য, অন্যদিকে দুঃখদারিদ্র্যে নিত্য লড়াই তাহার জীবনে - তাহারি চিহ্ন ক্ষত বিক্ষত ওই মুখমন্ডল। তাহার জামাখোলা দেহ দেখিলে তুমি চমকিয়া উঠিবে- কঙ্কালের মধ্যে এত শক্তি, কঙ্কালের এমন প্রাণ, কঙ্কালের এমন চলমানতা আসিল কি প্রকারে? এই লোকটা কে জ্ঞান? ও একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার'।^{৪০১} অবশ্য লেখকের প্রতিভাবলে এবং পরিবেশননৈপুণ্যে বস্তু ও তথ্য রসোসীর্ণ ও কালোসীর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার পাঠক, সাধারণ লোক প্রভৃতি রসরচনাতেও লেখকের যুগজীবনভিজ্ঞতা ও মানবানুভূতির প্রভূত প্রমাণ মেলে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রাধান্য। বিজ্ঞানের যথার্থ অর্থ চেতনার মুক্তি। কিন্তু এখন মানুষ ক্রমশঃ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দাসে পরিণত হচ্ছে। বিজ্ঞান-জাহবীর স্বচ্ছ গতিশীল স্রোতধারার পরিবর্তে তার ফেলে যাওয়া পলিমাটির দিকেই সকলের লোভ। কালচার হচ্ছে অবকাশের ফসল, অতিরিক্তের আনন্দময় মূর্তি। কিন্তু বর্তমানে অবকাশের অভাবে এবং বৈষয়িক উন্নতির তাগিদে কালচারের পরিবর্তে এগ্রিকালচার, প্রকৃতি প্রীতির পরিবর্তে যন্ত্রপ্রীতি, শিল্পের (Art) পরিবর্তে কলকারখানা (Industry) প্রধান হয়ে উঠেছে। 'যন্ত্রবর্জিত ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে [বিচিত্র উপল, পৃ: ৩৮], 'বস্ত্রের বিদ্রোহ' ছোটগল্পে, 'তপঃসিদ্ধ' কবিতায় প্রমথনাথ বর্তমান যুগের এই গুরুত্বর সমস্যারই বাণীমূর্তি রচনা করেছেন।

প্রমথনাথ মূলতঃ রোমান্টিক কবি। তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি নিখাদ। এতে অনেকের

ধারণা হতে পারে যে তিনি প্রাচীন পট্টী কবি, আধুনিক মনস্ক নন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতিপ্রীতি আধুনিকতার পরিপট্টী নয়। ইংল্যান্ডে Industrial Revolution এবং Romantic Revival - - - একই কালে যুগপৎ পাশাপাশি চলেছিল। বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটলেও মানুষ শান্তি পাচ্ছে না। তাই শান্তির সন্ধানে সে প্রকৃতির স্নেহাশ্রয় প্রার্থনা করছে। পরিবেশের মালিন্য দূর করতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রকৃতিকে সযত্নে লালন করছে। প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেলে, কৃত্রিম জীবনে মানুষের বিপদ অনিবার্য। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে কাব্য জীবনেও একথা সর্ববাদী সম্মত। এই দিক থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন প্রকৃতিমুখ্য লেখক হয়েও আধুনিক, প্রমথনাথ বিশী ও প্রকৃতিপ্রেমিক রোমান্টিক কবি হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ আধুনিক ও যুগসচেতন। শান্তিনিকেতনে আশৈশব প্রকৃতির কোলে লালিত প্রমথনাথ স্বভাবকে বর্জন করে মেকী ও কৃত্রিম জীবনকে কখনও বরণ করে নিতে পারেন নি - না জীবনে না কাব্যে।

আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আর প্রমথনাথ ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সজীব প্রতিমূর্তি। তিনি কখনো কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি। শনিবারের চিঠি, দেশ, কল্লোল, কথাসাহিত্য প্রভৃতি তদানীন্তন প্রথম শ্রেণীর প্রায় সব পত্রিকাতেই তিনি অল্প বিস্তর লিখেছেন। কিন্তু কখনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি। মতভেদ ঘটেছিল বলেই এবং ব্যক্তিগত সম্মান আহত হয়েছিল বলেই তিনি যুগান্তর পত্রিকার চাকুরী ছেড়ে দেন এবং আনন্দবাজার ও দেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ঐ একই কারণে পি. এইচ. ডি র জন্যও চেষ্টিত হন নি। জীবনে কাব্যে সাহিত্যে তাই তিনি সর্বদাই সকলের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র ও একক, মেকী জনদরদী সেজে কখনও জনতার সঙ্গে একাকার হয়ে যান নি।

প্রমথনাথের বিবিধ, বিচিত্র রচনার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ বাণীমূর্তি লাভ করেছে। তাঁর আধুনিকতা বা যুগচেতনা সাময়িক বা স্থানিক গভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি যুগ ও কালের গভীর ডিঙিয়ে যুগান্তরে ও কালান্তরের বাণীমন্দিরে প্রবেশের সাধনাই করে গেছেন সারাজীবন। তাই যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হুজুগের বন্যায় ভেসে যান নি। নূতনত্বের ঝোঁকে আধুনিক গদ্যকবিতা রচনার প্রবণতা যখন যুগের ধর্মরূপে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে তখনও তিনি একদিকে আধুনিক গদ্য কবিতার, ছন্দহীন, সুবমাহীন, নীরস, নিষ্প্রাণ সত্তার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, অন্যদিকে রোমান্টিক কবিতার সৃষ্টিশীল সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নিজের কবিস্বরূপ সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন চিন্তে ঘোষণা করতে পারেন - 'আমার কাব্য প্রকৃতি রোমান্টিক ... বর্তমান কবির স্বভাব

অনমনীয়, অননুতপ্ত, অলঙ্ঘ্য রোমান্টিক প্রকৃতির '।^{৪০২} আধুনিক গদ্যকবিতা যে বিষয়বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এনে দিয়েছে বাংলা কাব্যে একথা প্রমথনাথ বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক গ্রহে স্বীকার করেও অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেন যে বাংলা কাব্যের মূল স্রোত রোমান্টিক প্রকৃতির। এইভাবে তিনি যুগসচেতন হয়েও সর্বযুগের বাণীবাহক হয়ে উঠেছেন।

(৪) প্রমথনাথ বিশীর ভাষা ও রচনাশৈলী :

ভাষা ভাবের বাহন। ব্যবহারিক জীবনে কথ্যভাষা ও লেখ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয়ের জল-অচল ব্যবধান দেখা যায় না। সাহিত্য বর্তমানে অনেক বেশী জীবনঘনিষ্ঠ। তাই ভাষা এখন ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনের মৌখিক রূপের আদল লাভে তৎপর। বাংলা লেখ্য ভাষা দ্বিধাবিভক্ত— (১) সাধু-ভাষা এবং (২) চলিতভাষা; ক্ষেত্র বিশেষে উভয়ের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রবণতা চলিত ভাষার দিকেই বেশী। স্থায়ীভাবে পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সেই ভাবগুলিকে রসে পরিণত করার কাজে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে নবতর ভাষাসম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ভাবগভীরতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকলার দিকে বা অনেকক্ষেত্রে ভাব গভীরতার পরিবর্তে শুধু আঙ্গিক সচেতনতার দিকে ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। প্রতিটি লেখকই বিশিষ্ট আঙ্গিক, কলাকুশলতা ও ভাষা সম্পদের অধিকারী। বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রকরণবৈচিত্র্য অনুযায়ী রচনাভঙ্গী ও ভাষা ব্যবহার পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে থাকে।

প্রমথনাথ বিশীর রচনা বৈচিত্র্য অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি লেখার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য, গভীরতা ও বহুমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় রহিত। নানারঙের সমাবেশে গঠিত তাঁর প্রতিভার রামকু নব নব বর্ণের উদ্ভাসে অপরূপ। গদ্যে পদ্যে তিনি এক অক্লান্ত, সব্যসাচী লেখক।

প্রমথনাথ মূলতঃ একজন রোমান্টিক কবি। ফলে তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্যাশ্রিত রচনাতেই কবিকল্পনার পেলবতা, অন্তঃস্পন্দ, বর্ণসুষমা ও আলঙ্কারিক কারুকার্য লক্ষ্যগোচর হয়।

আবাল্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষাকে সর্বতোভাবে আশ্বস্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের সববিধ গদ্যে পদ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-গভীরতা, প্রকৃতি-প্রীতি, কল্পনা-সম্পদ, ছন্দ-ঝংকার, অলংকার-শোভা প্রভৃতির প্রতিফলন মেলে, যদিও তাঁর নিজস্ব প্রতিভাবৈশিষ্ট্য ক্ষীণভাবে অন্তঃসলিলা ছিল। কবিতা ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বেই

আলোচনা করা হয়েছে। আসলে প্রমথনাথ অনুকরণের পরিবর্তে স্বীকরণেই অধিকতর যত্নবান ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তিনি তা অকপটে স্বীকার করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাকে সাক্ষীকরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গেও তাঁর ভূমিকা অনুরূপ। মধ্যজীবনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। এবং পরবর্তীকালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনা ও রূপরীতির সমন্বয় সাধনে ও সংযোগ সেতু গড়ে তুলতে ব্রতী হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই দুই দিকপাল সাহিত্যিকের দুটি ভিন্নধর্মী রচনারীতির যথাযথ সমন্বয়সাধনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারীতির উদ্ভব ঘটা সম্ভব। তাঁর পরবর্তী রচনাগুলি উপরিউক্ত বিশ্বাসের বাস্তব রূপদানের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস। লেখকের ভাষায় — 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে আমি ভয়ে এড়াইয়া না চলিয়া আত্মসাৎ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও আমার সেই কৈফিয়ৎ। আরও কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের র‍্যাশনালিজম আমি মিলাইতে চেষ্টা করিতেছি। ইহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'।^{৪০৩}

আসলে প্রমথনাথ রবীন্দ্র-ভক্ত হলেও রবীন্দ্র-অনুকারী নন। রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর রচনাকে তিনি চোখ দিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়েও দেখেছেন। তাই তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা হয়ে উঠেছে গভীর উপলব্ধিজাত ও অন্তদৃষ্টি সজ্জাত এক মূল্যবান সম্পদ। শুধু বস্তুকে প্রাধান্য না দিয়ে বস্তু ও রসের গঙ্গায়মুনা সঙ্গম ঘটিয়েছেন তিনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুদৈন্য চোখে পড়ে। আসলে তাঁর সমালোচনা তথ্যকণ্টকিত নয়, ব্যক্তিত্ব-সুরভিত। তা বুদ্ধির খোরাক জোগায় না, রসপিপাসা চরিতার্থ করে। কারণ তিনি চোখে আঙুল দাদা নন, সৌন্দর্য রসিক।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী প্রমথনাথ। তাঁর গদ্য শৈলী বহুবর্ণবিলসিত। 'কৌতুক কটাক্ষ ও বিদ্রূপ বজ্রাঘ্নি থেকে স্বপ্নমহুর তন্ময়তা পর্যন্ত ভাবের বিচিত্র লোকে তার গতি। কোথাও ভাষায় তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের নির্মম কাঠিন্য। কোথাও বুদ্ধিদীপ্ত বাগবিভূতির ক্ষুদ্রবৃদ্ধি, কোথাও বর্ণাঢ্য ভাষার প্রবাল-দীপ্তি, আবার কোথাও বা লতানমনীয় ভাষার পুষ্পিত মহিমা'।^{৪০৪} কোপবতী উপন্যাসে বীরভূমের প্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃস্বরূপের যে অনবদ্য ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা যে কোন উচ্চাঙ্গের গদ্যকাব্যের সমতুল্য — 'বীরভূমের এই বিচিত্র ভূখণ্ডে শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শাক্তদের পীঠস্থান তারাপুর, লাবপুর, নলহাটি, কঙ্কালীতলা; আবার বৈষ্ণবদের পীঠস্থান নামুর ও কেন্দুলি। এই মাটি একাধারে বীর ও কবিদের

৪০৩। কাব্যগ্রন্থাবলী [২য়], পৃঃ ৮ — প্রমথনাথ বিশী।

৪০৪। বিচিত্র সৃষ্টির উৎসসন্ধান — রবীন্দ্রনাথ রায়, কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ ১৪৪২।

জননী। প্রাচীন বীরগণের স্মৃতি বহিয়া ইহা বীরভূম, আর যাহাদের স্মৃতি কখনো প্রাচীন হয় না সেই কবিদেরও ইহা ধাত্রী : জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানুসিংহ ঠাকুর। এই অলৌকিক ধূলিমুষ্টি নানা সুরের মন্ত্রপড়া, গীত গোবিন্দের যে সুরের সাহায্যে বিরহিনী রাধা নবীন মেঘ ও পুরাতন তালীবনের দ্বিগুণিত অন্ধকারের মধ্যেও পথ খুঁজিয়া পায়, পদাবলীর যে সুরে সামান্য রমণী কবির চক্ষে অসামান্য হইয়া উঠিয়া বৈকুণ্ঠকে ধিকৃত করা তাহার শীতলচরণে আশ্রয় দান করে। বাউলের মনের মানুষ খোঁজা সুর গ্রামছাড়া কোন রাঙা মাটির পথের অনুসরণে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য সাঁওতাল বালকের করুণ একটানা বাঁশের বাঁশির রবের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাট প্রান্তরের চরম প্রান্তে কোথায় মিলাইয়া যায়, আর ভানুসিংহ ঠাকুরের সহস্রতার বীণার মীড়ে মীড়ে যুগপৎ মানুষ ও প্রকৃতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-মিলনের সঙ্গীত আপনার অসহ্য রসভরে পরিণত দ্রাব্ধা শুচ্ছের মতো ফাটিয়া ফাটিয়া পড়ে। এখানকার অসীম আকাশের নীলকান্ত থালিকায় সোনার রোদের স্তবকে মোড়া দিনগুলি কোন পরম রসিকের পায়ে নিবেদিত নৈবেদ্য আর নিশীথ নক্ষত্রের স্বর্ণাক্ষরে ভাস্বর দিগন্ত বিস্তৃত অক্ষয় পান্ডুলিপি কোন্ ধ্যানী পাঠকের সম্মুখে কী এক উদার শাস্ত্র'। ৪০৫

গদ্যরীতির এমন স্বচ্ছ, সাবলীল, রাজকীয় মহিমা ও আভিজাত্য রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। রোমান্টিক কবির কলমে রচিত ভাব ভাবনা ও ভাষার এই পার্বতী-পরমেশ্বরী শিল্পমূর্তি বাংলাসাহিত্যে অবিরল নয়।

'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির অনুসরণে এক অসাধারণ ভাষা সম্পদ গড়ে তুলেছেন প্রমথনাথ। গদ্যে বা পদ্যে কোথাও তিনি রবীন্দ্রনাথের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন নি।

কোন লেখকের ভাষা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। প্রমথনাথ ছিলেন দৃঢ়চেতা ও আফলোদয়কর্মী। তাঁর এই দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ভাষায়; তাঁর চিন্তা, কল্পনা, ভাষা - কোথাও কোন দুর্বলতা বা শিথিলতার চিহ্ন মেলে না, কোথাও কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। তাঁর ভাষা কোথাও কৃত্রিম নয়, কর্ণের কবচকুন্ডলের মতোই চিন্তা ও ভাবানুভূতির সঙ্গে তা অচ্ছেদ্য। তাঁর গদ্যের বহুক্ষেত্রে কাব্যিক বহিঃপ্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তা দুর্বল বা দৃষ্টিকটু হয় নি - সুস্থ দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বলেই মনে হয়।

বহুজন পরিবৃত থেকেও এই মজলিশী ও আমুদে মানুষটি যেন স্বতন্ত্র একটি সত্তার গভীরে ডুবে থাকেন। বহুর মধ্যেও তিনি একা, কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিরাসক্ত। নিন্দা

প্রশংসায় বহুক্ষেত্রে বিগলিত বা বিচলিত হলেও মনোরাজ্যে তিনি আশ্চর্যকর উদাসীন। এর কারণ মনে হয় তাঁর কবিপ্রকৃতি অর্থাৎ নিজস্ব কল্পনা লোকে একান্ত আশ্রয় সন্ধান প্রবণতা। 'প্রমথনাথের পরিহাস তাঁর মুখোশ, বিজ্ঞতা তাঁর বর্ম। অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই আছে অসহায়, সঙ্গকামী, বিপন্ন বিস্ময়ে ভরা একটি রোমান্টিক মন। তাঁর এই স্বভাবধর্মের প্রতিক্রিয়া - ফুটে উঠে তাঁর রচনায়'।^{৪০৬} তাই উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সর্বত্রই তিনি মূলতঃ কবি।

তাঁর চেহারা ছিল কিছুটা কর্কশ ও লাবণ্যহীন, প্রকৃতি ছিল গম্ভীর, ধাত ছিল কড়া। কিন্তু তাঁর ভাষা সর্বদাই ছিল সরস, কৌতুকমিশ্র ও কল্পনাভাস্বর। ব্যক্তি স্বরূপের এই বিষম বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাসিত হয়েছে তাঁর রচনায়। এই কারণেই আপাতগম্ভীর ভাব ভাবনাপুষ্ট রচনার মধ্যেও সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সমাবেশ দেখা যায়। চিন্তাগর্ভ বিষয়বস্তুর মধ্যেও আবেগানুভূতির রসধারা প্রবাহিত হয়। আবার আপাত ব্যঙ্গের অন্তরালে অনুভূত হয় স্বদেশ ও স্বজাতিপ্ৰীতির ফলশ্রুতি। লঘুরস রচনার মধ্যে বেজে ওঠে গম্ভীর সুর, উচ্ছলতার বা খেয়ালের মধ্যে ফুটে ওঠে সংকল্পের দৃঢ়তা। বলার ভঙ্গীর গুণেই নীরস, তথ্যসর্বস্ব বস্তু হয়ে ওঠে সরস ও হৃদয়। আসলে তাঁর রচনার প্রসাদগুণ মূলতঃ তাঁর মনের সদাপ্রসন্নতার প্রতিক্রিয়ামাত্র।

প্রমথনাথের ব্যক্তিত্বের হীরকদ্যুতি নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তাই তাঁর রচনার বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। আর এই কারণেই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ-বিদ্যুৎ তাঁর ভাষাকে করেছে স্বচ্ছ, দীপ্ত, স্বজু ও গতিশীল। মূলতঃ কবি বলেই তাঁর গদ্যে বহুত্র একটা ধ্বনিসঙ্গতি, অন্তঃস্পন্দ ও সৌন্দর্য সুষমা পরিলক্ষিত হয়। আবার রসিক বলেই তাঁর গদ্য সর্বদা সরস, রুচিশীল বলেই তা শোভন, বুদ্ধিদীপ্ত বলেই তা এমন উজ্জ্বল।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা — উভয় মাধ্যম নিয়েই প্রমথনাথ সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। জোড়াদীঘির উদয়ান্ত, পূর্ণাবতার প্রভৃতি উপন্যাসে কোন পরিচ্ছেদ সাধুতে আবার কোনটি চলতি ভাষাতে লিখিত হয়েছে। তবে তুলনামূলক বিচারে তিনি দীঘক্রিয়া সম্বলিত ও তৎসম শব্দ প্রধান সাধুভাষাতেই অধিকতর সিদ্ধিলাভ করেছেন। 'সাধুতে তিনি সর্বোত্তম এবং সাধু, চলিত সব ধরেও অন্যতম প্রধান লেখক'।^{৪০৭}

সাধুভাষা ও চলিতভাষা শব্দদুটিকে স্বীকৃতি না দিয়ে দীঘক্রিয়া ও হ্রস্বক্রিয়া শব্দদ্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে বহুবিচন্দ্রের সাধুরীতি বা রবীন্দ্রনাথের চলতি রীতি দুটোই কৃত্রিম। এঁরা কেউ খাঁটি মুখের ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করেন

৪০৬। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ - ১৪৬৪ - প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।

৪০৭। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ - ১৪০৯ - শঙ্করী প্রসাদ বসু।

নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি খাঁটি মুখের ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা খাঁটি সাহিত্যসেবী নন বলে ক্রিয়াপদের বাহ্যবর্জিত ও বিশেষণবহুল চলিত ভাষা বাংলা সাহিত্যে অচলিত রয়ে গেছে। তাঁর ভাষায় — ‘স্বামীজীর বাংলা স্টাইল শুধু অপূর্ব নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটি বাহন। বাংলা কথ্য স্টাইলের ইহাই যথার্থ আদর্শ। তাঁহার স্টাইলের তুলনায় হতোম ও আলাল Vulgar - আর পরবর্তীদের কথ্য স্টাইল সাধুভাষার মতোই, সাধুভাষার চেয়েও অনেক বেশি কৃত্রিম’। ৪০৮

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাধুগদ্যের ক্ষেত্রে একজন উচ্চাঙ্গের শিল্পী। বাংলার পারিবারিক বাগ্মীরতির প্রাণছন্দকে বজায় রেখে তাকে সাধুভাষায় সুমার্জিত করে ও সাহিত্যবৈভবে সমৃদ্ধ করে ভাষার গভীরতা ও দীপ্তি প্রকাশে তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু উপন্যাস ও গল্পের বাইরে তিনি পদচারণা না করাতে এই ভাষার প্রশস্ততর ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হতে পারে নি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত, সুকবিত ও সুপ্রযুক্ত, ঈষৎ তির্যক অথচ হৃদয়বেদ্য, উজ্জ্বল ভাষা বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ হলেও বিষয় বৈচিত্র্য অনুসারে তাঁর গদ্যের বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এঁদের সঙ্গে তুলনায় প্রমথনাথ বিশীর গদ্য অনেক সরস, মার্জিত, সরল ও সাবলীল। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী হিসাবে বাংলা সাধুগদ্যে রাজশেখর বসু সংযত, সংহত, অব্যর্থ ও অত্রান্ত শব্দ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেই ধারাকেই বহন করে চলেছেন প্রমথনাথ পরম নিষ্ঠাভরে। কিন্তু রাজশেখর বসুর এই সিদ্ধি কথাসাহিত্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই সংহতি বা গদ্যের অবয়ব সৌষ্ঠব সর্বত্র ফুটে ওঠেনি। কিন্তু প্রমথনাথের কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্য সর্বত্রই ভাষা ও রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে অসাধারণ সিদ্ধি লক্ষ্যগোচর হয়। হাস্যরসিক হিসাবে প্রমথনাথ সাধুভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বেশী। কারণ হাস্যরসের রচনায় বোধহয় সাধুরীতিই প্রশস্ততর। গভীর ভাষা ও লঘুভাব আপাত বৈষম্য সৃষ্টি করে হাস্যরস ক্ষুরণে সাহায্য করে। এই সব কারণেই সমালোচক যথার্থই বলেছেন — ‘বাংলা গদ্যের সাধুরীতির তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী। এ যুগে এক মোহিতলাল ছাড়া সাধুগদ্যের এ হেন সিদ্ধি আর কারু রচনায় নেই। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের পূর্বসূরী। পূর্বপুরুষের অভিজাত রুচিই তাঁকে সাধু গদ্যের রাজপথে আহ্বান করেছে। . . . সাধু গদ্যের প্রতি এই সহজাত প্রীতির সঙ্গে প্রমথবাবুর ভারতোপলব্ধির কোথাও যোগ আছে। অন্ততঃ উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে অপূর্ব আলেখ্য চিত্র চরিত্র পড়লে তো মনে হয়, সে যুগের আত্মজিজ্ঞাসাকে যিনি এমনভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর ভাষার সংহত, ক্লাসিকরূপটিই একান্ত

স্বাভাবিক'।^{৪০৯} প্রমথনাথের মননস্বাতন্ত্র্য ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাংলা গদ্যশিল্পের সংহতি ও চিরায়তসৌন্দর্য যেন একাত্ম হয়ে আছে। তাঁর সমুন্নত, মহিমময় সাধুভাষা যেন তাঁর চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ মাত্র। বিষয় ও বিষয়ীর সঙ্গে ভাষার এমন ওতপ্রোত সংমিশ্রণ বিরলদৃষ্ট।

প্রমথনাথের নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রত্যেকটি শাখাই বহু উপশাখায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু সর্বত্রই ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পদ্মা বা কোপবতী-র ভাষার সঙ্গে রাম ফাঁসুড়ে, পূর্ণাবতার বা পনেরোই আগস্ট এর ভাষার পার্থক্য অনেক। আবার রবীন্দ্র-সমালোচনা বা বঙ্কিম-সমালোচনার ভাষাও এক নয়। মধুজীবনী এবং জওহরলাল কিংবা গান্ধীজীবনীর ভাষাও ভিন্ন। চিত্রচরিত্র কিংবা বিচিত্র সংলাপের ভাষার মধ্যেও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। বিচিত্র উপলভিতর ভাষারীতি বা শিল্পকলার বাহন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থের ভাষা তো বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ শিল্পসম্পদ। এখানেই বোধ হয় ভাষাশিল্পী প্রমথনাথের অতুলনীয় সিদ্ধি। এক্ষেত্রে তিনি শব্দের ধ্বনি গৌরবে যেমন সঙ্গীত সৃজনে দক্ষ, আবার শব্দের রেখা দিয়ে ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও সুপটু পটুয়া। ভাষার জাদুতে সেই ছবির রূপ, রেখা, বর্ণ, স্থিতি, গতি, ভাব ও ভঙ্গী সমস্তই পরিস্ফুট ও ব্যঞ্জনাময়। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির ভাষা, মানসিকতা ও রচনাশৈলীর সঙ্গে এই গ্রন্থের আত্মিক যোগ আছে।

তাঁর প্রথমযুগের উপন্যাসগুলি ও পরবর্তী যুগের উপন্যাসগুলির ভাষার মধ্যে পার্থক্যের একটি বিশেষ কারণ মনে হয় সময়গত। এর মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনে কর্মব্যস্ততার তর তম ও যুগজীবনের পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রথমযুগে লেখকের হাতে ছিল অফুরন্ত সময়, মনে ছিল প্রবল আবেগের প্রাচুর্য। ফলে তখনকার উপন্যাসে কল্পনার লতায়িত বিস্তার, কুসুমিত সৌন্দর্য, ভাষার আলঙ্কারিক কারুকার্য লক্ষ্যগোচর হয়। পদ্মা, কোপবতী প্রভৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু পরবর্তীকালে বিবিধকার্যে ব্যস্ত প্রমথনাথের হাতে সময়ের অভাব দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে বঙ্কিমী আদর্শ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। ফলে তখন ভাষার সংহতি, সংক্ষিপ্তি ও অর্থঘন দার্ঢ্য ফুটে উঠেছে, আবেগ প্রাচুর্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পটপরিবর্তন শুরু হয়েছে। সাহিত্যে তার প্রতিফলন অনিবার্য হয়ে উঠেছে - পূর্ণাবতার, পনেরোই আগস্ট, বঙ্গভঙ্গ, তার উদাহরণ। প্রথমদিকের নিসর্গবর্ণনা বা নর নারীর রূপবর্ণনা ছিল কাব্যধর্মী ও গীতিধর্মী। কিন্তু শেষের দিকে তা নাটকীয় ও নাট্যধর্মী হয়ে উঠেছে।

৪০৯। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃ: ১৩৪৬ - প্রমথনাথ বিশী : লক্ষ্য ভারততীর্থ
শ্রী প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

বর্ণনা সর্বদা উপাদেয় হওয়ার কারণ তাঁর মধ্যে লেখক ও পাঠকের সৌহার্দ্যপূর্ণ আত্মীয়তার ভাবটি বিদ্যমান এবং সেই সঙ্গে একটা সরস কৌতুকের ধারা সদা প্রবহমান।

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ সার্থক বঙ্কিমশিষ্য। তিনি শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাক্সালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বঙ্কিমের প্রদত্ত নির্দেশগুলিও যথাসাধ্য আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ। তিনি বিশ্বাস করতেন — 'কবিত্বশক্তি জন্মসিদ্ধ আর গদ্যলেখার ক্ষমতা আজন্ম সাধনার ফল'।^{৪১০} এই সাধনার ফলে তিনি বুঝেছিলেন - সরলতা ও প্রাঞ্জলতাই যে কোন লেখকের অন্যতম প্রধান গুণ, কেননা লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বোঝানো। একাজে প্রধান সহায় লেখকের মার্জিত মন, শিক্ষিত কান ও বাস্তববোধ। প্রমথনাথের এই সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জনে বিশেষ সাহায্য করেছে তাঁর সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের বিভিন্ন রচনা। আর তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবোধ তাঁর গদ্যকে করেছে শিল্প-সুখমামণ্ডিত। অবশ্য প্রবন্ধে তাঁর প্রসাদগুণ বাচ্যার্থের সহজবোধ্যতা নয়, তা রুচিশীল, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের মনের আলো। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে প্রমথনাথ বঙ্কিমশিষ্য হলেও বঙ্কিমের প্রবন্ধের ভাষা হল মনীষার বাহন, কিন্তু প্রমথনাথের প্রবন্ধের ভাষা বহুক্ষেত্রেই রসের বাহন।

প্রতিভাবান লেখকের কলমে গদ্যসাহিত্য রূপান্তরিত হয় সাহিত্যিক গদ্যে। প্রমথনাথের গদ্য সর্বদাই সাহিত্যিক গদ্য। তিনি বহুদিন কমলাকান্তের আসরের সূত্রে দৈনিক সংবাদপত্রের সাময়িক বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে বিবিধ, বিচিত্র, সাময়িক ও চিরায়ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে বহু প্রবন্ধ ও রসরচনা লিখতে হয়েছিল তাঁকে। গদ্যকে এখানে সর্বকার্যক্ষম ও সর্বজন ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে। সমকালের প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধন করতে গিয়ে কলমের আড়ষ্টতা সম্পূর্ণভাবে কেটে গেছে, ভাষার নমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজাত পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে আটপৌরে ও অনাড়ম্বর রূপে বৃহত্তর পাঠক সমাজের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। নানারকম, কমলাকান্তের জল্পনা, কমলাকান্তের আসর প্রভৃতি গ্রন্থই তার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্যে ও প্রবন্ধসাহিত্যে একই ভাষারীতি গ্রহণ করেছেন। সাধারণতঃ বিষয়ীকে অন্তরালে রেখে বিষয়কে মুখ্য করে তোলাতেই প্রবন্ধকারের মুদ্রিয়ানা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিষয় ও বিষয়ী দুটিই মুখ্য। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য-মূলক প্রবন্ধেও বিষয়কে ছাড়িয়ে গেছে বিষয়ীর প্রাধান্য। ফলে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ঐশ্বর্য বিস্ময়কর হলেও যুক্তির চেয়ে অনুভূতির প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রধান ত্রুটি সচেতন চাতুরী ও অতিরিক্ত বৈদগ্ধ্য। ভাষার

বাহ্যল্যহীন ক্ষিপ্ৰতা, ভাবের চমকপ্রদ অভিনবত্ব আর দুয়ের উপর বুদ্ধির খরদীপ্তি তাঁর রচনার প্রধান গুণ। তবে উচ্চতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেই তার আবেদন সীমাবদ্ধ। স্থিতিশীল এই স্টাইল ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষরাক্ষিত নয়। তুলনামূলক বিচারে সরসতা, প্রাঞ্জলতা ও মনীষার ত্রিবেণীসঙ্গমে ফুটে ওঠা রামেন্দ্রসুন্দরীয় প্রবন্ধ অনেকটা বরণীয়। প্রমথনাথ বিশীর লেখায় প্রমথ চৌধুরীর গ্লেশ, বাগ বৈদম্ব্য, নাগরিক রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাব্যিক সুবমা, প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ। আর আছে ভাষা ও রচনাইশলীর ক্রমবিবর্তন।

প্রমথনাথের গদ্যশৈলী তৈরী হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জোড় কলমে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গদ্যলাভ করেছিল দার্ঢ্য, সংহতি ও যুক্তিনিষ্ঠা; রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করেন নমনীয়তা, কমনীয়তা ও কাব্যশ্রী। প্রমথনাথের কলমে এই দুয়ের মধ্যে সার্থক মেলবন্ধন রচিত হয়েছে। তাই তাঁর প্রবন্ধে একদিকে আছে বিচার বিশ্লেষণ প্রবণতা, তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিবোধ, সংহতি ও সংক্ষিপ্তি, অন্যদিকে আছে স্বচ্ছ, সাবলীল, সরস ও সুখপাঠ্য রসমূর্তি। 'চিত্র চরিত্র', 'বঙ্কিমসরণী', 'মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতির সঙ্গে 'বিচিত্র উপল' ও 'কমলাকান্তের আসরের' ছোট ছোট রচনাগুলি মিলিয়ে পড়লেই প্রমথনাথের রচনাইশলীটি কিছুটা বোধগম্য হবে।

প্রমথনাথ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনাইশলীর মিলনপিয়াসী। তাঁর কথায় — 'বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে দুই ই বড় স্টাইলিশ। এখন যদি কেউ উভয় স্টাইলের মিশ্রণ ঘটাতে পারে — তার হাতে বাংলার শ্রেষ্ঠ স্টাইলের জন্ম নেবে। রবীন্দ্রনাথের মেজাজ নিতান্ত রোমান্টিক। সেই সঙ্গে ছিল শাণিত বুদ্ধিও। বঙ্কিমের মেজাজ র‍্যাশনালিস্টিক। তিনি যেখানে রোমান্টিক সেখানেও বুদ্ধিতে তার ভিত্তি, অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধির ভিত্তি ইমোশনে।

এই দুই মেজাজকে ও রীতিকে মেশানো একটা মস্ত কাজ। . . . এই দুই স্টাইলকে মেশানোর চেষ্টাই এখন করতে চাইছি'।^{৪১১}

বঙ্কিমের লেখা থেকে সংযম ও মিতভাষিতা আয়ত্ত করতে চেয়েছেন প্রমথনাথ। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। — 'মধুসূদনের আত্মপ্রত্যয়, বঙ্কিমের মনীষা, রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তদৃষ্টি আর শীঘ্র ফিরিবে না। কিন্তু তৎসঙ্গেও বাংলা সাহিত্যের দ্রুত বিস্তার ঘটতেছে। গভীরতার অভাব ব্যাপ্তির দ্বারা, অন্তদৃষ্টির অভাব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের দ্বারা এবং form এর perfection এর অভাব form - এর অভিনবত্বের দ্বারা পোষাইয়া লইতেছে বাংলাসাহিত্য। নৈরাশ্যের কারণ তো নাই-ই, বরঞ্চ অনেক নৈরাশ্যের মধ্যে ইহাই একমাত্র আশার কারণ'।^{৪১২}

৪১১। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃঃ - ১৪০৮ - শঙ্করী প্রসাদ বসু।

৪১২। আনন্দবাজার পত্রিকা - ২১। ৪। ৫৫, [কমলাকান্তের আসর]

বঙ্কিমী রীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রমথনাথে প্রকট। দীর্ঘ অনুচ্ছেদের বক্তব্যবিষয়কে সংহত করে শেষ ছত্রটিতে সূত্রাকারে ব্যক্ত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই কারণে অধিকাংশ অনুচ্ছেদের শেষ ছত্রটি অর্থঘন প্রবাদ-প্রবচনে বা এপিগ্রামে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ এপিগ্রাম ছড়িয়ে দেন অনুচ্ছেদের মধ্যে আর বঙ্কিমচন্দ্র তাকে দুলিয়ে দেন অনুচ্ছেদের অন্তে। প্রমথনাথ এক্ষেত্রে বঙ্কিমানুসারী। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ সর্বত্রই প্রচুর অর্থঘন, জীবনঘনিষ্ঠ উজ্জ্বল এপিগ্রামের দেখা মেলে। বরং কোথাও কোথাও তিনি এগুলি এতবেশী ব্যবহার করেছেন যে তা দোষাবহ হয়ে উঠেছে।

চিন্তাকে তত্ত্বসূত্রে গেঁথে সূত্রাকারে প্রকাশ করা বঙ্কিমপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, ভাষা, প্রবন্ধ সূত্রাত্মক, আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যাাত্মক, প্রমথনাথ এক্ষেত্রেও বঙ্কিমানুসারী।

প্রবন্ধকারের একটি বড় গুণ নাগরিকতা (urbanity)। — বড় নগরের অধিবাসী হলে সেখানকার বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা মানুষের মনে একটা সংস্কারমুক্ত উদারভাব এনে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথচৌধুরী প্রভৃতি এই গুণে ভূষিত। প্রমথনাথ এই বিরল গুণের অধিকারী বলেই গ্রাম্যতা, উপনাগরিকতা বা প্রাদেশিকতাবোধ থেকে মুক্ত।

ইতিপূর্বে কোপবতী উপন্যাসের যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে তা রবীন্দ্রানুসারী গদ্য। ফলে ঐ অংশে ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সুন্দর, সুপ্রযুক্ত ও স্বাভাবিক। এই অংশের বিশেষণগুলিও অর্থবহ, সুপ্রযুক্ত ও বাহুল্য বর্জিত। এই বাক্যগুলি রবীন্দ্রানুসারী বলেই কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, পরবর্তীকালে বঙ্কিমানুসারী বাক্যগুলি অনেক হ্রস্বায়ত।

সৃজনশীল সাহিত্যিক ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথনাথের লেখা অনেক সমালোচনা-প্রবন্ধ দিব্যকল্পনা ও অন্তদৃষ্টির সহযোগে নূতন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রথমদিকে সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী তাই তা তথ্যদীন ও ভাবমুখ্য হয়ে উঠেছে। যেমন রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ বা রবীন্দ্রসরণী। পরবর্তীকালে তিনি হয়ে উঠেছেন বঙ্কিমানুসারী। সেখানে মূল থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধকে করে তুলেছেন মূলানুগ ও তথ্যনিষ্ঠ। যেমন বঙ্কিম সরণী, রবীন্দ্র বিচিত্রা প্রভৃতি। ক্রমশঃ তাঁর সমালোচনা হয়ে উঠেছে যুক্তিনিষ্ঠ, নিরাবেগ, স্বচ্ছ ও সরল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে প্রমথনাথ মূলতঃ কবি ছিলেন বলেই তাঁর যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভর, সংযত-সংহত বাকমূর্তি ও চিন্তার মধ্যে ভাবগভীরতা, অনুভূতি কোমলতা ও সৌন্দর্যচেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সংযমের কঠোর বাঁধ ছিন্ন করে মাঝে মাঝে ভাবগঙ্গার প্রাবন ঘটেছে। আসলে সুদীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে প্রমথনাথের মধ্যে যে

কবিসত্তার উদ্বোধন ঘটেছিল পরবর্তীকালে তাকে তিনি কখনও সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারেন নি। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এবং কঠোর সাধনা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকখানি আশ্বস্ত করে নেওয়া সত্ত্বেও কোন একজনকে তিনি সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে জীবনের দুই পর্যায়ে অনুধ্যানের বিষয় করলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রসরণী ও বঙ্কিমসরণী পরিক্রমাতে তিনি প্রমথসরণীতে এসে পৌঁছেছেন। মুক্তবেণী যুক্তবেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষা নয়, আনন্দ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য, পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করাই তাঁর লক্ষ্য, রচয়িতার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেওয়াই তাঁর সমালোচনার ব্রত। এই কারণে পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তারিত আলোচনার পথে না গিয়ে মূল রহস্যের দিকে পাঠকের কৌতূহলকে চালনা করে পাঠকের অন্ধকার মনে চকিতে আলো ছেলে দিয়ে তিনি বিদায় নেন। তিনি ব্যঞ্জনাধর্মী ও উন্মীলন পন্থী লেখক। কোন খন্ড, ছিন্নরূপের পরিবর্তে এক অখন্ড পূর্ণায়ত মূর্তির স্বরূপ সন্ধানে নিরত তিনি। এই পূর্ণ একাধারে আনন্দস্বরূপ ও সৌন্দর্যস্বরূপ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সাহিত্য-সমালোচনা একাধারে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা নিছক সাহিত্য। আবার রবীন্দ্রনাথে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরোক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রে সর্বদা প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অনুভূতি ও রসবোধকে অবলম্বন করে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, আর বঙ্কিমচন্দ্র অনুভূতি ও উপলব্ধিকে সচেতন চিন্তার ক্ষেত্রে এনে তাকে তত্ত্বে এবং শেষ পর্যন্ত সূত্রে পরিণত করেন। বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠা ও সাহিত্যের অনুভূতি দুয়ের যুক্তবেণী রচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত। প্রমথনাথ প্রথমদিকে সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পথের পথিক। পরে বঙ্কিম পছাতেই পদচারণা করেছেন তিনি।

শকুন্তলা, দেসদিমোনা, মিরান্দাকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে তুলনামূলক সমালোচনার সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে তা সমৃদ্ধতর হয়। প্রমথনাথও তাঁর অধিকাংশ সমালোচনায় দেশী বিদেশী বিভিন্ন লেখকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকমনস্ক, বিচারনির্ভর, অনুভূতিঘনিষ্ঠ করে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি করেছেন।

প্রমথনাথের ভারতপ্রেম ও বাঙালীপ্রীতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। তবে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বপ্রেমের উচ্চতর ভূমিতে পদার্পণ করেছেন প্রমথনাথের সেই ক্ষমতা বা চিন্তাধারা ছিল না।

প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নামক দুই উজ্জ্বল পর্বতের পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। উভয় পর্বতের হিমালীপুঞ্জের গলিত ধারায় তাঁর প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়েছে। আর সেইরসের স্রোতস্বিনী বাঙালী সাহিত্য পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ

করেছে। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীকে অনুসরণ ও স্বীকরণ করে অবশেষে এক নবতর বাণীতীরে উত্তরণ করেছেন প্রমথনাথ বিশী।

সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, ঔপন্যাসিকের কাহিনী রচনাকৌশল, সহৃদয় ব্যক্তিত্বের অকৃত্রিম মমত্ববোধ, কবির অনুভূতি গভীরতা ও সরস প্রকাশভঙ্গী, নাটকীয় চমক — সব মিলিয়ে অতি হৃদয়, উপাদেয় ও সুসমাপ্ত এক বিশিষ্ট রচনাশৈলীর জনক তিনি। মৌলিক চিন্তা, বাগ্ভঙ্গী ও প্রকাশকলার সাহায্যে পাঠকের অন্তরে রসাবেদন সৃষ্টির এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারীরূপে প্রমথনাথ বিশীর নাম বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রথম পর্যায় - সহায়ক গ্রন্থাবলী :

- ১। 'কথাসাহিত্য' - পত্রিকা - প্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৩।
- ২। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে - সুধীর চন্দ্র কর
- ৩। যা দেখেছি যা পেয়েছি - সুধী রঞ্জন দাস [১ম-খন্ড, ১৯৬৯]
- ৪। 'দেশ' পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৬
- ৫। 'প্রবাসী' - পৌষ, ১৩৩০
- ৬। The Music of Poetry - (1942) T.S. Elliot.
- ৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খন্ড] - সুকুমার সেন
- ৮। 'প্রবাসী', - পৌষ, ১৩৪১
- ৯। Essays in Criticism (2nd Series), 1951 - Mathew Arnold
- ১০। 'কথাসাহিত্য' - বৈশাখ, ১৩৮২
- ১১। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' - কার্তিক-পৌষ, ১৩৮২
- ১২। রবীন্দ্র জীবনী [তৃতীয় খন্ড] - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
- ১৩। 'শান্তিনিকেতন' - বৈশাখ, ১৩৩০
- ১৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস - ডঃ অজিত কুমার ঘোষ
- ১৫। পত্র স্মৃতি [১৯৭১] - পরিমল গোস্বামী
- ১৬। বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য রসের ধারা - ডঃ অজিত কুমার ঘোষ
- ১৭। Preface to the Shewing up of Blanco Posnet - G. B.S.
- ১৮। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস [২য়] - ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
- ১৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা [ষষ্ঠ মুদ্রণ] - ডঃ শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২০। সাহিত্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ২১। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২২। কালের প্রতিমা [১৯৭৪] - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
- ২৩। বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার [১৯৭৫] - ভূদেব চৌধুরী।
- ২৪। আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় [১৯৬৯] - পরিমল গোস্বামী
- ২৫। The Modern Short - Story - (Chapter - I) - H.S. Bates.
- ২৬। সাহিত্যে ছোট গল্প [১৩৬৩] - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- ২৭। মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য [১৯৭৫] - ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র
- ২৮। বাংলা চরিত সাহিত্য [১৩৬৪] - দেবীপদ ভট্টাচার্য্য
- ২৯। Eminent Victorians (1959) - Lytton Strachy.
- ৩০। রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা [১৩৬৬] - আদিত্য ওহ্রদেদার

৩১। বাংলা সমালোচনার ইতিহাস [১৩৭২] - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্যায় : প্রমথনাথ বিশী লিখিত গ্রন্থাবলী [প্রকাশিত] :

গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
ক) কাব্য :		
১। দেয়ালি	১৯২৩	জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন।
২। বসন্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা	১৯২৭	প্রমথনাথ বিশী, শান্তিনিকেতন।
৩। প্রাচীন আসামী হইতে	১৯৩৪	রঞ্জন প্রকাশালয়
৪। বিদ্যাসুন্দর	১৯৩৫	রঞ্জন প্রকাশালয়
৫। প্রাচীন গীতিকা হইতে	১৯৩৭	কাত্যায়নী বুক স্টল
৬। অকুন্তলা ও অন্যান্য কবিতা	১৯৪৬	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ
৭। যুক্তবেণী	১৯৪৮	ঐ
৮। হংসমিথুন	১৯৫১	মিত্র ও ঘোষ
৯। উত্তর মেঘ	১৯৫৪	মিত্রালয়
১০। কিংসুক বহি	১৯৫৯	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
১১। শ্রেষ্ঠ কবিতা	১৯৬০	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
১২। প্রাচীন পারসিক হইতে	১৯৬৮	মিত্র ও ঘোষ
১৩। কাব্য গ্রন্থাবলী [উত্তর পর্ব]	১৯৭৪	মিত্র ও ঘোষ
১৪। কাব্য গ্রন্থাবলী [২য় খণ্ড]	১৯৭৫	ঐ
১৫। কাব্য গ্রন্থাবলী [৩য় খণ্ড]	১৯৭৬	ঐ
১৬। কাব্য গ্রন্থাবলী [৪র্থ খণ্ড]	১৯৭৭	ঐ
১৭। কাব্য গ্রন্থাবলী [৫ম খণ্ড]	১৯৮২	ঐ
১৮। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার অনুবাদ	১৯৭৮	পঃ বঃ নিরঙ্করতা দূরীকরণ সমিতি
খ) নাটক :		
১। ঘোষ যাত্রা	১৯২২	শান্তিনিকেতন
২। ঋণ কৃত্তা	১৯৩৫	রঞ্জন প্রকাশালয়
৩। মৃত্যু পিবেৎ [সানিভিলা]	১৯৩৬	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৪। মৌচাকে ঢিল	১৯৩৮	ঐ
৫। ডিনামাইট ও অন্যান্য নাটক	১৯৪২	ঐ
৬। গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর	১৯৪৪	ঐ
৭। পরিহাস বিজয়িতম্	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	কাত্যায়নী বুক স্টল
৮। পারমিট	১৯৫৬ [২য় সং]	শ্রীশ্রী লাইব্রেরী
৯। ভূতপূর্ব স্বামী	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্র ও ঘোষ
১০। বেনিফিট অন্ড ডাউট	১৯৭৪	ঐ

গ) উপন্যাস :	গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১।	দেশের শত্রু	১৯২৫	বাণীমন্দির, ঢাকা
২।	পদ্মা	১৯৩৫	রঞ্জন প্রকাশালয়
৩।	জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার	১৯৩৮	কাত্যায়নী বুক স্টল
৪।	কোপবতী	১৯৪১	ঐ
৫।	চলনবিল	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্রালয়
৬।	অশ্বখের অভিশাপ	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্রালয়
৭।	মহামতি রামফাঁসুড়ে	ঐ	মিত্র ও ঘোষ
৮।	নীলমণির স্বর্গ	১৯৫৪	ডি. এম. লাইব্রেরী
৯।	সিঙ্কুদের গ্রহরী	১৯৫৫	ঐ
১০।	কেরী সাহেবের মুনসী	১৯৫৮	মিত্র ও ঘোষ
১১।	লাল কেদ্বা	১৯৬৪	ঐ
১২।	জোড়াদীঘির উদয়াস্ত	১৯৬৬	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
১৩।	বিপুল সুদূর তুমি যে	১৯৬৮	মিত্র ও ঘোষ
১৪।	মুক্তবেণী	১৯৭১	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
১৫।	হিন্দী উইদাউট টায়ার্স	১৯৭১	মিত্র ও ঘোষ
১৬।	পূর্ণাবতার	১৯৭২	ঐ
১৭।	শাহী শিরোপা	১৯৭০	ঐ
১৮।	বঙ্গভঙ্গ	১৯৭৭	ঐ
১৯।	পনেরোই আগষ্ট	১৯৭৮	ঐ
২০।	ধুলোউড়ির কুঠি	১৯৮৫	অরুণা প্রকাশনী
ঘ) ছোটগল্প :			
১।	শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	কাত্যায়নী বুক স্টল
২।	শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব	১৯৪৫	ঐ
৩।	গল্পের মতো	১৯৪৫	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ
৪।	গালি ও গল্প	১৯৪৬	ঐ
৫।	ডাকিনী	১৯৪৫	বেঙ্গল পাবলিশার্স
৬।	ব্রহ্মার হাসি	১৯৪৮	মডার্ন বুকস লিঃ
৭।	অশরীরী	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	পি. কে. বোস এন্ড কোং
৮।	ধনেপাতা	ঐ	মিত্রালয়
৯।	প্র. না. বি.-র নিকৃষ্ট গল্প	ঐ	মিত্র ও ঘোষ
১০।	প্র. না. বি.-র নিকৃষ্টতর গল্প	ঐ	ঐ

	গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১১।	চাপাটি ও পদ্ম	১৯৫৫	ডি. এম. লাইব্রেরী
১২।	নীলবর্ণ শৃগাল	১৯৫৬	শ্রীগুরু লাইব্রেরী
১৩।	অলৌকিক	১৯৫৭	নতুন প্রকাশক
১৪।	এলার্জি	১৯৫৮	বিশ্ববাণী
১৫।	অনেক আগে অনেক দূরে	অমুদ্রিত	মিত্র ও ঘোষ
১৬।	স্বনির্বাচিত গল্প	১৯৫৬	ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং
১৭।	অমনোনীত গল্প	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মহেন্দ্র পুস্তক ভবন
১৮।	নীরস গল্প সম্ভার	১৯৫৭	ওরিয়েন্ট বুক কোং
১৯।	গল্প পঞ্চাশৎ	১৯৬০	মিত্র ও ঘোষ
২০।	যা হলে হতে পারতো	১৯৬২	শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২১।	সমুচিত শিক্ষা	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	এ. কে. সরকার এন্ড কোং
২২।	ছোটগল্প সংগ্রহ [১ম খণ্ড]	১৯৭৭	উজ্জ্বলা প্রকাশনী
২৩।	এ [২য় খণ্ড]	১৯৭৮	এ
২৪।	এ [৩য় খণ্ড]	১৯৮০	এ
২৫।	এ [৪র্থ খণ্ড]	১৯৮২	এ
২৬।	এ [৫ম খণ্ড]	১৯৮৬	পুস্তক বিপণি
৩) জীবনী-প্রবন্ধ-সমালোচনা-রসরচনা :			
১।	রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ	১৯৩৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২।	রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর	১৯৪৬	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৩।	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	১৯৪৪	বিশ্বভারতী
৪।	রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ [১ম খণ্ড]	১৯৪৮	এ মুখার্জী
৫।	এ [২য় খণ্ড]	১৯৫১	মিত্রালয়
৬।	এ [পূর্ণাঙ্গ]	১৯৬৬	ওরিয়েন্ট বুক কোং
৭।	রবীন্দ্র বিচিত্রা	১৯৫৪	এ
৮।	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	১৯৫৪	মিত্র ও ঘোষ
৯।	মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ	১৯৬১	নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বোম্বাই
১০।	রবীন্দ্রসরণী	১৯৬২	মিত্র ও ঘোষ
১১।	শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ	১৯৭২	এ
১২।	মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ	১৯৭৪	করুণা প্রকাশনী
১৩।	পুরানো সেই দিনের কথা	১৯৮৫	মিত্র ও ঘোষ
১৪।	রবীন্দ্র কাব্যে বসু বিচার	১৯৮৫	টোগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
১৫।	বঙ্কিম সরণী	১৯৬৭	মিত্র ও ঘোষ



- ২৯৫ -

	গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১৬।	বঙ্কিম সাহিত্য বিচার	১৯৭১	মিত্র ও ঘোষ
১৭।	বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল	১৯৭৭	পুস্তক বিপণি
১৮।	মাইকেল মধুসূদন [জীবনভাষ্য]	১৯৪১	রক্তন পাবলিশিং হাউস
১৯।	বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য	১৯৪৫	বেঙ্গল পাবলিশার্স
২০।	বাঙালীর জীবন সন্ধ্যা	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্রালয়
২১।	চিত্র চরিত্র	১৯৪৯	বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
২২।	বাংলার লেখক	১৯৫০	বিশ্বভারতী
২৩।	জগদ্বলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	১৯৫১	বিশ্বভারতী
২৪।	বিচিত্র উপল	১৯৫২	বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
২৫।	বাংলা সাহিত্যের নবনারী	১৯৫৩	বিশ্বভারতী
২৬।	কমলাকান্তের আসর	১৯৫৫	সোয়ান বুকস
২৭।	নানারকম	১৯৫৮	ওরিয়েন্ট বুক কোং
২৮।	বিচিত্র সংলাপ	১৯৫৮	নর্দান বুক ক্লাব
২৯।	বাংলার কবি	১৯৫৯	শ্রীশ্রী লাইব্রেরী
৩০।	কমলাকান্তের জন্মনা	১৯৬২	গ্রন্থপ্রকাশ
৩১।	গান্ধী জীবন ভাষ্য	১৯৭৬	মিত্র ও ঘোষ
৩২।	শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ	১৯৭৯	টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
চ)	সম্পাদিত গ্রন্থ :		
১।	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প	১৯৫৭	মিত্র ও ঘোষ
২।	কাব্যবিতান	১৯৫৭	বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৩।	ভূদেব রচনা সম্ভার	১৯৫৭	মিত্র ও ঘোষ
৪।	বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার	১৯৫৭	এ
৫।	রমেশ রচনাসম্ভার	১৯৫৭	এ
৬।	সাহিত্য সম্পূট	১৯৬০	বিশ্বভারতী
৭।	মাইকেল রচনাসম্ভার	১৯৫৯	মিত্র ও ঘোষ
৮।	বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক	১৯৬১	এ
৯।	বিশারীলাল রচনাসম্ভার	১৯৬২	এ
১০।	কান্তকবি রচনাসম্ভার	১৯৬২	এ
১১।	গিরিশ রচনাসম্ভার	১৯৬৩	এ
১২।	বঙ্কিম রচনাসম্ভার	১৯৬৫	এ
১৩।	দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার	১৯৬৫	এ

	গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১৪।	ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার	১৩৭৪	মিত্র ও ঘোষ অমর সাহিত্য প্রকাশন
১৫।	সাহিত্যচিন্তা [বঙ্কিমচন্দ্র]	১৩৭৫	
১৬।	দীনবন্ধু রচনাসম্ভার	১৩৭৮	
১৭।	হেমচন্দ্র রচনাসম্ভার	১৩৭৮	
১৮।	গল্প বিতান		
১৯।	স্বর্ণলতা		
২০।	নীলদর্পণ		
২১।	কমলাকান্তের দপ্তর		
২২।	পলাশীর যুদ্ধ		